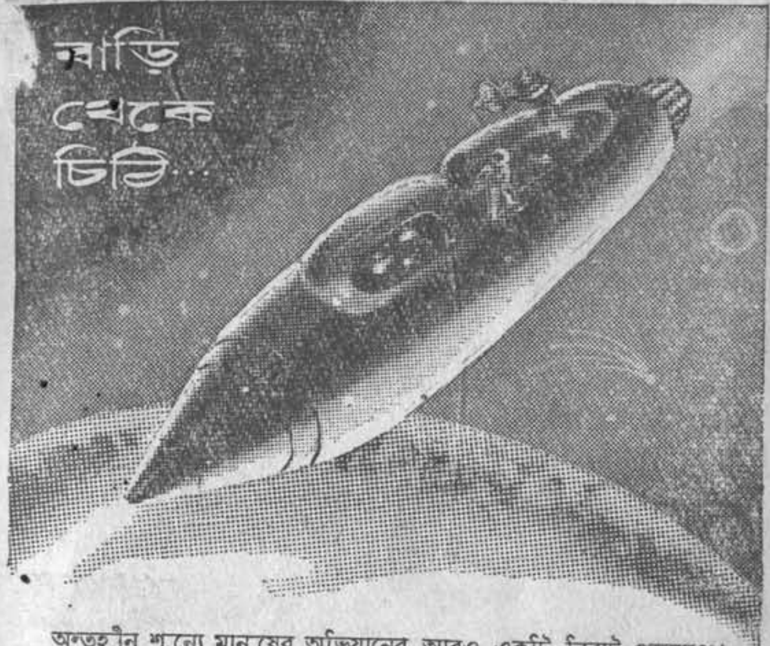
বিশেষ সমালোচনা সংখ্যা

শ্রাবণ ১৩৬৭

পরিচয়

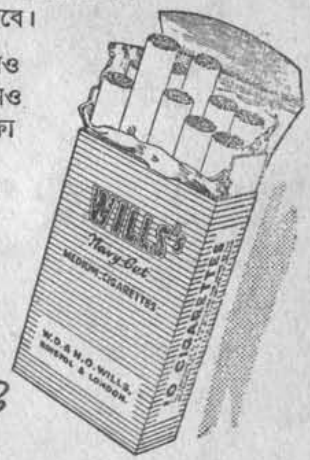
অশোক রুদ্র
সুনীল সেন
তরুণ সান্যাল
সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
রাম বসু
দিলীপ বসু
গোপাল হালদার
শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ
কৃষ্ণ ধর
প্রদ্যোৎ গুহ
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
সুরজিৎ দাশগুপ্ত
চিত্ত ঘোষ
মণীন্দ্র রায়
রবীন্দ্র মজুমদার
হিরণকুমার সান্যাল
অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র
অমল দাশগুপ্ত
মতি নন্দী

সম্পাদক
গোপাল হালদার । মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়



অন্তহীন শূন্যে মানুষের অভিযানের আরও একটি বিরাট পদক্ষেপ! পৃথিবী থেকে ১৩৫০ মাইল উঁচুতে বিজ্ঞানীরা একটি বিশাল স্পেস-স্টেশন তৈরী ক'রবার জল্পনা-কল্পনা ক'রছেন। যন্ত্রপাতি ও জিনিষপত্র পৃথিবী থেকে এই স্পেস-স্টেশনের কক্ষপথে পাঠানো হবে রকেটে ক'রে—সেগুলো তারপর স্পেস-ট্যাক্সিতে ক'রে কার্যক্ষেত্রে নিয়ে আসা হবে।

স্পেস-স্টেশন তৈরীর কাজে যদি আপনিও থাকেন তা হ'লে অন্য সবাইর মত আপনিও স্পেস-ট্যাক্সির জন্য উদগ্রীব হ'য়ে প্রতীক্ষা করবেন—কারণ এই ট্যাক্সিতে আসবে দরকারী জিনিষপত্র, দেশের খবর, বাড়ীর চিঠি, আর বলা বাহুল্য আপনার প্রিয় সিগারেট—উইল্‌স নেভিকাট।



উইল্‌স্
মার্কেই জানবেন
আধুনিক সিগারেট

দি ইম্পিরিয়াল টোব্যাকো কোম্পানী অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড কর্তৃক প্রচারিত NC/188

● বেঙ্গলের বই মানেই সেরা লেখকের সার্থক সৃষ্টি ●

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের
অবিস্মরণীয় উপন্যাস
মহাশ্বেতা ৫·৫০ ॥

আনন্দকিশোর মুন্সীর
অম্লমধুর বিচিত্র উপন্যাস
রাঘব বোয়াল ৩·০০ ॥

অধ্যাপক বীরেন্দ্রমোহন আচার্যের
শিক্ষাতাত্ত্বিক প্রবন্ধ-গ্রন্থ
আধুনিক শিক্ষাতত্ত্ব ৬·৫০ ॥

ধনঞ্জয় বৈরাগীর
সামাজিক নাটক
রুপোলী চাঁদ (৩য় মুঃ) ২·৫০ ॥

মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের
মধ্য ইয়োরোপ পায়ে-হেঁটে বেড়ানোর
সচিত্র ভ্রমণ কাহিনী
চরণিক ৩·০০ ॥

কুমারেশ ঘোষের
সর্বোত্তম উপন্যাস
সাগর-নগর ৩·৫০ ॥

সমরেশ বসুর
বিচিত্র উপন্যাস
গঙ্গা (৫ম মুঃ) ৫·৫০ ॥

সন্তোষকুমার দের
রসমধুর গল্প সংগ্রহ
বৈঠকী গল্প ৩·০০ ॥

সুবোধকুমার চক্রবর্তীর
সর্বোত্তম উপন্যাস
মণিপদ্ম ৪·০০ ॥

মনোজ বসুর
অবিস্মরণীয় সাহিত্যকীর্তি
মানুষ গড়ার কারিগর ৫·৫০ ॥

ভবানী মুখোপাধ্যায়ের
তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ জ্ঞানতপস্বী
চিন্তানায়কের উপন্যাসোপম জীবন-কথা
জর্জ বার্নাড শ ৮·৫০ ॥

বুদ্ধদেব বসুর
সর্বাধুনিক উপন্যাস
নীলাঞ্জনের খাতা ৪·০০ ॥

সতীনাথ ভাদুড়ীর
নবতম উপন্যাস
পত্রলেখার বাবা ৪·০০ ॥

রমাপদ চৌধুরীর
অনুপম গল্প সংগ্রহ
মুক্ত বন্ধ ৩·০০ ॥

নারায়ণ সান্যালের
আশ্চর্য উপন্যাস
মনামী ৪·০০ ॥

AFRICANISM Rs. 16
The African Personality
Dr. Sunitikumar Chatterji

॥ নানান ধরণের বই ॥

নীলকণ্ঠের **এলেবেলে** ২·৫০ ॥
গোপাল হালদারের **অন্যদিন** ৪·৫০ ॥
জরাসন্ধের **তামসী** ৫·৫০ ॥
সৈয়দ মুজতবা আলীর **পঞ্চতন্ত্র** ৩·৫০ ॥
হুমায়ুন কবিরের
শিক্ষক ও শিক্ষার্থী ৩·৫০ ॥
শশিভূষণ দাশগুপ্তের
ব্যান ও বন্যা ৩·০০ ॥

॥ বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা : বারো ॥

র‍্যালে

গত ৭৫ বছর ধরে সাইকেলের তালিকায় শীর্ষতম নাম



১৮৮৬ সাল থেকেই র‍্যালের শ্রেষ্ঠত্ব সারা পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ মানুষের দ্বারা পরীক্ষিত ও স্বীকৃত। গত ৭৫ বছর ধ'রে নানা রকম পরীক্ষানিরীক্ষার মধ্য দিয়ে র‍্যালে ক্রমাগতই উন্নততর হ'য়ে উঠেছে। আজ তাই আগের তুলনায় সব চাইতে উন্নত যে র‍্যালে আপনি পাচ্ছেন তা' গুণে অতুলনীয় এবং কাজের দিক থেকে সম্পূর্ণ নিরুঞ্ঝাট।

র‍্যালে কেনা সব সময়ই লাভজনক

অধিকতর আরামের জন্য
উইট্‌কপ
সীট লাগান

সেন-র‍্যালে

SRC-65 BEN

॥ বিশ্ববিখ্যাত বইয়ের বাংলা অনুবাদ ॥

রমাঁ রোলাঁর

বিমুগ্ধ আত্মা

প্রথম তিন খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে

দুই বোন ॥ সুদূরের পিয়াসী ॥ মা ও ছেলে

দাম : একত্রে রেক্সিন বাঁধাই ১৫·০০

পাবেল লুকনিৎস্কীর

নিশো

[পামীর অঞ্চলের উপজাতি জীবনের উপর উপন্যাস]

দাম : ৭·৫০

মুলক রাজ আনন্দ-এর

একটি রাজার কাহিনী

[Private Life of an Indian Prince]

দাম : ৭·৫০

র‍্যাডিক্যাল বুক ক্লাব ৬ কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা-১২

দি

ইউনাইটেড কমার্সিয়েল ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস : ২ ইণ্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা

অনুমোদিত মূলধন	৮,০০,০০,০০০
বিলিকৃত ও ক্রীত মূলধন	৪,০০,০০,০০০
আদায়ীকৃত মূলধন	২,০০,০০,০০০
সংরক্ষিত তহবিল	১,৭৫,০০,০০০

- ভারতবর্ষে এবং বিদেশে শাখা আছে
- পৃথিবীর সর্বত্র এজেন্সি আছে
- সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং ব্যবসায় নিষ্পন্ন করা হয়

আমাদের পৌণপুনিক আমানত স্কিম মারফত সঞ্চয় বাড়ান

নিয়মিত মাসিক আমানত	১০৲	১০০৲	৫০০৲
বাড়িয়া ৪৬ মাসে দাঁড়াইবে	৫০০৲	৫,০০০৲	২৫,০০০৲
৮৬ মাসে দাঁড়াইবে	১,০০০৲	১০,০০০৲	৫০,০০০৲

জি ডি বিড়লা
চেয়ারম্যান

এস টি সদাশিবন
জেনারেল ম্যানেজার

রূপকথার রাজকুমারী





মুন্নি যখন আমার নতুন তৈরী করা ফ্রক্‌টা পরলো তখন আনন্দে উচ্ছসিত হয়ে উঠলো। ফ্রক্‌টাও আমি অনেক যত্ন করে তৈরী করে-ছিলাম—সাদা ধব্‌ধবে জামার ওপর ছোট্ট নীল ফুলের পাড় দিয়ে। আনন্দে লাফাতে লাফাতে মুন্নি আয়নার সামনে গেলো।

ঘুরে ফিরে চারিদিক থেকে মুন্নি তার ফ্রক্‌টা দেখলো তারপর ছুটলো তার বন্ধুদের দেখাতে তার নতুন জামা, তক্ষুনি বিকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা না করতে পেরে। আমি চেঁচিয়ে ডাকলাম ওকে, "মুন্নি, মুন্নি নতুন ফ্রক্‌টা খুলে যা—ওটা ময়লা হয়ে যাবে যে ওটা পরে বিয়ের নেমন্তন্নে যাবিনা?" মুন্নি ততক্ষণে বাড়ীর থেকে বহুদূরে। নতুন ফ্রক্‌টা পরে মুন্নিকে দেখে মনে হলো আমার যেন কোন এক পরীর দেশের রাজকন্যা, ওকে সত্যিই মানিয়েছিলো। সত্যিই এত সুন্দর লাগছিল। একবার ভাবলাম ডাকি ওকে কারণ ফ্রক্‌টা ওকে পরতে দিয়েছিলাম শুধু ঠিক হয় কিনা দেখার জন্য। ইতিমধ্যে রান্না ঘরের থেকে কি যেন একটা পোড়ার গন্ধ পেয়ে আমি ওঠে গেলাম, তারপর আর আমার খেয়ালই ছিলনা। আমার হুঁস হল যখন রাধার গলা শুনলাম দরজার কাছে। রাধাকে দেখে খুব খুশী হলাম এবং ওকে নিয়ে যখন বসার ঘরে এলাম, দেখি মুন্নি দরজায় দাঁড়িয়ে।

ওকে দেখেই আমি রেগে আগুন—ফ্রক্‌টা একদম নোংরা করে ফেলেছে—বিয়েতে যাওয়ার সময় পরবেই বা কি?

S/P. 3 A-50 BG



"ফ্রক্‌টার কি ছিরিই করেছো, এখন পরবে কি বিকালে" বলে আমি ওকে মারতে যাচ্ছিলাম এখন সময় রাধা মুন্নিকে সরিয়ে নিয়ে আমায় ধম্‌কালো—" তোর মাথা খারাপ হল নাকি, এতটুকু বাচ্চাকে মারছিস।" মুন্নি বাঁচলো আর ফ্রক্‌টা খুলে রাখলো তাড়াতাড়ি।

ফ্রক্‌টা নিয়ে আমি কলতলায় পরিষ্কার করতে এলাম এবং যখন ফ্রক্‌টাকে আছড়াতে যাচ্ছি, রাধা বললো" মেয়ের ওপর রাগটা কি ফ্রকের ওপর ফলাবি?" "এটা না কাচলে ও পরবেটা কি? অন্য ভাল জামা যে আর নেই" আমি বললাম। রাধা বললো," কিন্তু ওটা আছড়ালে ছিঁড়ে যাবে যে।"



আমি বললাম "না আছড়ালেই বা কাচবো কি করে।" "আছড়াবার কি দরকার—ভাল সাবান ব্যবহার করলেই হয়। আমি তো সানলাইট ব্যবহার করি।" "কিন্তু সানলাইট কি সত্যিই এত ভাল সাবান?" "সত্যিই সানলাইটে জামাকাপড় সাদা ও উজ্জ্বল হয়। এবং এটা এত বিশুদ্ধ যে এতে কাপড়ের কিছু ক্ষতি হয়না।"

"কিন্তু সানলাইটে খরচা বেশী পড়েনা?" রাধা তো হেসেই আকুল—" সে কিরে, ভেবে দ্যখ্‌ একটু ঘষলেই সানলাইটে এত ফেনা হয় যে একগাদা জামাকাপড় কাচা চলে অল্প সময়েই সাদা ধব্‌ধবে করে! এছাড়া পিটে আছড়ে কাপড়ের সর্ব্বনাশও হয়না, নিজেরও ঝামেলা বাঁচে কতো—এর পরেও তুই বলবি খরচা বেশী।"

তক্ষুনি আমি একটা সান লাইট সাবান আনালাম এবং কাচা শুরু করতেই ফ্রকটা ফেনার স্তুপে ভরে গেলো আর দেখতে দেখতে সাদা ধব্‌ধবে হলো। সন্ধ্যেবেলা নতুন কাচা ফ্রক্‌টা পরে মুন্নিকে সত্যিই পরীদের গল্পের রাজকুমারীর মত লাগ-ছিলো। আমি মুন্নিকে কপালে কাজলের টীপ্‌ পরিয়ে দিলাম।



S/P. 3 B-50 BG

হিন্দুস্থান লিভার লিঃ, বোম্বাই

॥ বিশ্ব-সাহিত্যের স্মরণীয় বই ॥

মিখাইল শলোখফ



বিশ্ব-সাহিত্যের সেরা লেখকদের অন্যতম মিখাইল শলোখফ। জীবন-নিষ্ঠ সাহিত্যের জন্যে তাঁর ডন সিরিজ কেবলমাত্র বিপ্লবোত্তর সোবিয়েত সাহিত্যেই নয়, সর্বদেশের সর্বকালের মহোত্তম সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংযোজন।

ধীর প্রবাহিনী ডন

(And Quiet Flows the Don-এর পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ)

ডন নদীর তীরে তীরে দুর্ধর্ষ কসাকদের দুর্মদ প্রাণরঙ্গ—বিপ্লবের পূর্বে বেপরোয়া জীবনের বে-আবরু দুরন্তপনা আর বিপ্লবের পরে গৃহযুদ্ধের রক্তস্নানে সে জীবনের নবতর রূপায়ণ—এই উপন্যাসের উপজীব্য। পুরু অ্যান্টিক কাগজে লাইনো টাইপে ছাপা পাচশো পৃষ্ঠার বই, সুদৃশ্য জ্যাকেট।

অনুবাদ: অবন্তী সান্যাল। **দাম: নয় টাকা**

সাগরে মিলায় ডন

(Don Flows Home to the Sea-এর অনুবাদ)

প্রথম খণ্ড

বিপ্লবোত্তর যুগ ও কসাক জীবনের অনবদ্য রূপায়ণ।

অ্যান্টিক কাগজে লাইনো হরফে ছাপা। অনুবাদ: রথীন্দ্র সরকার।

দাম: ছ টাকা

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিঃ

১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলি-১২ ॥ ১৭২, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলি-১৩



সূচীপত্র

৩০শ বর্ষ ॥ শ্রাবণ, ১৮৮২ ; ১৩৬৭ ॥ ১ম সংখ্যা

॥ সম্পাদক ॥

গোপাল হালদার ॥ মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

সত্য গুপ্ত কর্তৃক গণশক্তি প্রিণ্টার্স (প্রাঃ) লিঃ, ৩৩ আলিমুদ্দিন স্ট্রীট, কলকাতা-১৬ থেকে মুদ্রিত এবং 'পরিচয়' কার্যালয়, ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত।

পরিচয়

৩০ বর্ষ : ১ম সংখ্যা
শ্রাবণ, ১৮৮২ : ১৩৬৭

মরিয়া না মরে মার্কস

অশোক রুদ্র

"মরিয়া না মরে রাম, এ কেমন বৈরী" মার্কসের হয়েছে সেই দশা। মার্কসবাদের মৃত্যুর সার্টিফিকেট বেরিয়ে গেল মার্কসের নশ্বর জীবনের অবসান হওয়ার আগে থেকেই, তবু আজও, এতদিন পরও, নতুন করে কত পণ্ডিতকেই না কত কাগজ-কালি ও সময় খরচ করে আবার বারবার তাঁর ডেথ সার্টিফিকেট দিতে হচ্ছে। আমাদের জনপ্রিয় প্রধানমন্ত্রী মহাশয়ও দয়া করে এই সার্টিফিকেট দিয়ে দিয়েছেন সম্প্রতি অনেক রাজনৈতিক মিটিঙে। মার্কসবাদ যে মরেছে তাতে আর সন্দেহ থাকতে পারে. কই ? তবু মনে না হয়েই যায় না, যে মড়াকে মড়া প্রতিপন্ন করতে এত সার্টিফিকেটের প্রয়োজন হয় সে তো বড়ো সাধারণ মড়া নয়! জন্ স্ট্র্যাচীর শেষ বই দুটোতে* কিন্তু মার্কসকে মৃত প্রমাণিত করার চেষ্টা তিনি বড়ো করেন নি। তিনি হলেন বিশুদ্ধ revisionist! Principles of Democratic Socialism নামে একটা সিরিজ ধরে বই লিখতে শুরু করেছেন। এদুটো বই হল সিরিজটির প্রথম দুটি খণ্ড। এদুটি খণ্ড পড়ে মনে হয় না যে সিরিজটি সম্পূর্ণ হওয়ার পরও মার্কসবাদীদের তাদের নিজেদের ধারণার মূলগত কোনো revision করার প্রয়োজন হবে। কিন্তু তাই বলে নাসিকাকুঞ্চন করে তাঁর বই দুটিকে ভালো করে পড়ে দেখতে অনিচ্ছা প্রকাশ করা মার্কসবাদীদের পক্ষে অক্ষমনীয় আচরণ হবে বলে মনে করি। তার কারণ যে-প্রশ্নের বিচারে স্ট্র্যাচী নেমেছেন, তা নিয়ে পুনর্চিন্তা মার্কসবাদীদের মধ্যেও যথেষ্ট হচ্ছে। স্ট্র্যাচীর বই দুটোর অনেক

* **Contemporary Capitalism** : John Strachey. Victor Gollancz Ltd., London 1956.

End of Empire : John Strachey. Victor Gollancz Ltd. London, 1959.

কথাই হয়তো আমাদের হাসির উদ্রেক করতে পারে, কিন্তু তা সত্ত্বেও চিন্তার খোরাকও তাতে যথেষ্টই পাওয়া যাবে। বস্তুত বইটা পড়তে পড়তে আমার মনে হয়েছে, তাঁর revisionist মতামত আলোচনা করার সময়ে তিনি যতটা হিসেবী এবং হুঁসিয়ার মনের পরিচয় দিয়েছেন তা সুলভ নয়। তাছাড়া স্ট্র্যাচীর বই প্রণিধান সহকারে পড়ে দেখার অন্য কারণও আছে। স্ট্র্যাচী একদা মার্কসবাদী বলে নিজেকে মনে করতেন। মার্কসবাদী পাঠকমহলে তিনি জনপ্রিয় ছিলেন সুলেখক হিসেবে। তিনি যেহেতু মত ও পথ বদলেছেন, বিপ্লবের রাস্তা ছেড়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মন্ত্রীত্বের গদিতে আসীন হয়েছেন, সেইহেতুই তাঁর বক্তব্য আর শোনার যোগ্য নয় এমন মনোভাব পোষণ করা চলে না।

স্ট্র্যাচী মার্কসবাদ ও লেনিনবাদকে revise করতে বসলেও অন্তত মৌখিকভাবে মার্কসের প্রতি গুরুভক্তি দেখাতে কার্পণ্য করেন না। বই দুটির পাতায় পাতায় ছড়ান রয়েছে মার্কসের প্রতি শ্রদ্ধা-নিবেদন। Reintegrating Marxism with the Western tradition অবশ্য করণীয় হয়ে উঠেছে এবং অন্য যে কোনো সামাজিক ইতিহাস সংক্রান্ত mental system-এর তুলনায় Marxism on the whole does less violence to reality বলে নিয়ে তিনি জানিয়েছেন it is gratifying to

> pay the tribute of rigorous criticism to the genius of that eminent victorian, Karl Marx।

স্ট্র্যাচী মনে করেন তিনি মার্কস-এর rigorous criticism করতে সমর্থ হয়েছেন। তাঁর বই দুটো পড়ে দেখলে তাতে আর যাই পাওয়া যাক rigour-এর আতিশয্য চোখে পড়ে না। স্ট্র্যাচী রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "থপরকাগুজে" লেখক। যা তিনি বলতে চান তা ঝরঝরে ভাষায় তরতর করে লিখে ফেলেন। জল গভীর না হোক অন্তত তা ঘোলাটে নয়। তল পর্যন্ত পরিষ্কার দেখা যায়। তলায় যদি মণিমুক্তো ঝকমক না করে, সেখানে যদি পাঁক আর শামুক ছাড়া অন্য কিছু দেখা নাও যায় তো তা লুকোবার চেষ্টা অন্তত স্ট্র্যাচী করেন না। ফলে হয়েছে এই যে স্ট্র্যাচীর বই দুটিকে তারিফ করে বলা চলে, এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেলার মতো বই। তত্ত্বমূলক বইয়ের সম্বন্ধে এ উক্তি যদি ঠিক প্রশংসাসূচক না হয় তো আমি নাচার।

বই দুটির মধ্যে প্রচুর স্ববিরোধী মনোভাবের ছড়াছড়ি পাঠকের আমোদের কারণ হয়। একদিকে হয়তো তিনি সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে ভারতবর্ষ ও অন্যান্য পরাধীন দেশের মুক্তি পাওয়ার জন্য আনন্দাশ্রু বর্ষণ করছেন অন্যদিকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ইতিহাস আলোচনা করতে করতে গর্বে যে তাঁর বুক ফুলে উঠছে তাও পরিষ্কার অনুভব করা যায়। এরই মধ্যে কোথাও হয়তো তিনি গভীরভাবে বলে বসলেন, The highest mission of Britain in our day is to help the underdeveloped world। একদিকে তিনি স্থানে স্থানে মার্কস ও লেনিনের বিশ্লেষণকে মোটামুটিভাবে অনুসরণ করার চেষ্টা করছেন, অপরদিকে আবার যখন বিশুদ্ধ ব্রিটিশ চিন্তাধারার empiricism-এ ভর করে বিচরণ করতে বেরিয়েছেন তখন মাঠঘাট নালানর্দমা বিচার না করে ছাড়া গরুর মতো কোথা থেকে কোথায় যে চলে যাচ্ছেন তার হুঁশ থাকছে না।

এতে অবশ্য আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই। স্ট্র্যাচী খানদানী ইংরেজ পরিবারের বাচ্চা, তাঁর পূর্বপুরুষদের মধ্যে অনেকে বংশানুক্রমে ভারতীয় শাসন-দপ্তরে উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন। তাঁর ধমনীতে যে রক্ত বয় তার রং লালের চেয়ে নীল বেশি। কিন্তু কর্মজীবনে তিনি করেছেন লেবার পার্টির নেতৃত্ব। শুধু তাই নয়, লেবার পার্টিতে ভিড়বার আগেও তিনি অনেক ঘাটের জল খেয়ে এসেছেন। বিশেষ করে অতি কাঁচা বয়সে তাঁর ঘাড়ে একটি একেবারে বিজাতীয় ভূত চেপে বসে। সে হল কার্ল মার্কসের ভূত। তিনি যে ভূতগ্রস্ত তা অতি সত্বরই টের পান এবং ভূত ঝাড়াবার জন্য তৎপর হন। ভূত নামে বটে কিন্তু তবু কি যেন থেকে যায়। ভূতেরও ভূত হয় নাকি? মার্কসের একটা প্রভাব যেন থেকে যায় তাঁর ঘাড়ে চেপে। সেই প্রসিদ্ধ চেশায়ার বিড়ালের অশরীরী ও স্বয়ংসম্পূর্ণ হাসির মতো, ইংরেজ লেখকেরা যার উদাহরণ দিতে এত ভালবাসেন। বিড়ালটা অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার পরও হাসিটা শুধু ভেসে থাকে শূন্যে। মৃত মার্কসের ভুতুড়ে দাড়ির কয়েক গোছা যেন স্ট্র্যাচীর মনে সুড়সুড়ি দেয় থেকে থেকে।

সে যা হোক, সবদিক বিবেচনা করে আমাদের উচিত খানিকটা ক্ষমাশীল মনোভাব নিয়ে, আপাতবিরোধী ও হাস্যকর আস্ফালন ও বাণীবিতরণের দিকে মনোযোগ না দিয়ে, তাঁর মূল বক্তব্য বোঝবার চেষ্টা করা। খানিকটা সহানুভূতি নিয়ে তাঁর কথা শুনলে দেখতে পাব শ্রীজয়প্রকাশ

নারায়ণ এবং মঁশিয়ো গীমোলেরা যে সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক জগতের চিন্তাপুরোহিত, সেখানে স্ট্র্যাচীর দৃষ্টিকে অতুলনীয় রকমে স্বচ্ছ করতে হয়।

স্ট্র্যাচীর মূল বক্তব্যকে সংক্ষেপে এইভাবে পেশ করা যায়। মার্কস ও লেনিন ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার কাঠামো ও প্রবণতাসমূহের যে বিশ্লেষণ দিয়েছিলেন, মোটের উপর তা তাঁদের সময়ের ধনতান্ত্রিক সমাজের সম্বন্ধে খুবই সুষ্ঠুভাবে প্রযোজ্য ছিল। কিন্তু কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে সে-বিশ্লেষণ আর সাম্প্রতিক কালের ধনতন্ত্রব্যবস্থার সঙ্গে খাপ খাচ্ছে না। এ রকম দুটি মৌলিক ব্যাপারের আলোচনা তিনি করেন বই দুটিতে। প্রথম বই "সমসাময়িক ধনতন্ত্রে"-র আলোচ্য বিষয় ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের স্বরূপ সম্বন্ধে মার্কসবাদী তত্ত্ব। দ্বিতীয় বই, "সাম্রাজ্যবাদের অবসানে" আলোচিত হয়েছে লেনিন বিশ্লেষিত সাম্রাজ্যবাদী সম্প্রসারণের তত্ত্ব। স্ট্র্যাচী বলেন, দুনিয়ার বেশির ভাগ ধনতান্ত্রিক ও আধাসামন্ততান্ত্রিক দেশগুলির রাষ্ট্র সম্বন্ধে মার্কসবাদী তত্ত্ব এখনও খুবই খাটে বটে, তবে খুব উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলি সম্বন্ধে তা আর পুরোপুরি খাটে না। এই খুব উন্নত দেশের মধ্যে তিনি ব্রিটেন, যুক্তরাষ্ট্র এবং পশ্চিম জার্মানিকে অন্তর্ভুক্ত করেন। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ মনোপলি পর্যায়ের ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার যে বিশ্লেষণ দেন তা স্ট্র্যাচী মোটামুটিভাবে মানেন কিন্তু মনে করেন যে কতকগুলি জিনিস যাদের প্রবণতা হিসাবে ধরা উচিত ছিল তাদের বিধি হিসেবে ধরে মারাত্মক ভুল করা হয়েছিল। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার কেন্দ্রাতিগ শক্তিসমূহ এই ব্যবস্থার শুদ্ধমাত্র অর্থনৈতিক কাঠামোয় যে ধরনের পরিবর্তন এনেছে সে-বিষয়ে তিনি মার্কসবাদের সঙ্গে একমত। কিন্তু তিনি বলেন রাজনৈতিক কাঠামোটাকে এই অর্থনৈতিক কাঠামোটা কেবল একতরফাভাবে নির্দিষ্ট করে তুলতে পারে নি। রাষ্ট্র শুধু মনোপলি ধনতান্ত্রিকদের হস্তচালিত যন্ত্র নয়, যদিও মনোপলি ধনতান্ত্রিকদের ইচ্ছা তাই হওয়া। অপর একটি বিরোধী শক্তি ধনতান্ত্রিকতার সঙ্গে সংগ্রাম করছে রাষ্ট্রকে করায়ত্ত করার জন্য। তা হল জনশক্তি, যা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং শ্রমিক সংস্থাদের মারফত ক্রমাগত মনোপলি শক্তিদের প্রতিরোধ করছে। উন্নত দেশগুলির অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে তাহলে একটা বৈরী সম্পর্ক রয়েছে। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার ভিতরে থেকেও জনশক্তি যে কতটা কার্যকরী হতে পারবে তা মার্কস আন্দাজ করতে পারেন নি। তিনি মনে করেছিলেন

শ্রমিক জনতা ধনতান্ত্রিক পেষণে দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হয়ে উঠবে। বস্তুত হয়েছে ঠিক তার উলটো। উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে শ্রমিকদের আয় ও জীবনমান প্রভূত পরিমাণে বেড়ে গেছে গত শতাব্দীতে। তা সম্ভব হয়েছে দুই উপায়ে। এক, সরাসরি শ্রমিক সংস্থার মারফত ভাতার লড়াইয়ের ফল হিসেবে। দুই, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার মারফত জনশক্তির চাপে শ্রমিক-স্বার্থসাধক অসংখ্য আইনকানুনের প্রবর্তনের দ্বারা। এর সুদূরপ্রসারী ফলের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যা হয়েছে তা এই যে ধনতন্ত্রেরই ব্যবস্থা হিসেবে প্রাণ বেঁচে গেছে। কারণ ধনতন্ত্রের নিজস্ব প্রবণতাগুলি যে আত্মঘাতী তা স্ট্র্যাচী মানেন এবং এও মানেন যে ধনতন্ত্রে মনোপলিগত কেন্দ্রাতিগ, শক্তিদের কার্যফল হয়েছে তার অন্তর্বিরোধকে বাড়িয়ে, স্থিতি-শীলতাকে কমিয়ে তার আত্মঘাতী প্রবণতাগুলিকে অধিকতর শক্তিশালী করে তোলা। কিন্তু গণতন্ত্র ও শ্রমিকশক্তির প্রতিরোধ এই প্রবণতাগুলিকে অনেক দূর পর্যন্ত ঠেকিয়ে রাখতে পেরেছে দুই উপায়ে। প্রথমত, শ্রমিকদের জীবনমানের বৃদ্ধিই অনেক পরিমাণে সংকটের সম্ভাবনাকে সীমিত করেছে। তার কারণ ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার অস্থিতিশীলতা ও সংকটের অন্যতম প্রধান কারণই under consumption, যার মূলে কিনা রয়েছে শ্রমিকের আয়ের ন্যূনতা। তাছাড়া ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞানও বেড়েছে, তাকে সংকট বাঁচিয়ে চালানোর পদ্ধতিও শেখা গেছে ; গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার দরুন গণশক্তিদের পক্ষে সম্ভব হয়েছে রাষ্ট্র কর্তৃক ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির মুখে বলগা লাগিয়ে তাকে সাবধানে ও সংযতভাবে চালানো। আধুনিক ধনতন্ত্রবাদে তাহলে দেখা যাচ্ছে রয়েছে দুইটি পরস্পর-বিরোধী শক্তির অস্থিতিশীল ভারসাম্য। এ অবস্থা স্ট্র্যাচীর মতে বেশিদিন চলতে পারে না। মনোপলি ধনতন্ত্রের প্রাথমিক ঝোঁকই হচ্ছে ক্ষমতা কেন্দ্রীকরণের দিকে। আর গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার ঝোঁকই হচ্ছে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের দিকে। আগে হোক, পরে হোক এদের একটি অন্যটিকে হজম করে ফেলবেই। হয় গণতান্ত্রিক চাপ অসহ্য হয়ে উঠলে মনোপলি-ধনতন্ত্র নখদন্ত বিকাশ করে নগ্ন ফাসীবাদের চেহারা নেবে, নয়তো মনোপলি-ধনতন্ত্র গণতন্ত্রের রসে মজে ধীরে ধীরে সমাজতন্ত্রে পরিণত হবে। স্ট্র্যাচীর মতে দুনিয়ার বেশিরভাগ দেশেই ধনতন্ত্রের ক্ষমতা গণতন্ত্রের ক্ষমতার চেয়ে অনেক বেশি। এবং সে-সব দেশে গণতান্ত্রিক উপায়ে সমাজতন্ত্রের উত্তরণের সম্ভাবনায়

তিনি বিশ্বাস করেন না। শুধু তিনটি দেশ সম্বন্ধে তিনি এই বিশেষ আশা পোষণ করেন, তারা হল, আগেই বলা হয়েছে, ব্রিটেন, যুক্তরাষ্ট্র এবং পশ্চিম জার্মানি। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রগতির যে স্তরে পৌছলে এই সম্ভাবনা অনগণ্য আকার নেয় ফ্রান্স তার কাছাকাছি পৌছেছে, কিন্তু ইতালি তার থেকে অনেক নিচে এই কথা তিনি মনে করেন। এশিয়া ও আফ্রিকার অনুন্নত ও অর্ধোন্নত দেশগুলির সম্বন্ধে এ সম্ভাবনার কোনো প্রশ্নই ওঠে বলে তিনি মনে করেন না, যদিও বারকয়েক তিনি ফুটনোটে ভারতবর্ষ যে নানাভাবে একটা ব্যতিক্রম সে-বিষয়ে মন্তব্য করেন। এই পর্যন্ত হল স্ট্র্যাচীর প্রথম বইটির মূল বক্তব্য। দ্বিতীয় বইটিতে তিনি একই যুক্তির জের টেনে বলেন, গণশক্তির অভ্যুত্থান যেমন মনোপলি-ধনতন্ত্রকে সংকটের হাত থেকে বাঁচাচ্ছে তেমনি তাকে একটি উত্তর-সাম্রাজ্যবাদী অধ্যায়ে প্রবেশ করতেও সাহায্য করছে। সাম্রাজ্যবাদ বলতে স্ট্র্যাচী লেনিনের সংজ্ঞা অনুসরণ করছেন না। এক দেশের উপর অন্য আরেক দেশের বলপ্রয়োগে প্রভাব বিস্তার বোঝাচ্ছেন। সাক্ষাৎ উপনিবেশগুলি ছাড়াও মিশর, চীন ও দক্ষিণ আমেরিকার রাষ্ট্রগুলিকেও তিনি ব্রিটিশ, আমেরিকান প্রভৃতি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল বা এখনও আছে বলে মনে করছেন। উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর সাম্রাজ্যবাদী সম্প্রসারণের পিছনে যে অন্যতম প্রধান শক্তি হিসেবে ছিল পুঁজির রপ্তানি-প্রবণতা তা তিনি মানেন। কিন্তু বলেন যে সে-প্রবণতা এখন প্রায় লুপ্ত হয়েছে। যে পুঁজির উদ্বৃত্তি এ-প্রবণতার জনক তা আর এখন নেই। শ্রমিক সংগ্রাম এবং গণতান্ত্রিক চাপের ফলে একদিকে যেমন মুনাফার ভাগ যদৃচ্ছ বাড়তে না পারাতে পুঁজি সৃষ্টির পথেই বাধা সৃষ্টি হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি জনসাধারণের মঙ্গলকারক নানাবিধ কাজে প্রচুর পুঁজি নিয়োগ করতে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বাধ্য হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির অর্থনৈতিক পুষ্টির জন্য যে উপনিবেশ রাখার কোনো প্রয়োজন নেই তা প্রমাণিত হয়েছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তী যুগের ইতিহাসে। একের পর এক উপনিবেশ এবং পরাধীন দেশ স্বাধীনতা সংগ্রামের মারফত স্বাধীনতা অর্জন করছে। পশ্চিম ইওরোপীয় দেশগুলির সাম্রাজ্য খর্ব হয়ে হয়ে প্রায় লুপ্ত হয়ে গেছে, কিন্তু তার জন্য তাদের কোনো ক্ষতি হয়েছে বলে তো তিনি দেখতে পান নি। ক্রান্তি এতদিনের মধ্যেও দেখা দেয় নি ; শ্রমিকদের জীবনের মানও অনেক বেড়ে

গেছে, কমে নি। পুঁজি রপ্তানি ছাড়াও বাণিজ্যে সুবিধা করে নেওয়ার জন্যও যে-সাম্রাজ্য বিস্তার করা হয়েছিল তা তিনি মানেন এবং এও মানেন যে এই জাতীয় সুবিধা এখনও সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো ভোগ করছে পূর্বতন উপনিবেশ ও পরাধীন দেশগুলিতে। কিন্তু মার্কসবাদীরা যদিও একেও সাম্রাজ্যবাদ বলেই মনে করেন, স্ট্র্যাচী বলেন সাক্ষাৎ বলপ্রয়োগ যখন অনুপস্থিত তখন সাম্রাজ্যবাদ একে বলা উচিত নয়। বিশেষ করে কোনো সাম্রাজ্যই যাদের কখনও ছিল না —এমন দেশগুলিও যখন একইভাবে লাভবান হচ্ছে। এই ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করতে তিনি Gunnar Myrdal-এর শরণাপন্ন হন। Myrdal-এর একটি থিয়োরি আছে, যা অনুসারে, যেখানেই অবাধ বাণিজ্যের সম্পর্ক একটি শক্তিশালী ও একটি দুর্বল অর্থনীতির মধ্যে, সেখানেই তাদের পরস্পরের মধ্যে অর্থনৈতিক ক্ষমতার ভেদ আগের চেয়ে পরে বেড়ে যাবেই। স্ট্র্যাচী বলেন, পরাধীন থাকার কালে এবং স্বাধীন হওয়ার পরও এশিয়া ও আফ্রিকার অনুন্নত ও অর্ধোন্নত দেশগুলি এবং পশ্চিম ইওরোপীয় দেশগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক মানের প্রভেদ যে ক্রমেই বেড়ে গেছে তার জন্য সাম্রাজ্যবাদ খুব বেশি দায়ী নয়, যদিও সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো যে উপরন্তু আরও খানিকটা সুবিধা করে নিয়েছিল তা তিনি মানেন। মোটের উপর স্ট্র্যাচী সাম্রাজ্যবাদের দরুন সাম্রাজ্যবাদী দেশের লাভের পরিমাণকে যথাসম্ভব ছোট করে দেখাতে চান। তিনি সাম্রাজ্যবাদকে দুইটি ঐতিহাসিক পর্যায়ে ভাগ করে দেখেন। এক হল অষ্টাদশ ও পূর্ববর্তী শতাব্দীর বাণিজ্যভিত্তিক সাম্রাজ্যবাদ আর একটি উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর পুঁজির রপ্তানি-ভিত্তিক সাম্রাজ্যবাদ। প্রথমোক্ত সাম্রাজ্যবাদ যে অধিকৃত দেশগুলির প্রচুর ক্ষতিসাধন করছিল তা তিনি অস্বীকার করেন না। কিন্তু তাঁর মতে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির লাভ সে-ক্ষতির তুলনায় অনেক কম হয়েছিল। তার কারণ বাণিজ্য-ভিত্তিক সাম্রাজ্যবাদে শোষণ আকার নিয়েছিল সরাসরি লুটের। লুটেরারা যেহেতু স্বভাবতই অমিতব্যয়ী ও অবিমৃশ্যকারী হয়ে থাকে সেহেতু সে লুটের ধন পুঁজি হিসেবে কমই ফলপ্রদ হতে পেরেছিল সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির শিল্পায়নে। অবশ্য যেটুকু হয়েছিল তা শুধু পরিমাণের দিক দিয়ে নগণ্য হলেও তার অন্তিম ফলের গুরুত্ব স্ট্র্যাচী অস্বীকার করেন না। শিল্পায়নের প্রথম পর্যায়ে সব অর্থনীতিতেই কিছু বিদেশাগত পুঁজির দরকার পড়ে থাকে। এই যুক্তিতেই এশিয়া ও আফ্রিকার অনুন্নত ও অর্ধোন্নত দেশগুলির assisted take-off

সম্ভব করার জন্য সহৃদয় ধনতান্ত্রিক ও সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটরা economic aid দেওয়ার কথা বলেন। স্ট্র্যাচী বলেন, লুটের ধন পুঁজি হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে ব্রিটেনের ক্ষেত্রেও assisted take-off সংঘটিত হয়েছিল।

অতঃপর স্ট্র্যাচী একটি বাণী বিতরণ করেন—সাম্রাজ্যবাদী বা (তাঁর মতে) উত্তর-সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির উদ্দেশে। এদের সাম্রাজ্যের যেটুকু অবশিষ্ট আছে তাদেরও অবিলম্বে অবসান ঘটানো তাদের নিজেদেরই স্বার্থের অনুকূল। তাছাড়া, তারা উত্তর-সাম্রাজ্যবাদী যুগে বাঁচতে যদি চায় তো বাঁচতে পারে, কিন্তু তার জন্য অন্যতম কর্তব্য হচ্ছে অনুন্নত ও অর্ধোন্নত দেশগুলির অর্থনীতিক উন্নতিতে আর্থিক ও অন্য সব উপায়ে অকুণ্ঠ চিত্তে সাহায্য করা। তাতে একদিকে অতীতের ঋণ শোধ করা হবে, অন্যদিকে উদ্বৃত্ত পুঁজি এভাবে বিতরণ করে দিয়ে ধনতান্ত্রিক দেশগুলির আভ্যন্তরীণ ভারসাম্য রক্ষা করা সহজ হবে। বাণিজ্যের সম্পর্কে দুর্বল হওয়ায় এ দেশগুলিকে যে ক্ষতি স্বীকার করতে হয়, তার সম্বন্ধে তিনি বলেন, এর প্রতিকার শুধু একটাই আছে, তা হল এদের নিজস্বার্থ সংরক্ষণ করার মতো ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠা। এ ব্যাপারেও অনুন্নত ও অর্ধোন্নত দেশগুলিকে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির সাহায্য করা উচিত বলে তিনি মনে করেন।

অতি পুরাতন ভাব, নব আবিষ্কার। স্ট্র্যাচীর বক্তব্য সম্বন্ধে এ ছাড়া আর কি বলা চলে? তত্ত্বের দিক দিয়ে খুব কম কথাই স্ট্র্যাচী বলেছেন যা কিনা আনকোরা নতুন এবং যার উত্তর মার্কসবাদীরা ইতিমধ্যে বহুবার দেন নি। অতএব নতুন করে তাত্ত্বিক আলোচনা পাড়ব না। লেখক হিসেবে বিচার করতে গিয়ে আবার বলব, অনেক ব্যাপারে অতি সাবধানে পা ফেলে তিনি এগিয়েছেন এবং অনেক ইতস্তত করে কথা বলেছেন যা তাঁকে অনেক সাম্প্রতিক সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট লেখকের চেয়ে উপরে স্থান দেয়। যেমন, তিনি বারবার জোর দিয়ে বলেন, গণতান্ত্রিক উপায়ে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের সম্ভাবনা যদি থেকে থাকে তো তা আছে গুটিকয়েক দেশে। বাদবাকি পৃথিবীতে মার্কস ও লেনিন বিশ্লেষিত অমোঘ ডায়ালেক্‌টিক্‌স মেনেই ইতিহাস এগিয়ে চলছে। এ পর্যন্ত কথাটা ভালোই শোনায়। কিন্তু ভাগ্যবান দেশ কয়টি বাছতে গিয়ে তিনি যখন ব্রিটেনের পর যুক্তরাষ্ট্র ও জার্মানির কথা বলেন তখন একটু আশ্চর্য হতে হয় বৈকি। যুক্তরাষ্ট্রে যে শ্রমিক-আন্দোলন

সমাজতন্ত্রের এত কাছাকাছি পৌঁছে গেছে, অথবা জার্মানিতে যে গণতন্ত্রের চাপে পড়ে ধনতন্ত্রের যাই-যাই অবস্থা উপনীত হয়েছে, এ আমাদের কাছে নতুন খবর বৈকি। একথা ঠিক, মার্কস নিজে ব্রিটেন এবং যুক্তরাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক উপায়ে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের সম্ভাবনার কথা বলেছিলেন। কিন্তু তারপর তো অনেকদিন হয়ে গেল। এতদিনে কি সত্যিই গণতন্ত্রের রসে ধনতন্ত্র মজে উঠল, না ধনতন্ত্রই গণতন্ত্রকে নিজের পোষা বিড়ালে পরিণত করল সে বিষয়ে অন্তত সন্দেহ অনেকেরই আছে। ঠিক তেমনি, সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির শ্রমিক-আন্দোলন কি ধনতন্ত্রের বৈরীশক্তি হিসেবে কাজ করছে, নাকি সাম্রাজ্যবাদী দোষের ছোঁয়া লেগে তাও অল্পবিস্তর সাম্রাজ্যবাদের দোসর শক্তিতে পরিণত হয়েছে, সে-প্রশ্ন তোলারও অবকাশ আছে। একথা ঠিক যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে ধনতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে তেমন গুরুতর কোনো অর্থ নৈতিক সংকট দেখা দেয় নি, তাদের প্রগতিও শিথিল হয় নি। কিন্তু এই ব্যাপারটির মূলে রয়েছে যে গুরুত্বপূর্ণ কারণসমূহ তাদের একটিকে স্ট্র্যাচী প্রায় উল্লেখই করেন না বলা চলে। সে হল ধনতান্ত্রিক দেশগুলির কমিউনিস্টভীতি। গত চল্লিশ বৎসরে সোভিয়েত ইউনিয়নের ঐতিহাসিক বিবর্তন জাগতিক পরিস্থিতিকে একেবারে বদলে দিয়েছে। ধনতান্ত্রিক দেশগুলি যদি অপেক্ষাকৃতভাবে স্থিতিশীলতার পরিচয় দিয়ে থেকে থাকে কিছুকাল যাবৎ, তো তার কারণ এই দেশগুলির অস্ত্রসজ্জা। এই অস্ত্রসজ্জার খতিয়ানে এত বিশাল পরিমাণ পুঁজি নিয়োজিত হচ্ছে যে উদ্বৃত্ত পুঁজির সমস্যা উঠতেই পারছে না। জাগতিক ঠাণ্ডা-লড়াইয়ের অবসান হয়ে অস্ত্রসজ্জার পরিমাণ কমলেই এদেশগুলিতে সংকট দেখা দেওয়ার গুরুতর সম্ভাবনা রয়েছে। এই কমিউনিস্টভীতি সমাজতান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে বিরোধকে প্রাথমিক করে তুলে ধনিকগোষ্ঠী ও ধনিক রাষ্ট্রদের অন্তর্বর্তী বিরোধকে দ্বিতীয় স্তরে নামিয়ে দিয়েছে।

ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে রাষ্ট্র যদি কিন্‌সীয় পদ্ধতি অবলম্বন করে আর্থনীতিক সংকট এড়ানোর জন্য যত্নবান হয়ে থাকে তো তার মূলে আছে বেকার-সমস্যার ফলে যাতে না শ্রমিকদের মধ্যে কমিউনিস্ট প্রভাব বৃদ্ধি পায় এই সাবধানতা। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি যদি এশিয়ার দরিদ্র দেশগুলির মধ্যে কিছু অর্থ নৈতিক সাহায্য বিতরণ করছে তো তার পিছনে ঋণ শোধ করার কোনো মনোভাবই নেই, আছে কাঙালি বিদায় করার ধনীজনসুলভ মনোভাব, আর এই আশংকা

যে, এসব দেশের জীবনমান সত্বর না বাড়ালে তারা কমিউনিজমের পথ বেছে নেবে। যুক্তরাষ্ট্র ও জার্মানি তো উদাহরণ হিসেবে হাস্যকর, কিন্তু ব্রিটেনের কথাও যদি ধরা যায় তো এমন কি কোনো নজির আছে যা থেকে প্রমাণ হতে পারে যে সত্যই জনশক্তি ধনিকশক্তির সমকক্ষ হয়ে উঠেছে? আর সমকক্ষ হয়ে উঠে থাকলেও ধনিক সম্প্রদায় বিনাসংগ্রামে নিজেদের লুপ্তি মেনে নেবে এ-ধরনের বৈরাগ্যভাব কি তারা কখনও দেখিয়েছে? এক অধ্যায়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সংকোচনের ইতিহাস বিবৃত করতে গিয়ে স্ট্র্যাচীকে তো নিজেকেই অতিশয় অসুবিধা ভোগ করতে হয়েছে। ভারতবর্ষ এবং ব্রহ্মে বিনাযুদ্ধে ক্ষমতা হাত বদল হয়েছে সত্য কিন্তু মালয়ে যে তা হয় নি, পারস্যে Anglo-Iranian Oil Companyর ডাকে যে ব্রিটিশ সরকারকে নৌবহর পাঠানোর কথা ভাবতে হয়েছিল (স্ট্র্যাচী নিজে ছিলেন সেই সময়ে ব্রিটেনের যুদ্ধমন্ত্রী!), কেনিয়াতে যে মাও-মাও বিদ্রোহ বহু রক্তক্ষয় করে দমন করতে হয়েছে, ব্রিটিশ গীয়ানায় পার্লামেন্টীয় গণতান্ত্রিক উপায়ে নির্বাচিত বামপন্থী সরকারকে যে ক্ষমতাগ্রহণ করতে দেওয়া হয় নি—এসব তথ্য তো স্ট্র্যাচীর পক্ষেও এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হয় নি। এরা কি এই দেখায় না যে, যে-সব ক্ষেত্রে স্বার্থসিদ্ধির পক্ষে রক্তপাত দরকার ছিল না সে-সব ক্ষেত্রে বিনারক্তপাতে ক্ষমতার হাতবদল করে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু যে ক্ষেত্রেই মনে হয়েছে স্বার্থক্ষুণ্ণ হওয়ার সম্ভাবনা আছে সেখানেই সাম্রাজ্যবাদ গোলবারুদ নিয়ে বছরের পর বছর যুদ্ধ চালিয়ে যেতেও পিছপাও হয় নি? ক্ষুদ্রতম উপনিবেশ সম্বন্ধেও যখন সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীর মনোভাব এই, তখন কি একথা বিশ্বাস করা সম্ভব যে নিজ বাসভূমি থেকে তারা উৎখাত হতে রাজী হবে বিনারক্তপাতে শুধু এই কারণে যে পার্লামেণ্টে লেবার পার্টি থেকে প্রস্তাব পাশ করা হয়েছে দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা হোক বলে? আসল কথা, এ সব প্রশ্নই অবান্তর। ব্রিটেনের গণতন্ত্র ধনতন্ত্রের বৈরীশক্তি হিসেবে কাজ করছে এ মোটেই ঠিক কথা নয়। কি আমেরিকায়, কি ব্রিটেনে শ্রমিক-আন্দোলন পুরোপুরিভাবে বুর্জোয়াভাবগ্রস্ত। ধনতন্ত্রের উচ্ছেদের কোনো বাসনাই এদের মধ্যে নেই। সমাজতন্ত্রবাদ মোটে লেবার পার্টির আদর্শ বা অন্তিম লক্ষ্য কি না তা নিয়েও লেবার পার্টির মধ্যে মতভেদ চলেছে। ঠিক এই মুহূর্তে যে অন্তর্বিরোধ লেবার পার্টিতে চলেছে তার উপলক্ষ্য শিল্পের জাতীয়করণ পার্টির প্রোগ্রামে রাখা হবে কিনা! মনে

পড়ে, বছর কয় আগে New Statesman and Nation কাগজে লেবার পার্টির প্রসিদ্ধ চিন্তানায়ক A. J. P. Taylor-এর একটা লেখায় পড়ি, "On the contrary we are becoming reconciled to the idea that capitalism is doing splendidly…" এই হল সার কথা। ধনতান্ত্রিকতার চমৎকারিত্বে মুগ্ধ হয়ে গেছে যে শ্রমিক-আন্দোলন তার মারফত ধনতন্ত্রের অবসান আশা করাটা কি খুব যুক্তিসঙ্গত?

বই দুটোর মূল বক্তব্য নিয়েই এতক্ষণ আলোচনা করলাম। কিন্তু মুখ্য বক্তব্যের আশেপাশে গৌণ আলোচনাও অনেক আছে। "সমসাময়িক ধনতন্ত্র" বইয়ে অর্থনীতির আলোচনা অনেকখানি আছে এবং সে উপলক্ষে বেশ কয়েকবার খুব লম্বা লম্বা সেলাম মার্কসকে ঠোকা হয়েছে। মার্কস ও কীন্‌স্-এর অন্তর্বর্তী যুগের মার্জিনালিস্ট ও অন্যান্য দলের অর্থনীতিবিদ্‌দের সম্পর্কে লেখক অতিশয় অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেন। কীন্‌স্ সম্বন্ধেও স্ট্র্যাচীর উৎসাহ সীমিত-চিন্তক হিসেবে মার্কসের অনেক নীচে তিনি তাঁর স্থান দেন। পণ্যের শ্রমমূল্য সংক্রান্ত থিয়োরির সম্পর্কে তিনি মনে করেন মূলগতভাবে তা সঠিক—যদিও পুংখানুপুংখভাবে তা বাস্তবের সঙ্গে খাপ খায় না। মনোপলি পর্যায়ের ধনতন্ত্র—যার নাম তিনি দেন 'শেষ পর্যায়ের ধনতন্ত্র'—তার কাঠামো এবং প্রবণতাসমূহের বিস্তৃত আলোচনাও আছে। এ আলোচনায় অবশ্য তিনি লেনিনের বিশ্লেষণধারা অনুসরণ না করে Imperfect Competition ধারার আর্থনীতিক সাহিত্যের এবং বিশেষ করে John Galbraith-এর কাঠামো বিশ্লেষণের অনুসরণ করেন। মার্কসের law of pauperisation-এ সীমাহীন ঋজুতা আরোপ করে তার আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি দেখান যে যদিও এর সত্যতা ইতিহাসে প্রতিপন্ন হয় নি তবু law হিসেবে না হলেও শক্তিশালী প্রবণতা হিসেবে যে এর অস্তিত্ব ধনতন্ত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে তা অনস্বীকার্য। তার কারণ গত এক শতাব্দীর উপর ব্রিটেনের জাতীয় আয়ে শ্রমিকদের কি পরিমাণ সংগ্রামই না করতে হয়েছে ভাতা বাড়াবার জন্য, কত আইনই পাশ হয়েছে শ্রমিকদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য! কত "গেল গেল" রবই না উঠেছে ধনতান্ত্রিক মহলে। তবু শেষ পর্যন্ত শ্রমিকেরা যা করতে সমর্থ হয়েছে তা কিনা শুধু ধনিকদের সম্পর্কে নিজেদের আপেক্ষিক অবস্থাটুকু বজায় রাখা! এতসব যদি না করা হত তাহলে তারা যে pauperisation-এর বিধান মেনে গভীর থেকে গভীরতর দারিদ্র্যের পঙ্কে নিমজ্জিত হত তাতে সন্দেহ কি!

'সাম্রাজ্যের অবসান' বইটিতে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের পত্তন সম্পর্কে একটি অধ্যায় আছে। কোম্পানির শাসন সম্বন্ধে স্ট্র্যাচী খুব ভালো ধারণা পোষণ করেন না। এ পর্যায়ের ইতিহাস আলোচনা করতে গিয়ে তিনি এমন অনেক সত্যভাষণ করেন যা ইংরেজের লেখা বইয়ে কদাচিৎই মেলে। ঘুষ, প্রতারণা, গুপ্ত চক্রান্ত, বিশ্বাসঘাতকতা প্রভৃতি যে-সব উপায়ে কোম্পানি ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিল তাদের স্বনামে ডাকতে তিনি পেছপাও হন না। অর্থনৈতিক দিক থেকে কোম্পানির শোষণে যে বাংলা শ্মশানে পরিণত হয়েছিল তাও তিনি স্বীকার করেন। "No Marhatta raid ever devastated a country side with the thoroughness with which both the Company and, above all, the Company's servants in their individual capacities, sucked dry the plain of Bengal"।—এ ধরনের উক্তি একাধিক পাওয়া যায়। কিন্তু ভারতে ব্রিটিশ শাসনের সামগ্রিক ফলাফল সম্বন্ধে স্ট্র্যাচী অতিশয় রঙীন ছবি আঁকেন। ওয়ারেন হেস্টিংসের আগমন থেকেই নাকি এই লুটতরাজী পর্যায়ের অবসান হয় এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ শুধুমাত্র ধ্বংসাত্মক না হয়ে সৃষ্টিশীলও হয়ে ওঠে। এই প্রসঙ্গে স্ট্র্যাচী নিপুণতার সঙ্গে নিজ কাজে লাগান মার্কসের ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কিছু প্রসিদ্ধ উক্তি—যাতে এই মত প্রচার করা হয়েছে যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারতবর্ষের গ্রাম-সভ্যতার ধ্বংস সাধন করে আধুনিক সভ্যতারই প্রবেশের পথ তৈরি করে দিয়েছে। এই সৃষ্টিশীলতার অবদান হিসেবে স্ট্র্যাচী গর্ব সহকারে ভারতে ব্রিটিশ ICS-দের noble and selfless work-এর উল্লেখ করেন। এদের অক্লান্ত পরিশ্রমে দেশে শান্তি ও শৃংখলার প্রতিষ্ঠা হয়, ভারতীয়রা স্বশাসনের অ-আ-ক-খ শেখে। কিন্তু এই সৃষ্টিশীলতাই যে ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ইমারতকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে, পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ উন্নত দেশকে পৃথিবীর দরিদ্রতম কাঙাল দেশে পরিণত করে, তা তিনি মানেন কিন্তু ভাণ করেন (পাঠকদের তিনি শিশু বলে মনে করেন নাকি ?), যেন ঠিক জানেন না এই ফল ব্রিটিশ স্বার্থ-প্রণোদিত কিনা। এই যুগে সাম্রাজ্যবাদের ক্রিয়া যে লুটের পরিবর্তে নিয়মিত ও আইনসম্মত উপায়ে এবং অসম প্রতিযোগিতার মারফত ভারতীয় শিল্পসমূহের ধ্বংসসাধন এবং তদ্বারা ব্রিটিশ শিল্পের স্ফিতীসাধনের আকার নিয়েছিল একথা মেনে নিয়েও—the bones of the cotton weavers are bleaching the plains of India—

মধ্য উনবিংশ শতকের কোনো গভর্নর জেনারেলের এই উক্তির পূর্ণ সমর্থন করেও, তিনি কচি খোকাটির মতো প্রশ্ন করেন, "Why did these virtuous men (অর্থাৎ ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী !) do such terrible things...was laissez faire, free trade dogma, a cloak for imposing the (supposed) interests of Britain upon the subject people ? The question is still a burning one"। হায় রে ! ল্যাঙ্কেশায়ারের মিলের চাকায় যে ভারতের তাঁতীকুলের গলা কাটা গেল তার পিছনে ব্রিটিশ স্বার্থ ছিল কি ছিল না তা নাকি আজও burning question !

"সাম্রাজ্যবাদের অবসান" বইটি সবদিক দিয়েই 'সমসাময়িক ধনতন্ত্র'-এর চেয়ে নিকৃষ্ট। মূল বক্তব্যের দিক থেকেও যেন আনুসঙ্গিক অন্যান্য আলোচনা-গুলোর দিক থেকেও তাই। শিথিল ভঙ্গিতে লিখিত এবং তদধিক শিথিল যুক্তি-সূত্রে গ্রথিত কয়েকটি অধ্যায়ে তিনি উত্তর-সাম্রাজ্যবাদী অধ্যায়ে ব্রিটিশ জাতি কিভাবে ও কি নিয়ে বাঁচতে পারে, কমনওয়েলথ কি অত্যাশ্চর্য একটি সৃষ্টি এবং তাকে কি করে আরও আশ্চর্যজনক করে তোলা যেতে পারে, পশ্চিম-ইওরোপীয় দেশগুলির কেন এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলিকেও অর্থনৈতিক সাহায্য করা উচিত, ব্রিটেন কেমন তার প্রাক্তন বর্তমান উপনিবেশ সমূহের সঙ্গে perfect gentleman-এর মতো ব্যবহার করেছে এবং করছে—এসব ব্যাপারের সম্বন্ধে এলোমেলোভাবে তাঁর মতামত জাহির করে যান। তাদের মূল্য খুব বেশি নয়। তেমনি মূল্যহীন তাঁর নতুন একটা থিয়োরি দাঁড় করানোর প্রচেষ্টা সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে বইটির একেবারে শেষাংশে। ওই কয়েকটি শীর্ণ পাতার মধ্যে যা পাওয়া যায় তাতে একটা থিয়োরি বা থিয়োরির ছায়াও আছে কিভাবে মনে করা যেতে পারে জানি না।

বুর্জোয়া সমাজে রাষ্ট্রের স্বরূপ, "পার্লামেন্টীয় গণতন্ত্রের" গণতান্ত্রিক দৌড়, এই সব ব্যাপারে বিশেষ রকমের জিজ্ঞাসা ভারতবর্ষে নতুন করে দেখা দিয়েছে। আজ পর্যন্ত এমন কিছু তো হয়েছে বলে মনে হয় না যার দ্বারা ভারতবর্ষে রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্বন্ধে মৌল মার্কসবাদী ধারণা বদলানো দরকার বোধ হতে পারে। কেরালার কমিউনিস্ট সরকারকে যেভাবে উৎখাত করা হল তা দিয়ে আর যাই প্রমাণ হোক ভারতে "গণতন্ত্র" নামক একটি শক্তি ভারতের ধনতন্ত্রের বৈরীতা করছে এবং তাকে প্রায় হজম করে ফেলেছে এমন কথা নিশ্চয়ই প্রমাণ হয় না। কিন্তু তাই বলে মৌল প্রশ্ন ওঠাবার অন্য নানা কারণ যে আছে তা অনস্বীকার্য। এ হেন অবস্থায় স্ট্র্যাচীর বই দুটির প্রকাশকে আমাদের সর্বান্তকরণে অভিনন্দন জানানো উচিত। পাঠকেরা বইদুটি পড়ে লাভবানই হবেন এটুকু নিশ্চয়ই বলা চলে।

ঔপনিবেশিকতাবাদ প্রসঙ্গে মার্কস ও এঙ্গেলস

সুনীল সেন

ঐতিহাসিকগণ যাকে "নতুন সাম্রাজ্যবাদ" আখ্যা দেন, ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে যার বিকাশের শুরু, ইতিহাসের সেই পর্বের আলোচনা মার্কস বা এঙ্গেলস করেন নি।* ব্রিটিশ পুঁজিবাদের স্বর্ণ যুগে, "পৃথিবীর কারখানা" বলে ব্রিটেনের খ্যাতি যখন প্রতিষ্ঠিত, "অবাধ বাণিজ্য" যখন তার মন্ত্র—ইতিহাসের সেই পর্বে ঔপনিবেশিকতাবাদের রূপ ও গতি সম্পর্কে মার্কস ও এঙ্গেলসের রচনাবলী এই সংকলনে উপস্থিত করা হয়েছে। ভারত, চীন এবং আয়ারল্যাণ্ডের অবস্থার গভীর অনুশীলন থেকে মার্কস এবং এঙ্গেলস ঔপনিবেশিকবাদ সম্পর্কে কয়েকটি মৌলিক সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত করেছেন যা সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার অন্যতম বনিয়াদ। এই বনিয়াদের উপর লেনিন তাঁর সুবিখ্যাত বই "সাম্রাজ্যবাদ—ধনতন্ত্রের সর্বোচ্চ ধাপ" রচনা করেন। এই প্রবন্ধ-সংকলনটি বিশেষ মূল্যবান হয়ে পড়েছে এই কারণে যে, আজকাল "লাল সাম্রাজ্যবাদ" সম্পর্কে নানা উদ্ভট কথাবার্তা ও প্রচার-অভিযানের মুখে জনসাধারণের মধ্যে বিভ্রান্তি ঘটা অস্বাভাবিক নয়।

ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ধ্বংসাত্মক ভূমিকা সম্পর্কে মার্কসের রচনাবলীর সঙ্গে ইতিপূর্বেই অনুসন্ধিৎসুরা পরিচিত হয়েছেন ; রানাডে এবং রমেশচন্দ্র দত্তের লেখাতেও এই ধ্বংসাত্মক ভূমিকা ধরা পড়েছে। কিন্তু ঔপনিবেশিক সমস্যার মূলে আছে যে ভূমিসমস্যা তার স্বরূপ বুঝতে রামমোহন থেকে রমেশচন্দ্র দত্ত ব্যর্থ হয়েছেন বলে মনে হয়। তাঁরা উভয়ই এবং সাধারণভাবে উনিশ শতকের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে সমর্থন করে গেছেন। ঔপনিবেশিক সমস্যার ক্ষেত্রে মার্কসীয় মতবাদের অন্যতম প্রধান অবদান ভূমিসমস্যার বিশ্লেষণ। ঔপনিবেশিকতাবাদের সঙ্গে ভূমিসমস্যার সম্পর্ক মার্কসই সর্বপ্রথম উদ্‌ঘাটন করেছেন। আধুনিক গবেষকদের কাছে এই

*On Colonialism : K. Marx and F. Engels. Foreign Languages Publishing House, Moscow. (Distributors : National Book Agency Private Ltd., Calcutta 12). Price 1·12 n.P.

সম্পর্কের সূত্র সুবিদিত। কয়েকটি প্রবন্ধে মার্কস আয়ারল্যাণ্ড এবং ভারতের ভূমিসমস্যার আলোচনা করেছেন—আইরিশ টেনাণ্ট রাইট (৫০-৫৩) ; ইণ্ডিয়া (৭৩-৭৪) ; লর্ড ক্যানিংস প্রক্লামেশন অ্যাণ্ড ল্যাণ্ড টেনিওর ইন ইণ্ডিয়া (১৬২-৬৪) ; ইত্যাদি। বাংলার জমিদারী প্রথা সম্পর্কে মার্কসের বক্তব্যের সারমর্ম এই রকম : জমিদারী প্রথার কল্যাণে জনগণ জমির উপর তাঁদের অধিকার হারাল, আর এই অধিকার পেল ট্যাক্স আদায়কারী জমিদারগণ ; কোম্পানীর চাপে প্রাচীন জমিদারগণ প্রায় অবলুপ্ত হলেন, তাঁদের স্থান জুড়ে বসলেন একদল নতুন জমিদার, জমি নিয়ে কেনাবেচা এবং স্পেকুলেশন যাদের ব্যবসা ; রাষ্ট্র এবং কৃষকের মধ্যে গড়ে উঠল স্তরের পর স্তর মধ্যস্বত্বভোগী এবং এই সামাজিক পিরামিডের তলায় নিষ্পেষিত হতে থাকল চাষী। মাদ্রাজ এবং বোম্বাইর রায়তওয়ারী প্রথায় ফরাসী কৃষকের মতো ভারতীয় রায়তের ও জমির উপর স্থায়ী স্বত্ব বর্তাল না এবং জমির দাম বেজায় হ্রাস পেল। ঔপনিবেশিক প্রথার সঙ্গে অনিবার্যভাবে যুক্ত এই ভূমিব্যবস্থা—যে ব্যবস্থায় বঞ্চিত কৃষক দারিদ্র্যের মধ্যে ডুবে থাকে, সেচব্যবস্থা উপেক্ষিত হয়, আর দুর্ভিক্ষ স্বাভাবিক ঘটনা হয়ে পড়ে। কৃষকের দুঃখের পাত্র পূর্ণ হয় ভূমি-করের সঙ্গে লবণ-কর যুক্ত হয়ে। লবণের উৎপাদন এবং বিক্রয়ের উপর সরকারী একচেটিয়া অধিকারের কল্যাণে তাকে লবণের জন্যও দাম দিতে হয়—যে লবণের অফুরন্ত সমারোহ সাগরে এবং দীঘিতে (পৃঃ ৭৪)। উনবিংশ শতাব্দীর বাঙলার নবজাগরণের নায়কগণ তাঁদের মানবতামূলক দৃষ্টি এবং উদার নীতিবাদ সত্ত্বেও ভূমিব্যবস্থার স্বরূপ বুঝতে পারেন নি বলে দেশী মহাজনদের জুলুম, খাজনা বৃদ্ধি, জমি থেকে উচ্ছেদের বিরুদ্ধে সমসাময়িক কৃষক-বিদ্রোহগুলিকে সাধারণভাবে সমর্থন জানাতে পারেন নি। মার্কসীয় পদ্ধতি শুধু লাঙলের পেছনের মানুষটিকে আবিষ্কার করে নি, তাঁর দুঃখ-দৈন্যের জন্য দায়ী যে ভূমিব্যবস্থা তার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করেছে। মার্কসের মতে ইংরেজদের প্রতিষ্ঠিত ভূমিব্যবস্থা, জমিদারী এবং রায়তওয়ারী প্রথা, সরকারের স্বার্থ পূরণ করেছে, কৃষকের নয় (পৃঃ ৭৩)।

মার্কস ভারত এবং চীনে আধুনিক পুঁজিবাদের পুনরুজ্জীবনশীল ভূমিকা অস্বীকার করেন নি। ব্রিটেনের কামান প্রাচীন চীনের রুদ্ধ দরজা ভেঙে ফেলে, চীনের অবগুণ্ঠন উন্মোচিত হয়। বহির্জগতের মুক্ত বায়ুর সংস্পর্শে এসে চীন নবজীবনের স্পন্দনে আলোড়িত হতে থাকে। "জঘন্যতম উদ্দেশ্য"

থাকলেও ইংলণ্ড "অজ্ঞাতসারে ইতিহাসের যন্ত্ররূপে" ভারতের "রুদ্ধস্রো
মর্যাদাহীন নিশ্চেষ্ট জীবনে" প্রাণসঞ্চার করে। বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফের দ্বা
ভারতের রাজনৈতিক ঐক্যকে দৃঢ়তর করা, স্বাধীন সংবাদপত্রের প্রতি
বাষ্পযানের সাহায্যে "ইওরোপের সঙ্গে নিয়মিত এবং দ্রুত যোগাযোগ স্থাপন
"এশিয়ার সমাজের প্রধান আকাজ্ক্ষা—জমির উপর ব্যক্তিগত মালিকানা
প্রতিষ্ঠা" প্রভৃতির মধ্যে ব্রিটেনের পুনরুজ্জীবনশীল ভূমিকার প্রমাণ মেলে
ব্রিটিশ যুগেই "ইওরোপীয় বিজ্ঞানের দ্বারা অনুপ্রাণিত" একদল শিক্ষি
মধ্যবিত্তের আবির্ভাব ঘটে। সর্বোপরি বড় কথা রেলপথ স্থাপনের ফ
ভারত শিল্পযুগে প্রবেশ করে। রেলপথের প্রসারের প্রয়োজনেই ক্রমে গ
ওঠে কয়লা শিল্প, লৌহ ও ইস্পাত শিল্প এবং ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্প। রেলপ
স্থাপনের ফলাফল সম্পর্কে মার্ক্সের ভবিষ্যদ্বাণী প্রায় আক্ষরিক সত্য ব
প্রমাণিত হয়েছে : "রেল চলাচলের আশু এবং দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটাবা
জন্য যেসব শিল্পপ্রক্রিয়ার দরকার, তার ব্যবস্থা ছাড়া একটা বিরাট দেশে বিস্তৃ
রেলপথের সংরক্ষণ সম্ভব নয় ; এবং এর মধ্য থেকে রেলপথের সঙ্গে প্রত্য
ভাবে যুক্ত নয়, এমন সব শিল্পের শাখায় যন্ত্রের ব্যবহার অবশ্যই গড়ে উঠবে
সেইজন্য রেলপথই হবে ভারতে আধুনিক শিল্পের প্রকৃত অগ্রদূত" (পৃঃ ৭৯)

উনিশ শতকের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজ ব্রিটিশ শাসনের পুনরুজ্জীবন
ভূমিকা প্রত্যক্ষ করে অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। অনেক আশা নিয়ে তাঁ
নিয়মতন্ত্র এবং উদারনীতির পথ আঁকড়ে ধরেছিলেন। তাঁদের ভা
ছিল আশাভঙ্গের বিড়ম্বনা। ঔপনিবেশিকতাবাদ সম্পর্কে সমাজতন্ত্রবাদ কো
মোহজাল সৃষ্টি করে না বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদের উদ্গাতা মার্কস
এঙ্গেলস ভারত, চীন এবং আয়ারল্যাণ্ডে ঔপনিবেশিকতাবাদের অবসান কা
করেছেন। মার্কস লিখেছেন : "যতদিন না ব্রিটেনে বর্তমান শাসকশ্রে
শিল্পাশ্রয়ী সর্বহারার দ্বারা অপসারিত হচ্ছে, অথবা হিন্দুরা নিজেরাই ব্রিটি
জোয়াল টেনে ফেলে দেবার মতো শক্তি অর্জন করছে, ততদিন ভারতবা
ব্রিটিশ কর্তৃক ইতস্তত বিক্ষিপ্ত নতুন সমাজের ফল ভোগ করতে পারবে
(পৃঃ ৮০)।

সমাজতন্ত্রবাদ ঔপনিবেশিকতাবাদের বিরোধী, সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধা
ঔপনিবেশিক যুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর অংশগ্রহণের কথা স্থান পায় না। সমাজ
বাদের স্রষ্টা মার্কস ও এঙ্গেলস উপনিবেশের মুক্তি সম্পর্কে গভীর- আস্থা পো

করতেন। ভারতীয় মহাবিদ্রোহ প্রসঙ্গে লেখা তাঁদের প্রবন্ধমালায় এই প্রত্যয় প্রতিফলিত। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের পরে আফ্রিকা ও এশিয়ায় "নূতন সাম্রাজ্যবাদের" নূতন অভিযানের পর্বে এঙ্গেলস আশা প্রকাশ করেছিলেন যে, ভারত, আলজেরিয়া, মিশর ; ওলন্দাজ, পর্তুগীজ এবং স্পেনীয় উপনিবেশগুলি একদিন স্বাধীনতা অর্জন করবে (পৃঃ ৩০৬)। কাউণ্টস্কির কাছে লেখা চিঠিতে ঔপনিবেশিকতাবাদ সম্পর্কে ব্রিটিশ শ্রমিকশ্রেণীর কর্তব্যের যে নির্দেশ এঙ্গেলস দিয়েছিলেন, আজও তা আমাদের কানে বাজবে :

"India will perhaps, indeed very probably, make a revolution, and as a proletariat in process of self-emancipation *can not conduct any colonial works*, it would have to be allowed to run its course" (পৃঃ ৩০৬)।

মধ্যশ্রেণীর ভূমিকা

তরুণ সান্যাল

ধনতন্ত্রের অগ্রগমনের সঙ্গে সঙ্গে পুঁজিবাদী দেশে শ্রেণীবিন্যাসের কি ধরনের অবস্থা হতে পারে, সমাজবিজ্ঞানীর সে সম্পর্কে কৌতূহল থাকা স্বাভাবিক। একশো বছর আগে ভিক্টোরীয় ব্রিটেনে উঁচু-নীচু শ্রেণীর অস্তিত্ব বিষয়ে কারও মতদ্বৈধ ছিল না। বর্তমানের কথা অবশ্য আলাদা। কেননা পুঁজিবাদী ও শ্রমিকশ্রেণীর অস্তিত্বের কথা মেনে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পক্ষে কিছু ভয়াবহ সিদ্ধান্তে পৌছনো সম্ভব। এবং সে সিদ্ধান্ত, খোলা চোখে তাকালে বোঝা যায়, বুর্জোয়া সমাজের আদৌ অনুকূলে যায় না। সুতরাং শ্রেণী আলোচনার ক্ষেত্রে দর্শনীয়ভাবে প্রবণতার পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। বর্তমানে, বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে শ্রেণী আলোচনা তো দূরের কথা, শ্রেণীর অস্তিত্বই অস্বীকার করা হয়ে থাকে। এবং, যদিই-বা শ্রেণীর কথা এড়ানো না যায়, তবে বলা হয় শ্রেণী আসলে একটি মানসিক ধারণা। বস্তুত শ্রেণী বলতে তাদের মতে বোঝায়—ব্যক্তি তার সামাজিক অবস্থা ও আপনাকে বিবেচনা করে কোনো গোষ্ঠীর তকমায় সাজতে চায়। শুধু তাই নয়, এ রকম একটি মানসিক আত্মমূল্যায়ন যদি শ্রেণী বিচারের মাপকাঠি হয়, তবে শ্রমিক-মালিকের শ্রেণীদ্বন্দ্বের কথা ভোলা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। কেননা, ক্রমশ বেশি বেশি সংখ্যায় মানুষ ব্রিটেন বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিজেদের 'মধ্যশ্রেণী'-ভুক্ত বলে ঘোষণা করছে।

বুর্জোয়া সমাজ-বিজ্ঞানীদের তাই উচ্চকণ্ঠ ঘোষণা শোনা যায় যে মার্কসকথিত বুর্জোয়া-সমাজের ভাবী সম্ভাবনা আসলে মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়েছে। কেননা, মার্কস নাকি বলেছিলেন, ধনবাদের অর্থনীতিতে পরস্পর শ্রেণীস্বার্থ-বিরোধী দুটি শ্রেণীর অস্তিত্বই থাকবে। কিন্তু যেহেতু তৃতীয় বৃহত্তম শ্রেণী 'মধ্যশ্রেণী'র (Middle Class) অস্তিত্ব বর্তমানে লক্ষ্য করা যাচ্ছে, সুতরাং বলা যেতে পারে, মার্কসের বিচার ভ্রান্ত ছিল।* ১৯৫৩ সালের একটি Gallop Poll-এ ব্রিটেনে প্রায় শতকরা ৪৯ জন এবং অনুরূপ একটি ভোটগ্রহণে মার্কিন

*Socialism and the Middle Class : Andrew Grant. Lawrence and Wishart. 15 s.

যুক্তরাষ্ট্রে শতকরা ৮৮ জন মানুষ নিজেদের 'মধ্যশ্রেণীভুক্ত' বলে 'মনে' করেছে। বলা বাহুল্য, ঐ একই ভোটের হিসাবে ব্রিটেনে মাত্র শতকরা ৪৬ জন শ্রমিকের হিসাব পাওয়া যায়।

উপরোক্ত তৃতীয় শ্রেণীর সংখ্যাধিক্যের ঐ গুরুত্বপূর্ণ অস্তিত্ব স্বীকার করে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মার্কস কথিত পুঁজিবাদের অবশ্যম্ভাবী পতনের কথা মিথ্যা প্রতিপন্ন হয় এবং ধনবাদী অর্থনীতি যে মানবেতিহাসে সমাজতন্ত্রে পৌছবার একটি অন্তবর্তী স্তর—সে ব্যাখ্যাতেও সন্দিহান হতে হয়। কমিউনিস্ট ইস্তাহারের (১৮৪৮) যে উক্তিটির উপরে এত বিবাদ, তা হল "...the former lower strata of the middle class—the small manufacturers, traders, and persons living on small incomes, the handicraftsmen and peasants—all these sink gradually into the proletariat··· ।" অথচ সংখ্যাগরিষ্ঠ তৃতীয় 'মধ্যশ্রেণী' প্রমাণ করছে যে বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েত শ্রেণীদ্বয় ভেঙে ভেঙে অফিস-কর্মচারী, টেকনিশিয়ান ও অন্যান্য 'স্বাধীন' জীবিকাসম্পন্ন ব্যক্তিরা তৃতীয় শ্রেণী নির্মাণ করেছে। এবং ধনবাদী সমাজে নেতৃত্ব গ্রহণ করার ফলে, তারা নাকি বুর্জোয়াজিকে তাদের মতের অনুকূলে পরিচালিত করছে। দক্ষিণপন্থী, এমনকি 'বামপন্থী' সমাজতন্ত্রীরাও এই অবস্থা বিপর্যয়ে সমাজতন্ত্র বলতে এক সোনার পাথরের বাটির কথা ঘোষণা করে কেউ বা যৌথমূলধনী ধনতন্ত্রকে 'জনগণের ধনতন্ত্র' বলে আখ্যা দিয়ে গদগদ কণ্ঠ!

এবার দেখা যাক মার্কসের বিচারে কতটা ভুল ছিল। কিন্তু সে বিচার আদৌ সম্পূর্ণ হতে পারে না, যদি না আমরা মার্কসীয় শ্রেণী বিচারের মাপ-কাঠি ব্যবহার করি।

কিন্তু শ্রেণী কী? অমার্কসবাদী মহলে একজন ব্যক্তি কোন্ শ্রেণীতে নিজেকে ফেলতে চায় তারই উপর ভিত্তি করে শ্রেণীর কথা বলা হয়ে থাকে। কেউ বলছেন শ্রেণী বলতে বোঝায় সেই গোষ্ঠী, যেখানে ব্যক্তি পরস্পর-সাধারণ কিছু চিহ্ন বা ব্যবহারের মিল অনুযায়ী নিজেকে সমশ্রেণী বলে গণ্য করে। অর্থাৎ কোনও বৃহৎ গোষ্ঠীর সঙ্গে আপনার ক্ষুদ্র ব্যক্তিটির আত্ম-সমীকরণই বিশেষ শ্রেণীকে স্বীকৃতি দেয়। এক্ষেত্রে ব্রিটিশদের থেকেও মার্কিনদেশীয়রা অনেক বেশি-সংখ্যায় নিজেদের 'মনে করে' (feels) তারা মধ্যশ্রেণীভুক্ত।

মার্কসবাদীরা কিন্তু উৎপাদন যন্ত্রের সঙ্গে উৎপাদন সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে শ্রেণী আলোচনা করে। যেমন লেনিনের একটি উক্তির উল্লেখ করা যাক :

"Classes are large groups of people which differ from each other by the place they occupy in a historically definite system of social production, by their relation (in most cases fixed and formulated in laws) to the means of production, by their role in the social organisation of labour, and, consequently, by the dimensions of the social wealth that they obtain and their method of acquiring their share of it."

উপরোক্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী কিন্তু আমরা বলতে পারি, ব্রিটেনে (কেননা আলোচ্য দেশটি আপাতত ব্রিটেন) বর্তমানে দুটি গুরুত্বপূর্ণ শ্রেণী রয়েছে— পুঁজিবাদী ও শ্রমিকশ্রেণী। তাদের মাঝামাঝি, বহু ধরনের গোষ্ঠী রয়েছে যারা উৎপাদনের বর্তমান অবস্থায় ঠিক উৎপাদন যন্ত্রের সঙ্গে একই সাধারণ সম্পর্কে সম্পর্কযুক্ত নয়। মার্কসীয় ধারায় আমরা বরং তাদের মধ্যস্তর অথবা মধ্যগোষ্ঠীসমূহ আখ্যা দিতে পারি। এবং, সবচেয়ে আশার কথা হল, এই গোষ্ঠীসমূহের মধ্যেও এত দ্রুত পরিবর্তন ঘটে চলেছে যে ব্রিটেনে শ্রমিকশ্রেণীর পেছনেই তারা বেশি বেশি সংখ্যায় অনুকূল স্বার্থের তাগিদে জমায়েত হচ্ছে। এবং এইটাই বাস্তব সত্য।

মার্কসবাদ তৃতীয় শ্রেণীর কথা আদৌ অস্বীকার করে না। মার্কসবাদী আলোচনায় বলা হয়ে থাকে, ধনবাদী উৎপাদন সম্পর্কের মধ্যে, পূর্ববর্তী (ফিউডাল) উৎপাদন পদ্ধতির উৎপাদন-সম্পর্কের অংশবিশেষ অবশিষ্ট থেকে যায়। এবং অবধারিতভাবে বহু সামাজিক স্তর বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েতের মধ্যে নির্মাণ করে। মার্কসবাদ বস্তুত 'মধ্যস্তরসমূহের' অস্তিত্ব অস্বীকার করে না, বরং মনে করে যে ছোট উৎপাদনকারী বুর্জোয়াদের একাংশ প্রলেতারিয়েত বনে যায়, আবার প্রলেতারিয়েতদের মধ্যে উঁচু স্তরের কেউ কেউ বুর্জোয়াশ্রেণীতে প্রবেশ করে। কিন্তু এই গমনাগমন বুর্জোয়া অর্থনীতির সমস্যাগুলি সংহার করে না। মার্কস-এঙ্গেলসের যে বক্তব্যকে বুর্জোয়া সমাজ-বিজ্ঞানীরা মিথ্যা বলে ঘোষণা করতে চাইছেন, অথচ তাতেই বলা হয়েছিল যে ছোট ব্যবসায়ীরা, দোকানদার ও অবসর-পাওয়া বণিকেরা, হস্তশিল্পীবৃন্দ ও কৃষকেরা—এই পুরাতন মধ্যসম্প্রদায় (প্রাক ধনবাদী উৎপাদন-পদ্ধতির অংশ

গ্রহণকারী—যারা বর্তমান ধনবাদের জগতে উত্তীর্ণ হয়েছে) শারীরিক অর্থে লুপ্ত হয়ে যাবে না, তাদের আর্থিক status বদলে যাবে এবং তাদের 'স্বাধীন সামাজিক শক্তি' হিসাবে মূল্যহানি ঘটবে। এক কথায় বলা যায়, মার্কসবাদীরা এক মধ্যশ্রেণীর অস্তিত্বও স্বীকার করে, কিন্তু পুরাতন ও নতুনে অনেক তফাত দেখা যায়। মার্কস-এঙ্গেলস পরিষ্কারভাবে বলেছিলেন :

"In countries where modern civilization has become fully developed, a new class of petit-bourgeoisie has been formed, fluctuating between proletariat and bourgeoisie, and ever renewing itself as a supplementary part of bourgeois society."

আত্মবিঘোষিত 'মধ্যশ্রেণী'-ভুক্ত বহুসংখ্যক ব্যক্তির মূল স্থান কোথায়, সে বিষয়েও প্রশ্ন করার অবকাশ আছে। যেমন ধরা যাক নিম্নলিখিত উক্তিটি :

"...salaries at the lowest levels are barely distinguishable from wages, which are the characteristic incomes of the working classes...there is growing tendency for lesser salary earners to join Trade Union Congress and regard themselves as belonging with, and in many cases, to the working class movement." (British Journal of Sociology, December 1950) অনমতি বিস্তরেন !

তথাপি কায়িক ও মানসিক শ্রমের মধ্যে তফাত করে, শ্রেণীগত ভেদ আনবার চেষ্টা চলেছে। সেক্ষেত্রে বর্তমান টাইপরাইটার, ইলেকট্রনিক্সের দাক্ষিণ্যে হিসাবনিকাশ, অটোমেশন ইত্যাদি সমস্ত বিচারে দেখা যাবে উভয় শ্রমের মধ্যে প্রভেদ টেনে শ্রেণীর তফাত করা মুস্কিল। অর্থাৎ ক্রমশ যান্ত্রিক উদ্ভাবনের দাক্ষিণ্যে, ইতিপূর্বে যারা নিজেদের শ্রমিকশ্রেণী থেকে সাদা জামাকাপড়ের বহিরঙ্গবিন্যাসে তফাত করে রাখত, তারা বেশি বেশি করে নিজেদের শ্রমিকশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ও আত্মীয় বলে মনে করছে। শ্রেণী বিচারের ক্ষেত্রে বাস্তব অবস্থা আসলে এই রকম।

সুতরাং, মধ্যস্তরের আলোচনার মধ্যে বাস্তব অর্থে শ্রমিকশ্রেণীর সমর্থক শক্তিটির প্রাধান্যই নজরে পড়ে বেশি। আলোচনা করলে দেখা যায় পুরাতন মধ্যস্তরগুলি বলতে বোঝায় ছোটচাষী, কারুশিল্পী, দোকানকার প্রভৃতি, এবং বর্তমান নতুন মধ্যস্তরগুলি নির্মিত হয়েছে রাষ্ট্রযন্ত্রের উচ্চপদস্থ কর্মচারীবৃন্দ, সাধারণ কর্মচারীবৃন্দ, ইঞ্জিনিয়ার, টেকনিসিয়ান, বুদ্ধিজীবী (বিজ্ঞানী, শিক্ষক,

ডাক্তার, আইনব্যবসায়ী, কারুশিল্পী, ভাস্কর, সাংবাদিক, লেখক, শিল্পী, ছাত্র ও ধর্মব্যবসায়ীবৃন্দ) প্রভৃতির দ্বারা। এই নতুন মধ্যস্তরের যে অংশগুলির সঙ্গে শাসকশ্রেণী বুর্জোয়াদের খুব মুখ চেনাচেনি রয়েছে (যেমন রাষ্ট্রযন্ত্রের কর্ণধারগণ ও উচ্চশ্রেণীর অফিসারগণ, কারখানার উচ্চপদস্থ ইঞ্জিনিয়র, ম্যানেজার প্রভৃতি), তাদের স্বার্থ বুর্জোয়াজির স্বার্থের সঙ্গে জড়িত এবং অন্যান্য অংশগুলির সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থের সংগ্রাম বিশেষভাবে জড়িত। মার্কস-এঙ্গেলস এই প্রবণতার দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করেছিলেন।

অ্যাণ্ড্র গ্র্যান্টের বইখানি তাই খুবই সময়োপযোগী, যখন পৃথিবীর দেশে দেশে (এমনকি ভারতবর্ষেও) মধ্যস্তরগুলির গরিষ্ঠাংশের স্বার্থ শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থের সঙ্গে যুক্ত বলে মনে করা হচ্ছে। বিলেতে এবং অন্যান্য দেশে 'মধ্যশ্রেণী'র অনেকগুলি ক্ষতিকর দিকেও কখনও কখনও প্রবণতা হতে পারে। সমাজতন্ত্র গঠনের আন্দোলনে মধ্যস্তরভুক্ত ব্যক্তিদের একচেটিয়া পুঁজিবাদ 'মধ্যশ্রেণীর' শিরোপা দিয়ে দূরে রাখতে প্রয়াস পেতে পারে। কখনও কখনও 'জাতীয়তার' নাম করে এই মধ্যশ্রেণীকে উদ্গ্রীব ও 'সমাজতন্ত্রের' কপট পাশায় শ্রমিক-শ্রেণীকে ভোলাতে পারে। মধ্যস্তরগুলির মানুষের চৈতন্যের দুর্বলতার সুযোগ নিয়েই এরূপ দুর্ঘটনা ঘটানো সম্ভব। জীবনযাপনের মানের দ্রুত হ্রাস, বেকারী এবং সর্বোপরি কর্ণজপনক্রিয়ায় শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থের বিরোধী বলে নিজেদের মনে করানো, জাতীয় স্বাধীনতা বিপন্ন ইত্যাদির ধুয়া একচেটিয়া পুঁজিপতিদের হাতে ফ্যাসীবাদের আয়ুধ তুলে দিতে পারে। বামপন্থীদের তাই কর্তব্য হবে, মধ্যস্তরের গরিষ্ঠাংশ, যারা স্বার্থে, বেতনে বস্তুত শ্রমিকশ্রেণীর সমগোত্র, যাদের বুর্জোয়াদের গা-ঘেঁষাঘেঁষিতে স্বার্থবৃদ্ধি হয় না—দ্রুত ট্রেড ইউনিয়নের আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করে তাদের শ্রমিকশ্রেণীর সমাজতন্ত্রের লড়াইতে সামিল করানো।

অ্যাণ্ড্র গ্রাণ্ট যদিও বিলেতের পরিপ্রেক্ষিতে বইখানি লিখেছেন, তবুও বিশ্বের মার্কসবাদী আন্দোলন এ গ্রন্থখানিতে যথেষ্ট উপকৃত হবে, মার্কসবাদীদের নিকটে ব্রিটেনের অর্থ নৈতিক ইতিহাস সব সময়েই কৌতূহলের বিষয়।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন

সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

বাংলার বৈষ্ণব ধর্ম অতি প্রাচীন। পাহাড়পুরের আবিষ্কারে দেখা গেছে যে বাংলার কৃষ্ণভক্তি অন্তত দেড় হাজার বছরের পুরানো। ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানেও বৈষ্ণব ধর্ম প্রচলিত ছিল। কিন্তু বাংলার বৈষ্ণব মত এ দেশেরই প্রাকৃত বস্তু। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আপন মনীষাবলে বাংলার প্রাকৃত বৈষ্ণব ধর্মকে নানামতের ভক্তি সিদ্ধান্তের সঙ্গে যুক্ত করে একটি অভিনব মতবাদ সৃষ্টি করেন।

বৈষ্ণব ধর্মের মূলীভূত দর্শন ও দার্শনিক তত্ত্বসমূহের নাম 'অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ'। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ বলেন, শ্রীচৈতন্যদেব দশ-মূল-শ্লোকে 'অচিন্ত্যভেদাভেদ' প্রতিপাদন করেন। শ্রীজীব গোস্বামী, শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী, শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ, শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রভৃতি বৈষ্ণব দার্শনিকেরা চৈতন্য-দেবের সিদ্ধান্তের অনুবর্তন করে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের বিস্তার করেন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় ভারতীয় বৈদান্তিক-বৈষ্ণব সম্প্রদায়েরই একটি শাখা। অন্যান্য বৈদান্তিক-বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মতো (যথা রামানুজের 'বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ', নিম্বার্কের 'দ্বৈতাদ্বৈতবাদ', মধ্বাচার্যের 'দ্বৈতবাদ', বিষ্ণুস্বামীর 'শুদ্ধাদ্বৈতবাদ' প্রভৃতি) গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরাও ভক্তিবাদী। তবে, গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ অনেকখানি নিম্বার্ক, বল্লভ প্রভৃতির সগোত্র। রামানুজ, মধ্বাচার্য প্রভৃতি বৈষ্ণব-বৈদান্তিকেরা ভক্তিবাদী হলেও, গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের সঙ্গে এঁদের পার্থক্য সুস্পষ্ট। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ 'পরমতত্ত্ব' ও এই তত্ত্বের 'শক্তি'-র সম্পর্ক আলোচনাপ্রসঙ্গে 'রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব'-এ উপনীত হয়েছেন। এঁদের মতে পরমতত্ত্ব শুধু ষড়ৈশ্বর্যময় সর্বশক্তিমান ঈশ্বর নন। তাঁর ঐশ্বর্যের বিভূতি দেখিয়ে তিনি শুধুই ভীতি উৎপাদন করেন না। অপরপক্ষে, পরমতত্ত্ব মাধুর্যময়, তিনি অতিমধুর—লাবণ্যের খনি। সকল জীবকে তিনি মাধুর্যের দ্বারা আকৃষ্ট করে নেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের 'বৃন্দাবনলীলা'য় পরমতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণের এই অন্তরঙ্গ মধুর রূপটিই প্রকাশিত।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন (চার খণ্ড)। শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ। প্রাচ্যবাণী মন্দির, কলিকাতা।

রামানুজ, মধ্ব 'প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার্যদের মতে বিষ্ণু বা নারায়ণই মুখ্য তত্ত্ব। লক্ষ্মী বিষ্ণুর শক্তিস্বরূপিনী। লক্ষ্মী-নারায়ণ বৈকুণ্ঠ-বিহারী। লক্ষ্মীনারায়ণ তত্ত্বে মাধুর্যরূপ নয়, পরমতত্ত্বের ঐশ্বর্যরূপই প্রধান কথা।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যগণ অন্যান্য বৈদান্তিক-বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের দার্শনিক মতবাদ খণ্ডন করেছেন। তবে, শংকরের মায়াবাদের সঙ্গেই তাঁদের বিরোধ আত্যন্তিক। শংকরপন্থীদের সম্পর্কে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের অভিযোগ এই যে, শংকরপন্থীরা শ্রুতিবাক্য ব্যাখ্যায় গৌণীবৃত্তির আশ্রয় নিয়েছেন। শ্রুতি স্বতঃপ্রমাণ। শ্রুতির মুখ্য অর্থ বর্জন করে, কষ্টকল্পনার সাহায্যে, শংকর-পন্থীরা এর গৌণ অর্থের সন্ধান করে, মনগড়া ভাষ্যই প্রতিষ্ঠিত করবার প্রয়াস করেছেন। শংকরের মতে ১। ব্রহ্মই পারমার্থিক তত্ত্ব। ব্রহ্মের অপেক্ষা উচ্চস্তরের এবং ব্রহ্মের সমকক্ষ দ্বিতীয় অন্য কোনো 'তত্ত্ব' নেই। শুধু তাই নয়। ব্রহ্মের অপেক্ষা নিম্নস্তরের তত্ত্বও (জীব ও জগৎ) শংকর স্বীকার করেন না। শংকর মরমী সাধকের যে চিত্তভূমি হতে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা আরম্ভ করেছেন সেখানে ব্রহ্মই এক, অদ্বিতীয় তত্ত্ব। ব্রহ্ম নির্বিশেষ, সজাতীয়-বিজাতীয়স্বগতভেদরহিত, নির্গুণ, সচ্চিদানন্দ তত্ত্ব। ২। জীব ও জগৎ ব্রহ্মের 'পরিণাম' নয়—শুধুই 'বিবর্ত' (illusorily superimposed)। শংকর 'মায়াবী' ও তার 'মায়াশক্তি'র দৃষ্টান্ত দেখিয়ে বলছেন যে, বস্তুত, ব্রহ্ম (কারণ)-এর সঙ্গে জগৎ (কার্য)-এর কোনো সম্পর্ক নেই। প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, জগৎ ব্রহ্মে অধ্যস্ত। একথা সত্য যে জগৎ-জ্ঞান ব্রহ্মোপলব্ধির পূর্ব পর্যন্ত সত্যরূপে প্রতীত হয়। কিন্তু ব্রহ্মোপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গেই এই জ্ঞান বাধিত (cancelled) হয়ে যায়। শংকর সেজন্য জগৎকে 'সৎ-অসৎ-বিলক্ষণ-অনির্বচনীয়' বলেছেন। জগৎ পরিপূর্ণ সৎ (real) নয়, কেননা জগৎ-জ্ঞান বাধিত হয়। আবার জগৎ-কে 'গগনকুসুম' 'শশশৃঙ্গ' প্রভৃতির মতো অসৎও বলা চলে না, কেননা অসৎপদার্থ (imaginary no-fact) কখনও প্রতীতিগোচর হয় না। কাজেই শংকরের মতে জগৎ সৎ, অসৎ—দুই-ই ; অর্থাৎ অবর্ণনীয় (logically indescribable)। শংকরের পরিভাষায় 'সৎ-অসৎ-বিলক্ষণ-অনির্বচনীয়'-ও যা, "মায়াও" তাই।

শংকর 'ব্রহ্ম' ও 'ঈশ্বর'-এর মধ্যে পার্থক্য করেছেন। ঈশ্বর 'ব্যবহারিক' স্তরের তত্ত্ব। ধর্মানুভূতির পথে তত্ত্বজিজ্ঞাসায় অগ্রসর হলে যে তত্ত্বে উপনীত হতে হয়, সেই তত্ত্বই 'ঈশ্বর'। কিন্তু অনুভূতির আরও উচ্চতর স্তরে—

সাধকচৈতন্যের উচ্চতম ভূমিতে, পারমার্থিক দৃষ্টিতে, 'ঈশ্বর' মিথ্যা, মায়ামাত্র। একথা সত্য যে ব্যবহারিক স্তরে ঈশ্বর জীবের উপাস্য দেবতা। কিন্তু 'পারমার্থিক' স্তরে উপাস্য-উপাসকের ভেদ রহিত হয় এবং সে স্তরে 'জীব' ও 'ব্রহ্ম' এক।

শংকর জ্ঞানবাদী। তাঁর মতে ব্রহ্মজ্ঞানই মিথ্যা জগৎ-প্রতীতির নিষেধ করতে পারে। ব্রহ্মকে 'ব্রহ্ম' হিসাবে জানলে এবং আত্মাকে ব্রহ্ম হিসাবে জানলে, অজ্ঞান বিনষ্ট হয়। কাজেই, শংকরের মতে ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মজ্ঞানই একমাত্র সাধন, ব্রহ্মাবগতিই একমাত্র পুরুষার্থ।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যগণ শ্রীমদ্ভাগবতকে শাস্ত্রশিরোমণি মনে করেন। শ্রীমদ্ভাগবত-অনুসারী ভাষ্য, টীকা প্রভৃতি গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের নিকট আদরনীয়। এঁদের মতে তত্ত্ব (পরব্রহ্ম) এক, তবে এই তত্ত্বের শক্তি বিচিত্র। সশক্তিক পরব্রহ্মই বৈষ্ণবদের মতে পরতত্ত্ব। এই পরতত্ত্বকে বৈষ্ণবেরা বলেন 'শ্রীকৃষ্ণ' অথবা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সর্বাংশী। তিনি সর্বাশ্রয়। শ্রীকৃষ্ণ (পরতত্ত্ব) বিশুদ্ধ নির্মল প্রেম, রসময়, সকলসদ্‌গুণবৃন্দরত্নরত্নাকর। তিনি বিদগ্ধ, ধীর, রসিকশেখর। বৈষ্ণবেরা বলেন যে ব্রহ্ম—পরমাত্মা (ঈশ্বর) ও শ্রীকৃষ্ণ—একই তত্ত্ব। ভাগবৎতত্ত্ব 'এক', 'অদ্বিতীয়' সন্দেহ নেই। তবে 'শক্তি'র প্রকাশভেদে একই পরতত্ত্ব বিভিন্ন নামে, বিভিন্ন নিত্যরূপে, নিত্যগুণে প্রকাশিত। বৈশিষ্ট্য বা ধর্ম যেখানে অপ্রকাশিত, সেখানে পরতত্ত্বের নাম 'ব্রহ্ম'। তারপর ঈশ্বর। ঈশ্বর সর্বব্যাপক ও সর্বনিয়ন্তা। ঈশ্বরের সহায়তায় সব কিছুরই সত্তা। তিনি 'মায়া' ও 'জীব'কে প্রকট করে, নিয়মন করেন। পরতত্ত্বের পূর্ণতম আবির্ভাবই শ্রীকৃষ্ণ। শংকরপন্থীদের 'নির্গুণ' ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণেরই অসম্যক্‌ প্রকাশবিশেষ। যোগীর পরমাত্মা (ঈশ্বর) সেই পরতত্ত্বেরই আংশিক প্রতীতিমাত্র।

> "প্রকাশ-বিশেষে তেঁহো ধরে তিন নাম।
> ব্রহ্ম, পরমাত্মা আর স্বয়ং ভগবান॥"

শক্তিমান পরব্রহ্মের অচিন্ত্য, অনন্ত শক্তিসমূহ নিত্যসিদ্ধ। এই শক্তি ত্রিবিধ। ১। অন্তরঙ্গ স্বরূপশক্তি বা চিৎশক্তি। ২। তটস্থাশক্তি (marginal or intermediate powers)। ৩। বহিরঙ্গ মায়াশক্তি বা জড়শক্তি। চিৎ-শক্তির আবার তিনটি রূপ। ১। সৎ-অংশে সন্ধিনী অর্থাৎ অপ্রাকৃত সত্তাবিধায়িনী শক্তি। ২। চিৎ-অংশে সম্বিৎ বা কৃষ্ণজ্ঞান। ৩। আনন্দাংশে 'হ্লাদিনী', অর্থাৎ কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তের আনন্দদায়িনী শক্তি।

চিৎশক্তি সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপে অবস্থিত। এবং চিৎশক্তি পরতত্ত্বের স্বাভাবি শক্তি। এই শক্তিবলে শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপানন্দ অনুভব করেন এবং এই শক্তি ভক্তচিত্তে সঞ্চারিত হয়ে ভগবৎপ্রীতিরূপে প্রেমরসের হেতু হয়।

ভগবৎস্বরূপের বাইরে মায়াশক্তি অবস্থিত। ঈশ্বরের এই শক্তি যদি বহিরঙ্গ, তবুও, এই শক্তিতেই 'মায়া' বিশ্বের সৃষ্টি করে এবং এই শক্তিবলে জীব মোহিত হয়। একদিকে 'চিৎ-শক্তি' অন্যদিকে 'মায়াশক্তি', এ দুটি কোনোটিরই অন্তর্ভুক্ত নয়, এমন একটি পৃথক শক্তিকে বৈষ্ণবেরা 'তটস্থা শক্তি (জীবশক্তি) বলেন। জীব 'জীবশক্তি বিশিষ্ট' শ্রীকৃষ্ণেরই অংশ। তট যেম নদীর অন্তর্ভুক্ত নয়, তীরভূমিরও অন্তর্ভুক্ত নয় তেমনি জীবশক্তি 'চিৎ-শক্তি'-ও নয়, আবার শুধু মায়াশক্তিও নয়। ঈশ্বর তুলনীয় সূর্যের সঙ্গে আর জীবের তুলনা সূর্যের রশ্মিপরমাণুর সঙ্গে। শক্তিরূপেই 'জীব' পরব্রহ্মে অংশ। কিন্তু রশ্মিকণা যেমন সূর্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ অভিন্ন নয়, জীবও তেম পরব্রহ্মের সঙ্গে সম্পূর্ণ অভিন্ন নয়।

'ভেদ' ও 'অভেদ', 'এক' ও 'বহু', 'পরব্রহ্ম' ও 'জীবজগৎ' প্রশ্ন আলোচনায় বৈষ্ণবাচার্যেরা 'কেবলাদ্বৈতবাদ' তো বর্জন করেছেনই, অন্য বৈষ্ণব-বৈদান্তিক সম্প্রদায়ের বক্তব্যও বর্জন করেছেন। বৈষ্ণবেরা একদিকে 'বস্তুপরিণামবাদ' বর্জন করেছেন অন্যদিকে শংকরের 'মায়াবাদ'ও (বিবর্তবাদ বর্জন করেছেন। বৈষ্ণবেরা শক্তিপরিণামবাদী। সেজন্য এঁরা বলেন, পরব্র স্বয়ং 'এক', অবিকৃত, অদ্বয়তত্ত্ব। কিন্তু 'জীবশক্তি' ও 'মায়াশক্তি'- পরিণতির ফলে জীব ও জগৎ-এর আবির্ভাব। অদ্বিতীয় ব্রহ্মতত্ত্ব ও ভেদ' জীবজগৎ-এর সম্পর্ক বোঝাতে গিয়ে বৈষ্ণবেরা 'কস্তুরী' ও এর 'গন্ধ', 'অ ও 'দাহিকাশক্তি' প্রভৃতির দৃষ্টান্ত দিয়ে থাকেন। কস্তুরীর গন্ধরূপশক্তি আর অগ্নির দাহিকাশক্তিকে কস্তুরী বা অগ্নি থেকে পৃথক বা ভিন্ন করা যা না। আবার 'শক্তিমান' ও 'শক্তি' সম্পূর্ণ অভিন্নও নয়। বৈষ্ণবেরা সেজ বলেন 'শক্তি' ও 'শক্তিমান'-এর মধ্যে 'ভেদ'ও আছে 'অভেদ'ও আছে অর্থাৎ তাঁদের মতে 'ভেদাভেদবাদ'ই প্রকৃত দার্শনিক সিদ্ধান্ত। এ 'ভেদাভেদবাদ' শংকরের অনিবাচ্যবাদ বা মায়াবাদ নয়,—অচিন্ত্য (inexpli cable)। তর্কের দ্বারা ভেদাভেদ সিদ্ধান্ত হয়তো অগম্য, কিন্তু জীবগোস্বামী ভাষায় এই সিদ্ধান্ত 'শ্রুতার্থাপত্তিজ্ঞানগোচর'—শব্দমূলক, বেদপর অর্থাপ প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ (presumptive proof)।

জ্ঞানবাদী শংকরের মতে মোক্ষ (=ব্রহ্মজ্ঞানই) পরমপুরুষার্থ। ভক্তিবাদী গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের মতে জ্ঞানকর্মযোগ উপায়মাত্র—পরমপুরুষার্থ নয়। এঁদের মতে, 'ভগবৎপ্রীতি' অথবা 'প্রেম'ই, পুরুষার্থ শিরোমণি। প্রেম-ভক্তি একাধারে উপায় ও উপেয়—দুই-ই। প্রেমভক্তিই মানবজীবনের মূল প্রয়োজন।

শ্রুতি পরতত্ত্বকে 'রসো বৈ সঃ', 'অয়মাত্মা সর্বেষাং ভূতানাং মধুঃ' বলে বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ পরতত্ত্ব শংকরের 'নিগুর্ণ ব্রহ্ম' নন—যে ব্রহ্মে জীবজগৎ ত্রিকালবধিত। শংকরের ব্রহ্ম অমূর্ত তত্ত্ব—শুধুই metaphysical abstraction। পরতত্ত্ব পরিপূর্ণ, সর্বশক্তিমান, স্বরূপশক্তির সঙ্গে লীলারত, রসময়, মধুময় পুরুষ। তিনি চিৎ-বিলাসী—পুরুষোত্তম (Infinite Person).

বৈষ্ণবেরা বলেন যে, ভক্তির ভূমিতে পরতত্ত্বের সাক্ষাৎ আকর্ষণ অনুভূত হয় এবং এই আকর্ষণের গণ্ডীর মধ্যে এলে আর পতনের ভয় থাকে না। পরতত্ত্বের রসস্বরূপে যিনি মজেছেন, ইতর রসে তার আর আকর্ষণ থাকে না। এমন ভক্তিমার্গের পথিকই প্রকৃত রসিক—তিনিই প্রেমিক, তিনিই ভক্ত।

ভক্তির স্বরূপ নিয়ে ভক্তিশাস্ত্রে আলোচনা আছে, গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরাও আলোচনা করেছেন। 'ভক্তিপ্রেমরূপ', 'ভক্তি অনন্যা অব্যভিচারিণী', 'ভক্তি অহৈতুকী, ও অপ্রতিহতা' ইত্যাদি প্রকারের বিভিন্ন বর্ণনা ভক্তিশাস্ত্রে সুলভ। প্রেমভক্তির তাৎপর্য হচ্ছে একশরণত্বে বা অনন্যশরণত্বে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অনন্যা ভক্তির দ্বারাই সুলভ। অব্যভিচারী ভক্তিযোগে তাঁকে সেবা করলে তাঁকে লাভ করে অমৃতত্বের অধিকারী হওয়া যায়। এবং ভগবানের স্বরূপই এমন যে তিনি প্রীতির বশীভূত হন। তিনি ভালবাসা চান, ভালবাসেন ও ভালবাসার বশীভূত হন।

জ্ঞানবাদীর 'মোক্ষ' যেমন নিত্য, ভক্তিবাদীর 'প্রেম'-ও তেমনি নিত্য।

"নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয়।
শ্রবণাদি শুদ্ধচিত্তে করয়ে উদয় ॥"

প্রেম সাধ্য নয়। কেননা সাধ্য হলে 'প্রেম অনিত্য' একথা স্বীকার করতে হয়। কিন্তু ভক্তিমার্গের সাধক এক 'নিত্যসিদ্ধ ভূমি'র কথাই বলেন। এই 'নিত্যসিদ্ধ ভূমি' এক মহাপ্রকাশের—এক পরমানন্দের অবস্থা। 'ভাগবতী-প্রীতি' বা 'শ্রদ্ধা ভক্তি' বা 'প্রেম'-এর লক্ষণ গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা নানাভাবে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। এই প্রীতি স্বতঃস্ফূর্ত—কোনও বিধির অপেক্ষা

কিংবা বিচারের অপেক্ষা না রেখে এই প্রীতির স্ফূর্তি হয় ভক্তহৃদয়ে (অনপেক্ষিতবিধিঃ)। এই প্রীতি নিজের রসে রসময়ী, হ্লাদিনীর বৃত্তিবলে স্বতঃই মধুরে (স্বরসত এব সমুল্লসন্তী)। এর মধ্যে ইহলোকের সুখস্বাচ্ছন্দ্য প্রভৃতির বাসনা প্রবেশ করতে অক্ষম (বিষয়ান্তরৈরনবচ্ছেদ্যা)। এই ভাগবতীপ্রীতি কখনও অন্যতাৎপর্য সহ্য করতে পারে না। যে স্থলে সাংসারিক প্রসঙ্গ কিংবা মোক্ষাদির প্রসঙ্গ ওঠে, ভুক্তিমুক্তিবাসনা বিদ্যমান থাকে, সেস্থলে ভাগবতীপ্রীতির অস্তিত্ব সম্ভব নয় (তাৎপর্যান্তরমসহমানা)। ভক্তি বা ভাগবতীপ্রীতি মধুর, অতিমধুর, মধুর হতেও অনেক মধুর (পীযূষপূরতোঽপি সরসেন স্বেনৈব স্বদেহং রসয়ন্তী)।

ভাগবতীপ্রীতি বা প্রেম যাঁর চিত্তে আবির্ভূত হয় তাঁর মধ্যে সমস্ত সদ্‌গুণের সমাবেশ হয়ে থাকে (সর্বগুণৈকনিধান-স্বভাবা)। যাঁর চিত্তে এই প্রীতির আবির্ভাব ঘটে, শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি সম্পাদনের জন্যই তাঁর একমাত্র বাসনা জন্মে। ইহলোকের সুখ, পরলোকের স্বর্গাদিলোকের সুখ এবং মোক্ষ—এসব পুরুষার্থরূপ সম্পত্তি ভাগবতীপ্রীতির দাসীতুল্য হয়ে যায়, তুচ্ছ হয়ে পড়ে (দাসীকৃতাশেষ-পুরুষার্থসম্পত্তিকা)। তখন সেবাদ্বারা প্রিয়তমের প্রীতি-বিধানই একমাত্র কর্তব্য হয়ে ওঠে, এবং অন্য কোনো বাসনা ভক্তচিত্তে ক্ষণকালের জন্যও স্থান পায় না (ভগবৎপাতিব্রত্য-ব্রতবর্যাপর্যাকুলা)। তখন প্রীতিমান ভক্ত যা কিছু করেন তার তাৎপর্য শুধুই একটি—ভগবানের প্রীতিবিধান (ভগবন্মনোহরণৈকোপায়হারিরূপা)। প্রিয়তম তখন সমস্ত হৃদয় জুড়ে থাকেন। তাঁর জন্যই তখন কর্ম, তাঁর সুখেই সমস্ত সুখ। ভক্তিবাদীরা 'তদর্পিতাখিলাচারতা', 'তৎসুখসুখিত্ব' প্রভৃতির দ্বারা একথাটাই বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছায়—নিজের সুখের জন্য যে কর্ম তা কামনাপ্রসূত এবং তাই 'কাম' শব্দের বাচ্য। কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছায়, কান্ত বা প্রিয়তমের সুখের জন্য যে কর্ম তাই হল 'প্রেম'। এই প্রেমের সাধনাই গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের সাধনা।

"গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন" গ্রন্থে, জ্ঞানপ্রবীণ, ভাবুকভক্ত শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ মহাশয় সমন্বিতত্ত্ব বা পরতত্ত্ব, অভিধেয়তত্ত্ব বা সাধনতত্ত্ব, প্রয়োজনতত্ত্ব, শক্তিতত্ত্ব, জীবজগৎতত্ত্ব ও মায়া প্রভৃতি বৈষ্ণবদর্শনের বিভিন্ন তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যদের সিদ্ধান্তগুলিকে বর্তমান যুগের এবং সাধারণ পাঠকদের উপযোগীভাবে সন্নিবেশিত করে গ্রন্থকার বৈষ্ণব

দর্শনের প্রায় একটি বিশ্বকোষ রচনা করেছেন। চার খণ্ডের, তিন সহস্রাধিক পৃষ্ঠার এই বিপুল-আয়তন গ্রন্থ পাঠকের বিস্ময় ও ঈর্ষার উদ্রেক করে। গ্রন্থকার বার্ধক্যজনিত অপটুতা সত্ত্বেও এই বিশ্বকোষ রচনা করে জ্ঞানানুশীলনের অনন্যসাধারণ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। সমগ্র গ্রন্থটি সাতটি পর্বে বিভক্ত। প্রথম পর্বে—ব্রহ্মতত্ত্ব বা বা শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব (গৌড়ীয়মত ও অন্যান্য আচার্যদের অভিমত) আলোচিত হয়েছে। দ্বিতীয় পর্বে—জীবতত্ত্ব। তৃতীয় পর্বে—সৃষ্টিতত্ত্ব। চতুর্থ পর্বে—ব্রহ্মের সঙ্গে জীবজগদাদির সম্পর্ক—অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ। পঞ্চম পর্বে—সাধ্যসাধনতত্ত্ব বা ভক্তিতত্ত্ব। ষষ্ঠ পর্বে—প্রেমতত্ত্ব। সপ্তম পর্বে—রসতত্ত্ব। প্রত্যেক পর্বে, বিভিন্ন তত্ত্ব আলোচনা প্রসঙ্গে গ্রন্থকার প্রস্থানত্রয়ের মত, অন্য আচার্যদের মত, এইসব মতের খণ্ডন, ইত্যাদি সন্নিবেশিত করেছেন।

ভারতীয় দর্শনালোচনার যে বিশেষ পদ্ধতি অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে,—অর্থাৎ পূর্বপক্ষস্থাপন, খণ্ডন এবং উত্তরপক্ষ প্রতিষ্ঠা—সেই বিশেষ পদ্ধতি অনুযায়ী গ্রন্থকার বৈষ্ণবদর্শনের ব্যাখ্যান করেছেন। ফলে, এ-গ্রন্থপাঠে অন্যান্য ভারতীয় দর্শনপ্রস্থানের সঙ্গে পাঠকের পরিচয় নিবিড় হয়, যে অগ্র্যা বুদ্ধির ফসল হিসাবে ভারতীয় দর্শনের উৎপত্তি সেই বুদ্ধির প্রখরতা দেখে পাঠক বিস্ময়াবিষ্ট হন। বস্তুত, "গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন", গ্রন্থকারের অসামান্য কীর্তি এবং এ কীর্তির অংশভাগী বাংলা ভাষাভাষী সকলেই এজন্য গ্রন্থকারকে সাধুবাদ দেবেন।

তবুও; এ-গ্রন্থটি সম্পর্কে পাঠকের মনে যে সব প্রশ্ন ওঠে, সে প্রশ্নগুলি যথাযথভাবে উত্থাপিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। অবশ্য বর্তমান প্রবন্ধকার ভক্তিশাস্ত্রে নিম্নাধিকারীও নন এবং একেবারেই সাধনভজনহীন। এই অযোগ্যতার কথা স্মরণ রেখেও "গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন" সম্পর্কে তাঁর কয়েকটি জিজ্ঞাসা লিপিবদ্ধ করা হল।

প্রথমত, গ্রন্থকার—"গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন" যে যুগের মানসসম্পদ, সেই যুগধর্ম সম্পর্কে উদাসীন। সমকালীন দর্শন-ঐতিহাসিকেরা দর্শনশাস্ত্রকে সর্বস্বতন্ত্র বিদ্যা হিসাবে না দেখে, ঐতিহাসিক ও সামাজিক পটভূমিতে স্থাপন করে বিচার করেন। এই নতুন ভঙ্গিতে আলোচনার সার্থকতা আজ প্রায় সর্বজনস্বীকৃত। সমকালীন দার্শনিকদের মধ্যে Russell তাঁর "পাশ্চাত্ত্য-দর্শনের ইতিহাস," এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে লিখেছেন। Russell তাঁর গ্রন্থের

নামকরণ করেছেন "History of Western Philosophy and i connection with political and social circumstances from th earliest times to the present day"। যদি দর্শনশাস্ত্র স্বয়ম্ভু, অকার বিদ্যা না হয়, তবে দর্শনের ব্যাখ্যান ও মূল্যনিরূপণ প্রসঙ্গে সামাজি পরিস্থিতির আলোচনা তুচ্ছমূল্য নয়। অথচ, "গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন"-এ লেখক, যে সামাজিক পরিস্থিতিতে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের উদ্ভব হল, সে সামাজিক পরিস্থিতির বিচারবিশ্লেষণ করেন নি। ফলে গ্রন্থকার বৈষ্ণব দ মন্থন করে ভক্তির মণিমুক্তাই শুধু আহরণ করেছেন। সেই ভক্তির সামাজি তাৎপর্য কতটুকু, তত্ত্ববোধে ভক্তির অবদানই বা কতখানি, এ সব প্রশ্ন গ্র অনুচ্চারিতই রয়ে গেছে।

দ্বিতীয়ত, বৈষ্ণব দর্শনে,—সার্বভৌমিক দৃষ্টিভঙ্গি, এই দর্শনে জীবে স্বকীয়তার স্বীকৃতি, ভক্তিযোগে জীব-ব্রহ্মের সেতুবন্ধন প্রভৃতি বিবিধ বক্ত ব্যাখ্যানজালে গ্রন্থকার ইতিহাস, নৃবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞানের তথ্য যৎসামান্য সঞ্চয় করেছেন। অনাধুনিক পদ্ধতি অনুসরণ করবার ফলে গ্রন্থটির বৈজ্ঞানি উৎকর্ষ কিছু পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হয়েছে। মনে হয় যে গ্রন্থকার শুধুই মাধুকরী বৃত্তি অবলম্বন করে বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের বিবিধ বক্তব্য সঞ্চয় করেছেন, বিচা করেন নি। আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞান ধর্মাত্মক দর্শন এবং ব্যাপকভাবে 'রিলিজিয়ন' প্রসঙ্গে যে-সব সত্য আবিষ্কার করেছে, গ্রন্থকার যেন সে সত্য সম্পর্কে অল্পাধিক উদাসীন। ফলে, এই বিপুল-আয়তন গ্র বিস্ময়েরই উদ্রেক করে, বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি ও ক্ষুরধার বিচারের ঔজ্জ্বল্যে মু করে না।

বস্তুত, গ্রন্থকার ভক্তিমার্গেরই পথিক। সেজন্য ভক্তির উপচারে বৈষ্ণ দর্শনের মালা গেঁথেই তিনি কৃতার্থ। ভক্তিশাস্ত্র মন্থন করে 'অচিন্ত্যভেদাভে বাদ'-এর তাৎপর্য প্রতিপাদনে তিনি বিশেষ পটু, কিন্তু এই দর্শনের নৈয়ায়িক মূল্য নিরূপণে স্বভাবতই তিনি নিরুৎসাহ।

চতুর্থত, গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের প্রেমতত্ত্ব ও রসতত্ত্ব আলোচনায় যদি গ্রন্থকার অসামান্য পারদর্শিতা দেখিয়েছেন, তবুও পাঠক অনুভব করেন যে ধর্মের সঙ্গে প্রেমরসের তাদাত্ম্য কেন, গ্রন্থকার এই প্রশ্নের বৈজ্ঞানি আলোচনা করেন নি। ধর্ম ও ধর্মাশ্রয়ী দর্শন আজও টিকে আছে কেন? এ প্রশ্নের উত্তর মনোবিজ্ঞানী ও সমাজতাত্ত্বিকেরা দেবা

চেষ্টা করেছেন। ১৯২৪ সালে "The Forum"-এ Havelock Ellis লেখেন:

Religion, if it is anything at all, must be a natural organic function, like walking, like eating, better still, like loving. For the closest analogy and, indeed, real relationship, of religion, is with the function of reproduction, and the emotions of sex. The functions of eating and walking more or less necessary to life in their rhythmic recurrence and it is legitimate in their absence to endeavour to stimulate them into action.

But the function of religion, like that of love, is not necessary to life, nor may it with any certainty be stimulated into activity. Need it? These functions are either working within you or they are not. If not, then it is clear that your organism is in no need of them at the present moment, and perhaps is born without the aptitude to experience them.······

. But I am sure that either the function is there or it is not there, and no intellectual speculations will take its place or hasten its manifestations."

অর্থাৎ ধর্মানুভব হয় আছে, অথবা নেই। যদি না থাকে, তবে যুক্তির দ্বারা, বিচারের সাহায্যে এই অনুভব সৃষ্টি করা যাবে না, যেমন প্রেমানুভব উকিলের যুক্তিবিন্যাসে সৃষ্টি করা যায় না। বিরুদ্ধ যুক্তিবলে ধর্মানুভব কিংবা প্রেমানুভবের আবার নিষেধ হওয়াও সম্ভব নয়। প্রেমানুভব এবং ধর্মানুভবকে তাই বলা চলে স্বলক্ষণ (unique), স্বকীয়তার দ্বারা চিহ্নিত।

Havelock Ellis আরও লিখেছেন:

"Religion, like love, develops and harmonises our rarest and most extravagant emotions. It exalts us above the commonplace routine of our daily life, and it makes us supreme over the world. But, like love also, it is a little ridiculous to those who are unable to experience it. And since they can survive quite well without expriencing it, let them be thankful, as we are also thankful."

প্রেমানুভূতির স্পর্শে যেমন আমাদের অনুভূতি, ভাব ও কল্পনা চরম

পরিণতি লাভ করে, প্রেমের যাদুস্পর্শে প্রেমিক যেমন প্রাত্যহিকের তুচ্ছতা অতিক্রম করে অনির্বাচ্য আনন্দলোকে উত্তীর্ণ হন, তেমনি ধর্মানুভূতিতে সাধকভক্তের সুকুমার বৃত্তিগুলির সুসমঞ্জস বিকাশ ঘটে ; প্রাত্যহিকের স্থূ হস্তাবলেপ পরিহার করে সাধকভক্ত উত্তীর্ণ হন নিত্য আনন্দলোকে। ব্যক্তি চৈতন্যের প্রকাশের পটভূমিতে তাই কাব্য, শিল্পকলা, ধর্ম প্রভৃতির আস্বাদনে কিঞ্চিৎ সুযোগ আছে। লিরিক কবিতা যে অর্থে সত্যকে প্রকাশ করে পরিণত ধর্মানুভূতিতে অনেকখানি সেই অর্থে সত্য প্রকাশিত।

কিন্তু ধর্ম তো শুধু ব্যক্তিচৈতন্যের রসোপলব্ধি নয়, ধর্ম মূলতঃ সামাজিক সমাজজীবনে ধর্মের প্রাধান্য দীর্ঘদিন অব্যাহত রয়েছে, হয়তো আরও দীর্ঘকা থাকবে। ফলে অধুনা যে কোনো ধর্মাশ্রয়ী দর্শনের আলোচনায় সমাজ-উন্মু না হয়ে উপায় নেই।

গ্রন্থকার অবশ্য সম্পূর্ণভাবে এই উন্মুখতার লেপ হতে মুক্ত। প্রবন্ধকারের মতে "গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন"-এর মূল ব্যর্থতা এইখানে।

প্রবন্ধকার মনে করেন যে, 'প্রেম' যে-অর্থে মূল্যবান, বৈষ্ণব দর্শন (ধর্ম সেই অর্থে মূল্যবান। প্রেমের রাজ্যে, কি কাব্যের রাজ্যে (বিশেষত লিরিক কবিতা), কি শিল্পের রাজ্যে, তত্ত্বের বুদ্ধিগ্রাহ্য, বিশ্লেষণধর্মী রূপ অপ্রধান— তত্ত্বের রসগ্রাহ্য, চিত্রকল্পান্বিত রূপই এ-সব স্থলে মুখ্য। বৈষ্ণব দর্শনে তত্ত্বের যে কল্পনাশ্রয়ী, রসরূপের বর্ণনা মেলে, দর্শন হিসাবে তার মূল্য যতটুকুই হোক না কেন, imaginative apprehension of reality হিসাবে, কাব্যের মতো, এ দর্শনের (ধর্মের) রসও আস্বাদ্য।

ধর্মের উৎপত্তি, গতিপ্রকৃতি প্রভৃতি প্রসঙ্গ নিয়ে এস্থলে আলোচনার প্রয়োজন নেই। তবে, একথা স্বতঃসিদ্ধ যে মানুষই 'রিলিজিয়ন'-এর স্রষ্টা। যে মানুষ নিজের স্বরূপের পরিচয় পায় নি অথবা পেয়েও হারিয়েছে, সেই মানুষের আত্মসচেনতা—আত্মানুভূতি হতেই 'রিলিজিয়ন'-এর জন্ম। কিন্তু মানুষ তো জগৎ-ব্যতিরিক্ত কোনো অমূর্ত সত্তা নয়। 'মানুষ' আর 'মানুষের জগৎ'—অর্থাৎ রাষ্ট্র, সমাজ প্রভৃতি তো একই কথা। এই রাষ্ট্র, এই সমাজ 'রিলিজিয়ন'-এর জন্ম দেয়, এবং 'রিলিজিয়ন'কে মার্কস বলেছেন, "a reversed world-consciousness"। 'রিলিজিয়ন'-এ জগৎ-চৈতন্য স্বাভাবিক সুষমতায় প্রকাশিত হতে পারে না, এ চৈতন্য অনেকখানিই উলট-পুরাণের মতো। জগৎটাই যখন (রাষ্ট্র, সমাজ) উলটাপালটা হয়ে আছে,

তখন, চেতনাতেও যে, সে ব্যবর্তিত ধর্ম সঞ্চারিত হবে, তাঁতে বিস্ময়ের কিছুই নেই। মার্কস তাই বলছেন :

'It is the fantastic realisation of the human essence because the human essence has no true reality.

Religious distress is at the same time the *'expression'* of real distress and the *protest* against real distress. Religion is the sigh of the oppressed creature, the heart of a heartless world, just as it is the spirit of a spiritless situation.'

প্রাকৃতিক শক্তি এবং অদৃশ্য সামাজিক শক্তির ঘাতপ্রতিঘাতে 'মনুষ্যত্ব' যেখানে খণ্ডিত—বাধাপ্রাপ্ত, ধর্মানুভূতিতে, কল্পনার সাহায্যে, সেই মনুষ্যত্বেরই এক ধরনের প্রতিষ্ঠা। নিষ্ঠুরা, অ-বশ্যা, হৃদয়হীনা প্রকৃতির (সমাজ সহ) রাজ্যে 'রিলিজিয়ন' যেন হৃৎপদ্মের মতো। এ পদ্মের অলৌকিক সৌরভ আছে, কিন্তু যে লৌকিক জগৎ হতে এর উদ্ভব, সে জগতে পঙ্কিলতারই আবর্ত।

ধর্মের কল্পনাশ্রয়ী, বহুলাংশে illusory—জীবনদর্শন, যে সামাজিক মাটিতে জন্মে, সেই সামাজিক মাটির নতুন কর্ষণ না হলে এ জীবনদর্শনের ফসলফলার নিবৃত্তি হবে না। জীবনে যেহেতু দুঃখ আছে, অপ্রাপ্তি আছে, দীর্ঘশ্বাস আছে, সাংখ্যের মতে, 'দুঃখত্রয়' আছে, সেইহেতু 'রিলিজিয়ন'-এর ফসল অনেককাল ফলেছে ও ফলবে। কিন্তু পূর্ণ মনুষ্যত্ব-উদ্বোধের বাস্তব পরিবেশ যেদিন সৃষ্টি হবে, সেদিনই শুধু 'রিলিজিয়ন' জীবন-রস-আহরণ করতে ক্রমশ অক্ষম হবে।

ভারতবর্ষের মধ্যযুগের সামাজিক পরিস্থিতিতে, শ্রীচৈতন্যদেবের দর্শন ও ও ধর্ম, তৎকালীন সমাজজীবনে যে আলোড়ন এনেছিল তা হতে সুস্পষ্ট যে, এ ধর্ম বদ্ধ, স্বাধিকারভ্রষ্ট মানুষকে এক বিশেষ যুগে, মুক্তির পথ দেখিয়েছিল, হোক না সে মুক্তি মায়িক। ভারতবর্ষের তথা বাংলার প্রথম রেনেসাঁসে শ্রীচৈতন্যদেব ও বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের অবদানও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকৃত হবার অপেক্ষা রাখে। এ-সব প্রসঙ্গও গ্রন্থকার আলোচনা করেন নি। প্রবন্ধকারেরও এ-সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনার যোগ্যতাভাব। স্থানাভাব তো ফাউ হিসাবে আছেই।

অস্তিত্ববাদীর রোজনামচা

রাম বসু

"There is a bird called the stormy petrel and that is what I am, when in a generation storm begins to gather, individuals of my type appear"—নিজের প্রতি কির্কেগার্ডের এই উক্তি সেদিন অসমর্থের অহংকার বলে শোনালেও পরবর্তীকালের অভিজ্ঞতায় সিদ্ধ। কেউ ভাবতেও পারে নি উনিশ শতকের (১৮১৩-৫৫) কোপেনহেগেনের এই বিশদৃশ বিদ্রোহীটি বিশ শতকের মাঝামাঝি চিন্তাজগতের দিকপাল হয়ে উঠবে। যুদ্ধোত্তর ইওরোপের প্রেত-পটভূমিতে অস্তিত্ববাদ অনস্বীকার্য প্রভাবের কেন্দ্রবিন্দু। তারই মধ্যমণি সোরেন কির্কেগার্ড। অস্তিত্ববাদ নিয়ে স্বীকৃত অস্তিত্ববাদীদের মধ্যে বিরোধের অন্ত নেই। কেউ কেউ আবার এই মতবাদের ঐতিহ্য সন্ধান করেন হিব্রু ও লাতিন সাহিত্যে। তাদের মতে অস্তিত্ববাদ কালাতীত অনুভূতি (timeless sensibility)। কিন্তু যেমনভাবেই অস্তিত্ববাদীদের তালিকা প্রস্তুত হোক না কেন কির্কেগার্ড, "poet of religion" হওয়া সত্ত্বেও, তার অন্তর্গত। কির্কেগার্ডের অন্যান্য রচনার মধ্যে জার্নাল * উল্লেখযোগ্য। রচনার পারিপাট্য না থাকায় এই মূল্যবান গ্রন্থ কিছুকাল অবহেলিত ছিল। কিন্তু আলেকজাণ্ডার ড্রু সম্পাদিত এই জার্নাল বিশেষজ্ঞ ও সাধারণ পাঠকের অভাব দূর করবে বলে বিশ্বাস। জার্নালের একটা স্বতন্ত্র মূল্য আছে। অন্তত পাঠকের কাছে। কারণ পাঠক এখানে লেখকের একান্ত ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে যুক্ত। অন্দরমহলের দরজা দিয়ে পাঠক লেখকের বিশেষ ভাবনা থেকে নির্বিশেষ সত্যে পৌছবার দুরূহ সাধনার প্রতি স্তর দেখতে পান। অস্তিত্ববাদী লেখকদের ক্ষেত্রে এই সুযোগ আরও লোভনীয়। কারণ তাঁরা যুক্তিগ্রাহ্য বিষয়ভূত ভাবনা থেকে মুখ ফিরিয়ে নজর রাখেন ব্যক্তির অনুভবের নির্জন জগতে।

*The Journals of Kierkegaard (1834—1854): Edited and translated by Alexander Dru. Fontana Books. 2'6 d.

বালক বয়স থেকেই কির্কেগার্ড বুদ্ধিমান ও বিষণ্ণ। বিষণ্ণতা এবং বিচ্ছিন্নতা বোধ থেকে তিনি কোনোদিন রেহাই পান নি। "In my melancholy I loved the world"। বাবাকে কেন্দ্র করে বড় হয়ে উঠছিলেন কির্কেগার্ড। "Johames Climaeus" নামক স্কেচটি প্রকৃতপক্ষে তার শৈশবের আশীর্বাদ ও অভিশাপের প্রতীকচিত্র। কিন্তু সেই বাবার জীবনের মারাত্মক সত্য যেদিন প্রকাশিত হল, সেদিন থেকে জীবন সম্পর্কে এমন কতকগুলো সত্যের আভাস তিনি পান যার পরিস্ফুটন হল তার সাধনা। এই ঘটনাকে তিনি বলেছেন "প্রবল ভূমিকম্প" এবং এখান থেকেই পাপ বোধ সম্পর্কে স্থিরনিশ্চিত হন। মনে হল তাদের পারিবারিক জীবনের শিক্ষা ও সংস্কৃতি আদপে অন্ধকার। একদিন এই সঞ্চিত পাপের মূল্য দিতেই হবে। এই হল "অভ্রান্ত নিয়ম।" এই পরিপ্রেক্ষিতে জীবনে সত্যদৃষ্টি সম্ভব। ঈশ্বর কল্যাণময়। কিন্তু তাকে ভয় করতে হবে। জীবনে অন্তর্দাহ ছাড়া আর কিছু পাওয়ার নেই। সুতরাং মননের দিকেই একমাত্র শান্তি। এখান থেকে ব্যক্তিও অস্তিত্বের অকিঞ্চিৎকারিতায় সচেতন তরুণ কির্কেগার্ড বুঝতে পারলেন প্রেমের জন্য পুড়ে খাক্ হয়ে গেলেও সার্থকতার দিকে যাওয়া তার পক্ষে অসম্ভব। রেগিনার আকুল আত্মদানকে সরিয়ে দিয়েছেন অসহ্য রূঢ়তায়। অথচ ঠিক তখনই তার সমগ্র সত্তা উত্তর দিতে ব্যাকুল। তিনি ফিরে এলেন নিজের দুর্গে—তার দুঃখে। কারণ পরিপূর্ণ প্রেম দাবি করতে পারেন একমাত্র ঈশ্বর। আর মানুষের কাছে "Perfect love means to love the one through whom one becomes unhappy।" কিন্তু মন থেকে কোনোদিন মুছে যায় নি রেগিনা। কারণে অকারণে সে ছায়া ফেলেছে এবং আত্মবঞ্চনায় অভিনয় করেছেন কির্কেগার্ড। হয়তো ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতার ভয়াবহতা, অনুভূতিপ্রবণ বুদ্ধিমান তরুণের কাছে অসহ্য হওয়ার জন্য অস্তিত্ববাদী কির্কেগার্ডের জন্ম সম্ভব হয়েছে। উইলিয়ম জেমস বোঝাতে চান যে দার্শনিকদের মনের গড়ন দর্শনের ওপর প্রভাব রাখে। বিশেষ মেজাজ অনুযায়ী গড়ে ওঠে বিশেষ দর্শনের প্রতি আসক্তি। প্রাগম্যাটিক জেমসের এই ধারণা তর্কসাপেক্ষ হলেও কির্কেগার্ডের ক্ষেত্রে সত্য বলে মনে হয়।

১৮৪১—১৮৪৫ সাল কির্কেগার্ডের জীবনের প্রথম পর্ব। এই অবধি তিনি লিখেছেন ছদ্মনামে। তখন তার কাছে মূল প্রশ্ন জ্ঞান নয়। তিনি জীবনকে অধিকার করা ও অস্তিত্বকে ব্যাখ্যা করায় তখন মগ্ন। বিজ্ঞানে অবিশ্বাসী

নন, তবে সংশয়াচ্ছন্ন। বিজ্ঞানের determinism তার কাছে অগ্রাহ্য বিজ্ঞান জীবনকে ব্যাখ্যা করতে অসমর্থ। সে বড়জোর প্রকৃতিকে বর্ণনা করতে পারে। অথচ এই বিজ্ঞানের প্রভাবে মানুষ ক্রমাগত বিষয়মুখী (objective) হয়ে বিষয়ীগুণ (subjectivity) হারাচ্ছে। ব্যক্তিত্ব হারিয়ে হচ্ছে দাস। দর্শনের কাজ হল মানুষকে মনের কাছে টেনে নিয়ে আসা, তাকে ক্রমাগত অন্তর্মুখী করা। সেই অন্তর্মুখীনতায় নির্জনতা এবং জীবনের শু স্বরূপ। অতিরিক্ত বুদ্ধিবাদ মানুষকে কলুষিত করছে। বুদ্ধি দিয়ে মানুষ কখনও চূড়ান্ত সত্যকে জানতে পারবে না। সত্যকে জানার একমাত্র প অভিজ্ঞতা। অস্তিত্ব দিয়েই আমাদের সে কাজ আরম্ভ করতে হবে। আবেগ (passion) আমাদের অবলম্বন। তাই খ্রীষ্টোত্তর যুগের সমস্ত দর্শন অসার স্পিনোজা থেকে হেগেল তীব্র সমালোচনায় বিদ্ধ। হেগেলের বিরুদ্ধে আক্রমণ তীব্রতর। কারণ হয়তো কির্কেগার্ড হেগেলের যুগের অধিবাসী এবং হেগেল উনিশ শতেকের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক। অন্যদিকে দুজনের দৃষ্টিভঙ্গির প্রভেদ আকাশ-পাতাল। হেগেল বিশ্বাস করতেন যুক্তিতে, কির্কেগার্ড আবেগে। হেগেলের মন ইতিহাস-পুষ্ট, কির্কেগার্ড ইতিহাস-বিরোধী। হেগেল বিশ্বাস করতেন logic-এর ভেতর দিয়ে বিশ্বসত্তা জানা সম্ভব। এই বিশ্বসত্তা বাস্তবের বাইরে নয়। এ নিহিত ও ক্রিয়াশীল, ব্যাপ্ত ও বিস্তৃত। কির্কেগার্ডের বিশ্বাস চূড়ান্ত সত্য মানুষের বুদ্ধির অগম্য। একমাত্র অভিজ্ঞতার পথে মানুষ চরম দুজ্ঞেয়তার দিকে যেতে পারে। হেগেলের কাছে ধর্মের ঠাঁই দর্শনের অনেক নীচে, কির্কেগার্ড মনে করতেন দর্শন ধর্মের মুখবন্ধ মাত্র। "Christianity begins more or less where Hegel leaves off।" রিফরমেশনের পরবর্তী যুগ, যাকে কির্কেগার্ড বলেছেন Goetheo Hegelian world, যুক্তিবদ্ধ দার্শনিকতা (rationalism) ও নন্দনবাদী মানবিকতায় (aesthetic humanism) যান্ত্রিক। আমাদের অস্তিত্বের সংকট থেকে পালাবার পথ করে দেয় এই আবেগহীন নৈর্ব্যক্তিকতা। সংকটের সমাধান অন্তর্মুখীনতায়, উপলব্ধি ও বিশ্বাসের আলোকিত জগতে। আর, এই নন্দনবাদী মানবতা আসলে "vaporised Chiristianity, a culture consciousness, the dregs of Christianity"। সুতরাং চাই বিশুদ্ধ খ্রীষ্টীয় মানবতা।

যুক্তির প্রতি অনীহা এবং আবেগের প্রতি আসক্তি অবশ্য কির্কেগার্ডের যুগের বৈশিষ্ট্য। উনিশ শতকের প্রথম দিকে ইওরোপে বিষাদের কণ্ঠ শোনা

গেল বায়রন, মুসে, হাইনে ও পুশকিনের কবিতায়; সুবার্ট, সুম্যানের সংগীতে, সোপেনহাওয়ারের দর্শনে। বিপ্লব মারা গিয়েছে। তার সঙ্গে মারা গিয়েছে ইওরোপের আত্মা। আশার স্বর্গ রিপাবলিক হতাশার অন্ধকারে বিস্মৃত। বৃদ্ধেরা অতীতের স্মৃতি-তর্পণে বাঁচতে পারে। ভবিষ্যতে আশা রাখতে পারে শিশুরা। কিন্তু উনিশ শতকের অনাবৃষ্টিতে যাদের যৌবন চোখ মেলল, তাদের সান্ত্বনা কোথায়? গ্যাটের মতো দিকদর্শীকেও অবশেষে বলতে শোনা গেল, "I thank God that I am not young in so thoroughly finished a world"। ধর্মের দিকে চোখ ফেরালেন কেউ কেউ। কেউ অভিযুক্ত করলেন আঠারো শতককে—তার যুক্তি এবং তারই পরিণতি নাস্তিকতাকে। যুক্তি-বিমুখ এবং আবেগ নির্ভর রোম্যান্টিকতার জন্ম হল সেদিন। কির্কেগার্ডের বিদ্রোহ সেই রোম্যান্টিক ব্যাকুলতা।

এবং রোম্যান্টিক বিহ্বলতা বলেই তিনি মানুষের শক্তির উৎস খুঁজেছেন আবেগে। আবেগহীনতার জন্য অভিযুক্ত করেছেন এই যুগকে। আঠারো শতকের চিন্তা-নায়করা মানুষের যুক্তি ও শুভবুদ্ধিতে বিশ্বাস করতেন। তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে "all human beings can attain here on earth a state of perfection hitherto in the west thought to be possible only for christians in a state of grace and for them after death." Crane Brinton-এর এই উক্তির ভিতর দিয়ে আঠারো শতকের চরিত্র ব্যক্ত। কিন্তু কির্কেগার্ড একবার চিন্তা করেও দেখলেন না আঠারো শতকের এই স্বল্পায়ু ভূস্বর্গ কত গাঢ় ব্যঞ্জনায় দীপ্যমান। ইতিমধ্যে বিজ্ঞানের যাত্রা আরম্ভ হয়েছে। তার গতিরোধ করা অসম্ভব। যুক্তিবদ্ধ সমাজ ও জীবনে বিজ্ঞান যদি সত্যিই মারাত্মক হয়ে থাকে, তবে অযৌক্তিক সমাজে সে আরও কত বড় সর্বনাশ ডেকে আনতে পারে। মানুষের চরিত্রগত অন্ধতা, সংস্কার প্রভৃতি সম্পর্কে আঠারো শতক একেবারে নীরব নন। স্বয়ং কাণ্টই বলছেন, "It is hard to suppress a certain disgust when contemplating men's action upon the world stage. For one finds, in spite of apparent wisdom in detail, that everything taken as a whole is into woven with stupidity, childish vanity and destructiveness. In the end one does not know what kind of conception one should have of our

species which is so conceited about its superior qualities." দ্বিতীয়ত, যুক্তিবদ্ধ দার্শনিকতার অর্থ এই ছিল যে মানুষের জগৎ ও জীবন ব্যাখ্যায় তা প্রযুক্ত হবে। কিন্তু তা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে logic-এর মতো হবে না। কারণ, কাণ্টের কথায়, "Enlightenment is man's leaving his self-caused immaturity"। তৃতীয়ত, কির্কেগার্ড শুধুমাত্র হেগেলের প্রতিবাদ করে গেলেন। কিন্তু প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে পারেন নি। অথচ হেগেলের প্রতিবাদ করেও মানুষ ও জীবনে প্রগাঢ় বিশ্বাস থাকার দরুন মার্কসের উদ্ভব সম্ভব।

১৮৪৮ সাল থেকে কিকেগার্ডের জীবনের দ্বিতীয় পর্ব। তিনি বললেন, "My reserve and isolation are broken. I must speak out—Lord give thy grace"। ১৮৪৮ সালের বিপ্লব ব্যর্থ হবার পর মার্কসের কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো প্রকাশিত হয়। কির্কেগার্ড মনে করতেন এই বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে ব্যর্থ হয়েছে Goetheo Hegelian জগৎ এবং ভ্রান্ত বুর্জোয়া মানবতা। এই বিপ্লব তাৎপর্যে গভীর। কারণ ইতিপূর্বে সব আন্দোলনই ছিল ধর্মীয়। কিন্তু তার ফল হয়েছে রাজনৈতিক। এইবার প্রত্যেক আন্দোলন হবে রাজনৈতিক। কিন্তু তার ফল দাঁড়াবে ধর্মের বিকাশে। তাই তার বিশ্বাস যে এইবার খ্রীষ্টধর্ম সাংস্কৃতিক আবর্জনা থেকে মুক্ত হয়ে ব্যক্তিত্বের দোর খুলে দেবে। হেগেল মানুষকে যুক্তিবাদী পশুতে পরিণত করেছে। পশুর জীবনে ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন নেই। কিন্তু মানুষের কাছে ব্যক্তিত্ব পরম পবিত্র। কারণ মানুষ ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব। খ্রীষ্ট এমনি এক ব্যক্তি। পিতর খ্রীষ্টকে ঈশ্বর বলে ভুল করেছিলেন। তাই খ্রীষ্টকে অস্বীকার করতে হয়েছে। ব্যক্তিকে category হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। আঠারো শতকের মানবতা তা করে নি বলেই সে দূষিত। "The individual is the category through which, from religious point of view, our age, our race and its history must pass।" ব্যক্তিত্বকে category হিসেবে দেখেছিলেন একমাত্র সক্রেটিস। তাই সক্রেটিস কির্কেগার্ডের নায়ক। ব্যক্তিত্বের চূড়ান্ত বিকাশের জন্য চাই বিশ্বাস। কারণ "Man only begins to exist in faith।" এই বিশ্বাস থেকে পাওয়া যাবে অনন্য মুহূর্ত যখন চিন্তা এবং অস্তিত্বের সঙ্গে সিদ্ধান্ত হবে গ্রথিত। এই একাত্মতায় খণ্ডকাল ও অনন্তকালের মিলন। জীবনের মধ্যে কোনো ছক কিংবা system খোঁজা

অর্থহীন। কারণ বাঁচার মানে অগ্রগমন। মানুষ আদপে খণ্ডিত। সে সীমাবদ্ধ বাস্তবতা (finite reality) ঈশ্বর অসীম (infinite reality)। সেণ্ট আগস্টিনের মতো কির্কেগার্ডেরও বিশ্বাস যে মানুষ স্ববিরোধী টানা-পোড়েনে ক্লান্ত ও তুচ্ছ। ঈশ্বরই একমাত্র মহিমান্বিত সত্তা। কিন্তু সে ঈশ্বর চার্চের প্রভাবের বাইরে। কারণ চার্চের প্রথা বহিরাঙ্গ। বড় জোর ritual। মুক্তি অন্তরঙ্গে। তাই লুথারের মতো তিনিও জোর দিয়েছেন ঈশ্বরের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপনের ওপর। লুথারও যুক্তিবিরোধী। তাঁর কাছে "reason is a whore" এবং "who ever wants to be a Christian should tear the eyes out of his reason।" কিন্তু লুথারের প্রতি শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও কির্কেগার্ড তাকেও ক্ষমা করেন নি। কারণ লুথার নীতিভ্রষ্ট। তিনি জাগতিক ব্যাপারে বিচলিত। "That unholy political attitude, that desire to overthrow the Pope is what it so confusing about Luiher।" ডেনমার্কের প্রতিষ্ঠিত চার্চের ভয়াবহ প্রতিকূলতা তুচ্ছ করে তিনি বলেন যে সংস্কার যদি কিছু করতেই হয় তা এই মানবজীবন। ব্যক্তির সঙ্গে ঈশ্বরের যোগাযোগ স্থাপন করেই সংস্কার সম্ভব। তীব্র অন্তর্দাহ এবং যন্ত্রণার ভিতর দিয়ে জীবনের পথ।

ব্যক্তিত্বের ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়ার জন্য অবশ্য কির্কেগার্ড পরবর্তী অস্তিত্ববাদীদের কাছে পূজ্য। কিন্তু ব্যক্তি সম্পর্কে তার ধারণার সঙ্গে অন্য নাস্তিক অস্তিত্ববাদীদের মিল খুঁজে পাওয়া কঠিন। কারণ কির্কেগার্ড প্রকৃতপক্ষে খ্রীষ্টান। আঠারো শতকের যুক্তিবাদের বিরুদ্ধে এও তার একটি রোমান্টিক বিদ্রোহ। অথচ প্রচলিত রোম্যান্টিকতা থেকে তার ধারণা সম্পূর্ণ ভিন্ন।

ক্রপদী চিন্তায় মানুষ পৃথিবীর মাঝখানে প্রতিষ্ঠিত। "Man is the measure of everything।" সেখানে মানুষকে দেখা হয়েছে প্রধানত তার বুদ্ধিবৃত্তির অনন্য আভায়। খ্রীষ্টীয় মতবাদ এসে বলেছে মানুষ দেহে ও মনে সীমাবদ্ধ। মানুষকে জানতে হবে তার বুদ্ধির অনন্য আভায় নয়, ঈশ্বরের দাক্ষিণ্য ও দীপ্তিতে। যথার্থই বলেছেন, "All things are yours but ye are Christ's।"

সামান্ততান্ত্রিক অর্থনীতি থাকায় এবং ক্যাথলিক চার্চের আওতায় ব্যক্তিত্বের বিকাশ সম্ভব হয় নি। আধুনিক অর্থে ব্যক্তিত্বের জন্ম রেনেসাঁস ও

প্রটেস্টানটিজমের যুগে। রেনেসাঁস থেকে উদ্ভুত ব্যক্তিত্ববাদ থেকে পরবর্তী কালে স্বাধীন (autonomous) ব্যক্তির জন্ম। প্রটেস্টাণ্ট আওতায় বিকশিত খ্রীষ্টীয় ব্যক্তিত্ব। তার প্রকাশ লুথার ও কির্কেগার্ডে। এই চেতনা থেকেই এসেছে "priesthood of all believers"-এর। এরা জোর দিয়েছেন ঈশ্বরের প্রতি অনুগত্যে। ব্যক্তিগত ভাবনায় সেই স্বর্গীয় প্রসন্নতা পাওয়ার ওপর। তাই লুথার বললেন, "তুমি যখন মৃত্যুশয্যায়, তখন 'এই কথা পোপ বলেছেন'— এই বলে নিজেকে প্রবোধ দিয়ো না। পোপ ভুল কথা বলে থাকতে পারেন। তাই তোমাকে সব সময় প্রস্তুত থাকতে হবে যেন তুমি বলতে পার ; 'এই ইশ্বরের বাক্য'।" কিন্তু খ্রীষ্টোত্তর দর্শন স্বাধীন ব্যক্তিত্বের ধারাকে গ্রহণ করেছে। ফলে সে দুটি বিপদের সম্মুখীন। একদিকে Naturalismএর হাত ধরে তাকে আত্মসমর্পন করতে হচ্ছে কার্যকারণের চক্রে। অন্যদিকে Idealismএর পথে তার বিলুপ্তি হচ্ছে যুক্তি ও বিশ্বসত্তায়। কির্কেগার্ডের কথায়,

> "Before the system completes itself, every scrap of existence must have been swallowed up in the eternal; there must not be the slightest remainder ; not even so much as a bit of dingle dangle represented by the Herr Professor (অর্থাৎ হেগেল) who writes the system."

উনিশ শতকের যুক্তিবাদ ধর্মতত্ত্বের ওপর আক্রমণ করেছে। অনেকেই বাইবেলের অনৈসর্গিক ব্যাখ্যা করেছেন। বাইবেলে কথিত অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ প্রতীক হিসাবে দেখা দিয়েছে তাদের কাছে। খ্রীষ্টের জীবন একটি রূপক। কিন্তু এই ধারণা মিথ্যা। এ মানুষের আদিম পুরাণ তুচ্ছ মেটায় মাত্র। এই বোধের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে কির্কেগার্ড ব্যক্তিত্বকে বাঁচাতে চাইলেন।

স্বাধীন ব্যক্তিত্বের পরিণতি পরবর্তী কালে, বুর্জোয়াতন্ত্রের অন্তিম দশায়, দেখা গিয়েছে ব্যক্তিত্ব বিনাশে। ইয়ুংএর মতো মনস্তাত্ত্বিককেও বলতে হয়েছে যে মানুষ কোনোদিন তার অস্তিত্বের সার্থকতা খুঁজে পাবে না "except in an extra-mundane principle capable of relativizing the overpowering influence of external factors।" কির্কেগার্ড এই বিপদ বুঝেই মুখ ফেরালেন 'Pietistic individualism' এর দিকে। এই ধারণা প্রটেস্টাণ্ট ও রহস্যবাদের মিশ্রন। এখানেও বিশ্বাস স্থাপন করা হয়েছে ঈশ্বরের দয়ার ওপর। ব্যক্তিত্বের ধারণা সম্পর্কে কির্কেগার্ড বলেছেন,

> "Ṭhe paradox of faith is this that the individual is higher ṭhan the universal, that the individual determines his relation to the absolute, not his relation to the absolute by his relation to the universal."

অস্তিত্বের স্বরূপ ধরতে গেলে আত্মাকে জানতে হবে। কারণ কির্কেগার্ডের মতে "The determining factor in the self is consciousness i.e. self-consciousness।" যতই সচেতনতা পাওয়া যাবে ততই আত্মাকে জানা যাবে। আত্মজ্ঞান বাড়বে যত, ততই বাড়বে ইচ্ছাশক্তি। এবং যত ইচ্ছাশক্তি বাড়বে ততই জানা যাবে আত্মাকে। তাই সংক্ষেপে, "that in the eternalisation of the self one escapes the self endlessly and in the temporalisation of the self one endlessly returns to the self।" ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে এই ধারণা আঠারো শতকের যুক্তিবাদের বিরোধী। কিন্তু মার্কসীয় দৃষ্টিতে কির্কেগার্ডের ধারণা ভ্রান্ত। কারণ কির্কেগার্ডের ব্যক্তি যত 'temporalisation'-এর ভক্ত হোক না কেন, তার কোনো সামাজিক-অর্থনৈতিক বনিয়াদ নেই। সুতরাং সে অবাস্তব।

অস্তিত্ববাদী ধারণায় কির্কেগার্ডের বড় দান পাপ বোধ ও উদ্বেগ চেতনা। এই বোধ আছে বলেই অন্তর্দাহ। সাম্প্রতিক সাহিত্যে এই লক্ষণগুলি খুবই সুস্পষ্ট। অস্তিত্ববাদের প্রভাব সাহিত্যে যতটা পড়েছে, অন্যক্ষেত্রে ততটা মারাত্মক আকারে দেখা দেয় নি।

কিন্তু খ্রীষ্টীয় ধারণায় পাপ-বোধের স্থান খুবই প্রসারিত। এই পাপবোধের উৎস একমাত্র পাপ কর্ম নয়। এই বোধ মানুষের সমগ্র অস্তিত্বের সঙ্গে যুক্ত। ফ্রয়েডও প্রথমে মনে করেছিলেন যে পাপবোধের উৎস অবদমনে। পরবর্তী-কালে ভুল স্বীকার করে বলেছেন যে অবদমনের জন্য পাপবোধ নয় বরং পাপবোধের জন্য অবদমন। সুতরাং এ কথা বলা যায় পাপবোধ ইওরোপীয় ভাবনা প্রতিভার প্রতি শিকড়ে সঞ্চারিত।

খ্রীষ্টীয় মতে মানুষ খণ্ডিত এবং সীমাবদ্ধ বাস্তবতা। খণ্ডিত বলেই অখণ্ডের প্রতি তার ঐকান্তিক প্রয়াস, ঐক্যের দিকে আকর্ষণ। সে কখনও ভুলে যায় না তার দুর্বলতা, সীমাবদ্ধ অস্তিত্ব এবং নির্ভরতার কথা। অথচ শুধুমাত্র মানুষ হবার জন্য সে নিজেকে ছাড়িয়ে যাবার আকাঙ্ক্ষার অধিকারী। এখানেই তার অনন্যতা। সে একদিকে মহৎ অন্যদিকে ক্ষুদ্র, একদিকে সাহসী অন্যদিকে ভীরু। সে দাঁড়িয়ে আছে প্রকৃতি এবং আত্মার মাঝখানে। এবং এই

মাঝখানে থাকার জন্যই আসে পাপ। কারণ সে স্থির থাকতে পারে না সে তার পরিমিত পরিধিতে অতৃপ্ত। প্রতি মুহূর্তে সে চায় তার পরিধি অপরিমিত করতে, সীমাবদ্ধতাকে ছাড়িয়ে অসীমে পৌছতে এবং তা নিজে চেষ্টায়, অহং-এর জোরে। এই উত্তরণের আকাঙ্ক্ষায় উদ্বেগ।

কিন্তু উদ্বেগ পাপ নয়। কির্কেগার্ড বলেন,—"Anxiety is the psycho logical condition which precedes sin. It is so near, fearfully near to sin, and yet it is not the explanatio for sin."

বরং "Anxiety is the dizziness of freedom।" কারণ এ উদ্বেগের মধ্যে দিয়ে মানুষ নির্ভরতার কথা নাও ভুলে যেতে পারে। হাস্যকর আত্মশ্লাঘায় প্রদত্ত সীমাবদ্ধতা নিজের হাতে সরিয়ে দিয়ে ঈশ্বরকে অস্বীকার নাও করতে পারে। সে নম্র ও নত হয়ে ঈশ্বরের প্রতি নিবেদি হতে পারে—যাকে কির্কেগার্ড বলেছেন "leap in to the faith এখানে হতে পারে সকল উদ্বেগের অবসান, সকল অনিশ্চয়তার সমাধি। তা খ্রীষ্টীয় মতে সকল পাপের মূলে অবিশ্বাস। অবিশ্বাস আসে অহংকারের রূপে নিজের প্রতি অসংযত ও অসঙ্গত ভালবাসায়। লুথার বলেন, "The begining of all sin is to depart from God and not trust Him." আগষ্টিনের মতে অহঙ্কারই পাপের উৎস। "what could begin this evil will but pride that is the begining of all sin?" এবং টমাস একুইনাসের মতে আত্ম-প্রীতি থেকে পাপ। যাই হোক না কেন সে যীশুর সেই কথা ভুলে যায়।" ভুলে যায় "Be not anxious, for your heavenly Father knoweth that ye have need of these things।" মানুষ সে কথায় কান না দিয়ে নিজেকেই ঈশ্বরের আসনে বসায়। তখন আসে পাপ। পাপ তাই অনিবার্য নয়, আকস্মিকও নয়। সে ভুলে যায়, "He that looseth life for my sake shall find it।" খ্রীষ্টীয় মতে এই আত্মদান আত্ম-অস্বীকৃতি নয়। বরং এই পথেই আত্মোপলব্ধি। এইভাবেই একমাত্র ব্যক্তিত্বের সুস্থ ও স্বাভাবিক বিকাশ সম্ভব। তা ভিন্ন স্বাধীন ব্যক্তিত্বের হাত ধরে নোঙর-ছেঁড়া নৌকার মতো শূন্যতায় আছাড় খেয়ে মরতে হবে। না হয় আপনার কোনো চিহ্ন না রেখেই বিশ্বসত্তায় বিলীন হতে হবে। দু পথেই ব্যক্তিত্বের বিনাশ।

কিন্তু সাহিত্যে যে পাপবোধ আসে তা কতটা খ্রীষ্টীয় সে বিষয়ে ঘোরতর সন্দেহ আছে। অবশ্য উদ্বেগের কারণ স্পষ্ট। প্রতিযোগিতামূলক অর্থনীতির শূল বিদ্ধ জীবন প্রতি নিয়তই উদ্বেগে কাতর। তাই বিশ শতকের অস্তিত্ববাদে পাপ-বোধ এবং উদ্বেগ চেতনার আড়ম্বর আশ্চর্যের বিষয় নয়।

কারণ বিশ শতকের অস্তিত্ববাদীরা অতি সচেতনভাবেই উদ্বেগের পথ বেছে নিয়েছেন। ভাবলোক যদি স্বয়ম্ভূ না হয়, এবং তা নয় বলেই মার্কসবাদীরা বিশ্বাস করেন, তবে এ উপসংহারে আসা অনুচিত হবে না যে এই উদ্বেগচেতনা, পাপবোধ এবং শূন্যতায় আস্ফালন একটি গলিত সমাজ-ব্যবস্থার অন্তর্বেদনা। একথা ঠিকই যে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এবং প্রতিযোগিতামূলক অর্থনীতিতে মানুষ ক্রমাগত পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বিষণ্ণ এবং কাতর। সেই একক মানুষটি পৃথিবীর গতিরোধ করতে অসমর্থ হয়ে ক্রমাগত আপনার অস্তিত্বের শূন্যতা এবং তুচ্ছতায় বিশ্বাসী হয়ে উঠছে। এই বিচ্ছিন্নতা বোধ বহু আগেই মার্কসের নজরে এসেছিল। দুঃখের কথা কির্কেগার্ড মার্কসের যুগের অধিবাসী হয়েও এদিকে নজর দেন নি। তাই মার্কস যখন যুক্তি এবং বিজ্ঞানে ভরসা করে প্রকৃতির ওপর স্বাধিকার বিস্তারের কথা বলেছেন, এবং এইভাবেই মানুষের হৃত প্রমেথিয়ান গৌরব ফিরিয়ে আনার সাধনায় স্থিতধী ; তখন কির্কেগার্ড যুক্তি ও বিজ্ঞানকে বর্জন করে 'magic' ও 'unreason'-এর ওপর ভরসা করে মানুষকে আত্মসমর্পণ করতে বলেন আধিদৈবিক সত্তায়। ঝাঁপিয়ে পড়তে বলেন বিশ্বাসে, যেখানে দর্শনের ইতি।

কিন্তু দার্শনিক কির্কেগার্ড সম্পর্কে সমালোচনা যত অন্তহীন হোক না কেন, জার্নালের একান্ত নির্জন ও নিঃসঙ্গ মানুষটির প্রতি আকৃষ্ট হবেন সবাই। এখানে একজন সৎ চিন্তাবিদ্‌কে অবিচলভাবে আপনার নিয়তির দিকে যেতে দেখা যায়। দেখা যায় একজন সাধু খ্রীষ্টান ডেনমার্কের প্রতিষ্ঠিত ও প্রতিক্রিয়াশীল চার্চের বিরুদ্ধে অনলস সংগ্রামে লিপ্ত। জার্নালে দেখা যায় একজন নিষ্ঠাবান লেখক জীবনের সমস্ত কাম্য একে একে ত্যাগ করে এগিয়ে যাচ্ছেন আপনার অস্তিত্বকে উপলব্ধি করবার জন্য। তাই মতভেদ সত্ত্বেও তিনি মুগ্ধ করেন।

মহাকাশ অভিযান

দিলীপ বসু

যুগান্তকারী বৈপ্লবিক চিন্তাধারার তাৎপর্য সমসাময়িক মানুষের কাছে অনে
সময়ই ধরা পড়ে না। কোপারনিকাস্, নিউটন, ডারউইন, মার্কস-এঙ্গে
প্রমুখ বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিকদের চিন্তার অবদান পরবর্তী যুগে সুদূ
প্রসারী পরিবর্তন আনলেও, স্বভাবতই সমসাময়িক মানুষের কাছে স
ছিল না।

১৯৫৭ সালের ৪ঠা অক্টোবর, মানুষের দুর্বার অগ্রগতির পথে স্বর্ণাক্ষ
লিখিত একটি বিশেষ দিন—ঐ দিন সোভিয়েতের মানুষের হাতে-গড়া কৃত্রি
উপগ্রহ বা স্পুৎনিক* পৃথিবীর জল-মাটি-বাতাসের বহু উর্ধ্বে সারা পৃথিবীক
প্রদক্ষিণ করে, এতদিনের অজ্ঞাত এবং দুর্জ্ঞেয় মহাকাশের (space
রহস্যের কুজ্ঝটিকা ভেদ করে, সত্যই "Kingdom of Heaven"-এর দ্বা
আমাদের সামনে প্রথম খুলে ধরল। সুখের কথা ; এই যুগান্তকারী বিপ্লবে
তাৎপর্য অন্তত আংশিকভাবে সাম্প্রতিক মানুষের চেতনায় প্রতিভাত হয়েছে
নিশ্চয়ই পারস্পরিক জ্ঞানের দ্রুত আদান-প্রদানের ফলেই এটা সম্ভ
হল। এবং সমগ্র মানবসমাজের অগ্রগতির এটা একটা বিশেষ শুভলক্ষণ।

১৯৫৭ সালের ৪ঠা অক্টোবর প্রস্তুতি অবশ্য বহুদিন ধরেই সোভিয়েত দেশে
চলছিল। আমরা বিশেষ করে স্মরণ করব, সিওল্‌কভস্কিকে, (১৮৫৭-১৯৩৫)
যিনি ১৮৯৫ সালে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বাইরে কৃত্রিম উপগ্রহ বা আজকে
স্পুৎনিক স্থাপন করার কথা বলেছিলেন এবং ১৯০৩ সালে তার সম্বন্ধে এব
বিশেষ করে রকেটের ছুট সম্পর্কে নানারূপ হিসাবপত্র প্রকাশ করেন।

Soviet Space Science: *Ari Shternfeld.* (Translated by th United States Air Force, Technical Documents Liaison Office)—Hutchin son, London. 10s.

* পুরো রাশিয়ান কথাটা বেশ মজার—Iskutsvennyi Sputnik Zemli (Artifici Fellow Traveller Round the World)—পৃথিবী-প্রদক্ষিণকারী কৃত্রিম সহযাত্রী, এ fellow-traveller সংজ্ঞা অবশ্য রাজনৈতিক ক্ষেত্রের নয়।

রাশিয়ান সন্ত্রাসবাদী দলের সভ্য নিকোলাই কিবালচিচ, জারের কারাগারে ফাঁসির বন্দী অবস্থায় থাকাকালীন, তাঁর ফাঁসির অল্পদিন পূর্বে মহাকাশে স্টেশন তৈরি করা সম্পর্কে এক প্রবন্ধ দাখিল করেন। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে আমেরিকান প্রফেসার গডার্ড, জার্মান হারম্যান অবের্থ, অষ্ট্রিয়ান গণিতবিদ ব্যারন ফন পিরকে, এরাসী এস্‌নু-পেলতেরি প্রভৃতি অনেকেই সুচিন্তিত প্রবন্ধাদির দ্বারা ক্রমশ একটা নতুন বিজ্ঞান—মহাকাশ-পর্যটন বিজ্ঞান (astronautics) গড়ে তোলেন। পশ্চিমদেশে এই মহাকাশ-পর্যটন-বিজ্ঞানের প্রচেষ্টার খবর ইংরেজী ভাষার সাহায্যে কিছুটা পাওয়া গেলেও, (১৯৫০-৫১ প্রকাশিত ইংরেজ লেখক Arthur Clarke-এর 'Exploration of Space' এবং 'Interplanetary Flight' এবং Willy Hey-এর 'Conquest of Space') সোভিয়েত দেশে মহাকাশ জয়ের প্রচেষ্টার খবর ৪ঠা অক্টোবরের পূর্বে অবধি আমাদের প্রায় অজ্ঞাত ছিল। ৪ঠা অক্টোবরের পরে কিছু রাশিয়ান পুস্তক, ইংরেজীতে তরজমা করে, আমাদের হাতে এসেছে—যেমন Gilzin-এর 'Travel to Distant Worlds', আলোচ্য লেখকেরই স্টারন্‌ফেলডের 'Interplanetary Travel' এবং 'Soviet Writings on Earth Satellites and Space Travel' (একটি সংকলন, যার প্রথম অংশটা আলোচ্য লেখকের লেখা)।

৩৫০ পৃষ্ঠার আলোচ্য পুস্তকটিতে সর্বপ্রথম সোভিয়েত দেশে মহাকাশ জয়ের চিন্তাধারার এবং প্রচেষ্টার একটা সামগ্রিক চিত্র পাওয়া গেল এবং আলোচনাপ্রসঙ্গে প্রতি ক্ষেত্রেই আলোচ্য লেখক অন্য দেশের খবরও পুরোপুরি আমাদের সামনে রেখেছেন। এর ভূমিকাতে মহাকাশ প্রসঙ্গের খ্যাতিমান জনপ্রিয় আমেরিকান লেখক উইলী লেও লিখছেন :

"American readers will be struck particularly by two things. In the first place, it is singularly free from the propaganda that is so characteristic of Soviet popular writing on practically every subject. The book is diffused to be sure, with an understandable Soviet pride in the Russian accomplishments. But it avoids politics and confines itself to the science and technology of astronautics, with full recognition of the work being done in other countries, particularly the United States.···

"The second striking aspect of the book is the Rus author's easy familiarity with the rocket re earch literature of the Western nations. But this should occas no surprise, for Ari Shternfeld, the author, is no ne comer to the field of rocketry."

ভূমিকা-লেখক উইলী লের নিজস্ব ব্যক্তিগত মতামত সম্পর্কে আমা মন্তব্য মুলতুবি রেখেও মূল বইটির সম্পর্কে তাঁর বক্তব্যের সঙ্গে নিশ্চয়ই আ একমত। তরজমাকারক আমেরিকান বৈমানিক বিভাগ এবং ইং প্রকাশক হাচিন্‌সনও আমাদের ধন্যবাদার্হ। রাশিয়ানের লেখা বই, আমেরিকান তরজমা এবং ইংরেজ প্রকাশক—মহাকাশে অন্তত আন্তর্জা সহযোগিতার ক্ষেত্র ভালো করেই সুপ্রশস্ত মনে হচ্ছে।

এগারোটি পরিচ্ছেদে স্পুৎনিক ও স্পুৎনিক ছোড়বার রকেট সম্ যাবতীয় তথ্যাদি এবং ভবিষ্যতে মহাকাশে স্টেশন নির্মাণের পরিক ইত্যাদি সুনিপুণভাবে সাজানো আছে। আলোচনা কোথাও অত্যা টেকনিক্যাল পর্যায়ে যায় নি, সাধারণ অঙ্কশাস্ত্রের জ্ঞান থাকলেই এই বুঝতে বিশেষ অসুবিধা হবার কথা নয়। পৃথিবী-প্রদক্ষিণের কক্ষপ স্পুৎনিক স্থাপন করার খুঁটিনাটি-সমস্যা, তার কক্ষপথের বৈশিষ্ট্য, পৃথি প্রদক্ষিণের সময়, তার থেকে স্পুৎনিকের গতিবেগ নির্ধারণ ইত্যাদি বিষয় এমনভাবে সাজানো আছে, যা বিজ্ঞানীদেরও কাজে লাগবে। সব ৫১টি তালিকা (tables), ৫৮টি রেখাঙ্কন (figure drawing) এ ৩৬টি আর্ট-প্লেটের ছবি বইটি বিশেষভাবে প্রাঞ্জল ও চিত্তাকর্ষক করেছে।

স্পুৎনিকের কক্ষপথ

কৃত্রিম উপগ্রহ বা স্পুৎনিকেরা বৈজ্ঞানিক কেপলার-আবিষ্কৃত নিয়মাধী উপবৃত্তাকারে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে। তার অপভূ (apogee) বা পৃথি কেন্দ্র থেকে কক্ষপথের সর্বাপেক্ষা দূরতম বিন্দু বায়ুমণ্ডলের বাইরে অবস্থি হলেও, তার অনুভূ (perigee) বা পৃথিবী-কেন্দ্র থেকে কক্ষপথের সর্বাপে নিকটতম বিন্দু, সাধারণত বায়ুমণ্ডলের মধ্যেই অবস্থিত থাকে। তার ফ এতদিন ধারণা ছিল যে বায়ুর ঘর্ষণে অনুভূ ক্রমশ নীচে নেমে আসে এ স্পুৎনিকের কক্ষপথ সংকুচিত হতে হতে নীচের ঘন বায়ুমণ্ডলে তার অন্ত্যে দাহন সম্পন্ন হয়। অবশ্য ভবিষ্যতে কৃত্রিম উপগ্রহের অনুভূ এবং অপ

দুই-ই বায়ুমণ্ডলের বাইরে স্থাপন করতে পারলেই মহাকাশে স্থায়ী স্টেশন তৈরি করা সম্ভব হবে।

প্রথম স্পুৎনিকের উপবৃত্তাকার কক্ষপথের বিশদ বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে যে কক্ষপথে গমনকালীন সর্বসময়েই স্পুৎনিকের গতি শ্লথ হতে থাকে, যার ফলে শুধু অনুভূ নয় অপভূ প্রতিবার ঘূর্ণনের পরে পৃথিবী-কেন্দ্রের দিকে নেমে আসতে থাকে। সোভিয়েত বৈজ্ঞানিক অক্‌টোমিস্‌স্কি, এনেইয়েভ এবং টারাটানাভো আরো প্রমাণ করেছেন যে বায়ুমণ্ডলের ঘর্ষণে অপভূই অপেক্ষাকৃত তাড়াতাড়ি পৃথিবী-কেন্দ্রের দিকে নেমে আসে। আমাদের লেখক বলছেন (পৃঃ ২৭) :

"For instance, if the Satellite is moving in orbit with the apogee located at an altitude of 700 kilometres and the perigee at an altitude of 300 kilometre then a 100-kilometres lowering of the apogee will correspond to only a 6-kilometre lowering of the perigee. For this reason, in a very much elongated orbit, it may in first approximation be considered that only the apogee is lowered, while the perigee remains at practically the same altitude."

এই কারণেই স্পুৎনিক কক্ষে স্থাপন করার সময় তার অনুভূ (perigee) পৃথিবী-কেন্দ্র থেকে যত উচ্চে বা দূরে স্থাপন করা যাবে, সেই স্পুৎনিকের আয়ুষ্কালও অপেক্ষাকৃত বেশি-দূরে যে স্পুৎনিকের কক্ষপথের অপভূ (apogee) রয়েছে, তার চেয়ে দীর্ঘতর হবে। যেমন ধরা যাক, একটি স্পুৎনিকের কক্ষপথ—৩৬০ কিলোমিটার উচ্চে অনুভূ, ১৫০০ কিলোমিটার উচ্চে তার অপভূ। এর কক্ষপথের অনুভূ যদি আরো মাত্র ২০ কিলোমিটার বেশি দূরে, অর্থাৎ ৩৮০ কিলোমিটারে স্থাপন করা যায়, তার আয়ুর্বৃদ্ধি হবে শতকরা ৪০ ভাগ। অথচ সেই স্পুৎনিকেরই অনুভূ ঠিক রেখে যদি অপভূ আরো ২০ কিলোমিটার বেশি দূরে, অর্থাৎ ১৫২০ কিলোমিটার দূরে স্থাপন করা যায়, তাহলে তার আয়ুর্বৃদ্ধি হবে শতকরা ২ ভাগ।

অপেক্ষাকৃত বেশি দূরে অবস্থিত-অপভূ অপেক্ষা বেশি দূরে অনুভূ অবস্থিত কক্ষপথ করা অনেক বেশি শক্ত। কারণ কী ? আমরা জানি, তিন-খোলসের রকেটের সাহায্যে স্পুৎনিককে কক্ষে স্থাপন করা হয়। প্রথম খোলসের

বিস্ফোরণ শেষ হওয়া অবধি সমস্ত রকেটটি (স্পুৎনিক তার শীর্ষদেশে অবস্থি খাড়া (vertical)-ভাবে ভূপৃষ্ঠের ওপরকার ঘন বায়ুমণ্ডলের স্তর পার হচ্ছে প্রথম খোলস জলে শেষ হয়ে আবার পৃথিবীতে প্যারাচুটের সাহায্যে নে আসার সময়ে, দ্বিতীয় খোলস যখন কাজ শুরু করে, তখন রকেটের গমনপ ক্রমশ পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে হেলানো হয় এবং দ্বিতীয় খোলসের কাজ শে হবার সময় রকেটের গমনপথ পৃথিবীতে বাঁকা পিঠের সমান্তরাল হয়ে দাঁড়া দ্বিতীয় খোলস বিচ্ছিন্ন হবার সময়, রকেটের অবশিষ্ট অংশটুকু, অর্থাৎ তৃতী খোলস এবং স্পুৎনিক পৃথিবী-প্রদক্ষিণের কক্ষপথে স্থাপিত হলেও, পৃথিবী কৃত্রিম উপগ্রহ হবার উপযোগী গতিবেগ (ন্যূনপক্ষে ঘণ্টায় ১৮,০০০ মাইল এখনও তাতে সঞ্চারিত হয় নি, কিছু ঘাটতি আছে। রকেটের তৃতীয় খোলসে কাজ হচ্ছে এই ঘাটতি গতিবেগটুকু পূরণ করবার জন্য যতটুকু ছুট দেও দরকার, অন্তত ততটুকু দেওয়া। বলা বাহুল্য, যত বেশি ছুট এখন তৃতী খোলসকে দিয়ে দেওয়ানো যাবে, স্পুৎনিকের কক্ষপথের অপভূও সাধারণত তত পৃথিবী-কেন্দ্র থেকে দূরে হবে। এ-কাজটা অপেক্ষাকৃত সহজ, কারণ এখ আর নিয়ন্ত্রণমূলক যন্ত্রপাতির গোলমালে কোনো হিসাব ভুল হবার নেই ঘণ্টায় ১৮,০০০ মাইল বা তার চেয়ে বেশি গতিবেগ হলেই স্পুৎনিকের কক্ষপ স্থাপিত হয়ে যাবে। এজন্যই বোধ হয় সম্প্রতি এই তৃতীয় খোলসে আবা কঠিন দাহ্য (solid fuel) পদার্থ ব্যবহার করা হচ্ছে। প্রসঙ্গত, এ তৃতীয় খোলসের গতিবেগ বাড়িয়ে যদি ঘণ্টায় ২৫,০০০ মাইল করা যা তাহলে অবশ্য স্পুৎনিক আর উপবৃত্তাকারে পৃথিবী-প্রদক্ষিণ করবে ন পরাবৃত্তাকারে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের বাইরে সূর্যের মহাকর্ষের মধ্যে গি পড়বে। ঘণ্টায় ১৮,০০০ থেকে ২৫,০০০ মাইল গতিবেগের মধ্যে বিভি কক্ষপথে বিভিন্ন স্পুৎনিক স্থাপন করা সম্ভব।

কিন্তু দ্বিতীয় রকেটের খোলসের কাজটা হচ্ছে সর্বাপেক্ষা জটিল, কার প্রথম খোলসের কাজ শেষ হবার পরে, নিরক্ষবৃত্ততল (plane of th equator) থেকে ঠিক কত ডিগ্রি কোণে বাঁকালে পরে (অবশেষে দ্বিতী খোলসের কাজ শেষ হবার সময়ে) তার গতিপথ পৃথিবীর বাঁকা পিঠে সমান্তরাল হয়ে দাঁড়াবে—এই অত্যন্ত নিখুঁত কাজটি দ্বিতীয় খোলসে যন্ত্রপাতির দ্বারা করা হয়। বলা যেতে পারে, দ্বিতীয় খোলসটি মূল রকেটে মস্তিষ্কস্বরূপ। অথচ অনুভূ নির্ধারিত হচ্ছে, মোটামুটি দ্বিতীয় খোলসের কা

করার সময়ে। কাজেই অনুভূকে অপভূ অপেক্ষা দূরে স্থাপন করা অপেক্ষাকৃত আরো কঠিন।

মহাকাশে স্টেশন

রকেট ইঞ্জিন সম্বন্ধে সাধারণভাবে এবং বিভিন্ন কক্ষপথে বিভিন্ন কৃত্রিম উপগ্রহ স্থাপন করার সমস্যা নিয়ে আলোচনা করার পরে, (পৃষ্ঠা ১৩৫ থেকে ২২৬) মোট তিনটি পরিচ্ছেদে, মহাকাশে স্টেশন স্থাপন করার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এবং মহাকাশে মানুষ সশরীরে উপস্থিত হলে তার দৈহিক ও জৈবিক সমস্যা সম্পর্কে বিশদ আলোচনা পাঠকসাধারণ থেকে বিজ্ঞানী, প্রত্যেকেরই বিশেষ কৌতূহলের উদ্রেক করবে। এর পূর্বে আমাদের জানা তিনটি পুস্তকে এই বিষয়ের ওপর আলোচনা হয়েছে—'Across the Space Frontier' নামে একটি সংকলন, এবং Arthur Clarke-এর 'Exploration of Space' এবং 'Interplanetary Flight।' সে বইগুলির মূল বক্তব্যগুলি আলোচ্য পুস্তকে ভালো করে দেওয়া আছে। এ বছরের গোড়ার দিকে 'Man in Space' নামে আমেরিকান বৈমানিক বিভাগ থেকে একটি সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। মহাকাশে সশরীরে মানুষকে পাঠাবার প্রচেষ্টা যে কত দ্রুতগতিতে কার্যে পরিণত করবার চেষ্টা করা হচ্ছে, তার বিশদ বিবরণ ও সর্বাধুনিক তথ্যাদিও এতে পাওয়া যাবে। বইটি মূল্যবান, তবে সামরিক দিকের ওপর জোরটা বেশি পড়েছে এই বইয়ে।

একই কক্ষপথে নিক্ষিপ্ত বহু স্পুৎনিককে জুড়ে জুড়ে বাসোপযোগী একটি মহাকাশে স্টেশন তৈরি করা হবে। ভবিষ্যতের মহাকাশে স্টেশনের নানা-রকম সম্ভাব্য চেহারা (designs)এ পর্যন্ত অনেক বৈজ্ঞানিকই করেছেন, যার কয়েকটি ছবিও আলোচ্য পুস্তকে দেওয়া হয়েছে। আলোচ্য লেখক এবং ওয়েরনার ভন্ ব্রাউনের মতে মহাকাশ-স্টেশন মোটরের টায়ারের মতো করাই সবচেয়ে সুবিধা এবং তাকে তার নিজ কেন্দ্রের চতুর্দিকে ঘুরিয়ে দিতে পারলে কেন্দ্রাতিগ বলের দ্বারা পরিধিতে একটা ওজনের অনুভূতি পাওয়া যাবে, অথচ কেন্দ্রটি এবং সমগ্র স্টেশনটি হবে ওজনবিহীন। কারণটা অবশ্য পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ বলের অভাবের জন্য নয়, স্টেশনের কক্ষপথের গতিবেগ (যেটা তার কেন্দ্রাতিগ বল) পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ-বলের প্রভাবকে

(যেটা তার কেন্দ্রাতুগ বলে) নাকচ করে দেবে। এই সাধারণ ভুল ধারণা খুব বেশি চালু বলেই আমরা প্রসঙ্গত কথাটা বলে রাখলাম।

মহাকাশ-স্টেশনে আবহাওয়া সৃষ্টির সমস্যা

আমরা জানি, যে পরিমাণ (in volumes) অক্সিজেন আমরা প্রশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করি, তার শতকরা ৮৫ ভাগ আবার কারবন-ডাইঅক্সাইড রূপে নিঃশ্বাসের সঙ্গে নির্গত হয় (এটাকে বলা হয় Respiratory Quotient) ৫০ ঘন ফুট আয়তনের মধ্যে একটি মানুষ যদি নিশ্চলভাবে (কোনো কাজ করলে তার নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসের হার বেড়ে যাবে) বাস করে, তাহলে ৪ ঘণ্টা পরে অক্সিজেনের পরিমাণ শতকরা ১৪ ভাগ কমে গিয়ে কারবন-ডাইঅক্সাইডের ভাগ শতকরা ৬ ভাগ বেড়ে যাবে। জলীয় বাষ্পের, তথা আর্দ্রতার দ্বিগুণ বৃদ্ধি হবে প্রথম ১৫ মিনিটের মধ্যেই। সাধারণ মানুষের বাঁচবার পক্ষে শতকরা ১২ ভাগের কম অক্সিজেন কমানো নিরাপদ নয়, কিন্তু কারবন-ডাইঅক্সাইডের আনুপাতিক পরিমাণ কত বাড়ানো যেতে পারে, এ নিয়ে মতভেদ আছে। তাছাড়া কত সময় সেই মানুষটি ঐ বিশেষ পরিবেশে বাস করবে, সেটাও আমাদের হিসাবের একটা বড়ো অঙ্গ। "Man in Space" বইতে বলা হয়েছে, দুটি মানুষ শতকরা ৩ ভাগ কম কারবন-ডাইঅক্সাইড পরিবেশে বাস করে খানিকটা ধাতস্থ (acclimatised) হয়েছিল।

এটা ঠিক যে মহাকাশ-স্টেশন অথবা ব্যোমযানের কেবিনে পৃথিবীর স্বাভাবিক আবহাওয়ার সৃষ্টি না করে (শতকরা ২১ ভাগ অক্সিজেন, ৭৯ ভাগ নাইট্রোজেন), বিশুদ্ধ অক্সিজেন ভরে দিতে হবে। অনেকে হাইড্রোজেন-পেরোক্সাইড (H_2O_2) ব্যবহার করবার প্রস্তাব করেছেন, যাতে জল এবং অক্সিজেন দুয়েরই অভাব এক সঙ্গে মেটানো যাবে। পটাসিয়াম সুপার অক্সাইডের (KO_2) দ্বারা একই সময়ে অক্সিজেনের চাহিদা মেটানো এবং কারবন-ডাইঅক্সাইড সরাবার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

$$4KO_2 + 2H_2O = 4KOH + 3O_2$$

$$4KOH + 2CO_2 = 2K_2CO_3 + 2H_2O$$

জলীয় বাষ্পের সাহায্যে অক্সিজেন এবং পটাসিয়াম হাইড্রোক্সাইড পাওয়া গেল এবং সেটা আবার কারবন-ডাইঅক্সাইডকে শুষে নিয়ে জলীয় বাষ্পের সৃষ্টি করল। এই স্বয়ংসম্পূর্ণ ব্যবস্থাতে একটা মুশকিল থেকে যাচ্ছে—তিনটি অ

(molecule) অক্সিজেনের রূপান্তরে দুটি অণু কারবন-ডাইঅক্সাইড পাচ্ছি, অর্থাৎ respiratory quotient দাঁড়াচ্ছে ২।৩ ভাগ।

অক্সিজেন কারবন-ডাইঅক্সাইডের স্বয়ংসম্পূর্ণ চক্রাবর্ত (cycle) সৃষ্টি করবার জন্য ক্লরেলা নামক শেওলার চাষ করে সালোকসংশ্লেষ (photosynthesis) ব্যবস্থা অবলম্বন করার কথাও ভাবা হয়েছে। ২৩০ লিটার বা ৮·১ ঘন ফুট জলে ২·৩ কিলোগ্রাম ওজনের ক্লরেলা প্রতিদিন ৬০০ লিটার অক্সিজেন তৈরি করতে পারে, এবং তার ফলে প্রতি কিলোগ্রাম ক্লরেলা চক্রহারে প্রতিদিন প্রায় আড়াইগুণ ওজন বৃদ্ধি পাবে। কাজেই মাঝে মাঝে শেওলা পরিষ্কার করবার ব্যবস্থাও রাখতে হবে আমাদের স্টেশন বা ব্যোমযানে। এই ক্লরেলা বৃদ্ধি পাবার জন্য তাকে নাইট্রেট বা ইউরিয়া (urea) খাওয়াতে হবে, সেটা অবশ্য মনুষ্যদেহ থেকে প্রাকৃতিক তাগিদে নির্গত হয়। তবে এই ক্ষেত্রেও স্বয়ংসম্পূর্ণ নাইট্রোজেন চক্রাবর্ত (nitrogon cycle) সৃষ্টি করা সম্ভব হবে কিনা, অর্থাৎ ক্লরেলা নির্গত নাইট্রেটকে মানুষের উপযুক্ত কোনোরূপ প্রোটিন-খাদ্যে পুনরায় রূপান্তরিত করা যাবে কিনা—এটা এখনও ভবিষ্যতের আলোচনার জন্য স্থগিত আছে।

মহাকাশে মানুষ

জীবধাত্রী পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল মাতার স্নেহাঞ্চলের মতো আমাদের ঘিরে রয়েছে, রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-বর্ণের যে সমারোহ আমাদের জীবনকে সুন্দর সুষমামণ্ডিত করেছে, সে সবই মূলত বায়ুমণ্ডলের জন্য। মাতা ধরিত্রীর স্নেহাঞ্চল ছাড়িয়ে মহাকাশে গেলে নানারূপ বিপদের সম্মুখীন হতে হবে ; শুধু অক্সিজেনের অভাব নয়, সূর্যজাত অতি-বেগুনী (ultraviolet) রশ্মি, রঞ্জন রশ্মি (X-ray), মহাজাগতিক রশ্মি (cosmic rays), উল্কাপিণ্ডের আঘাত আর অতলস্পর্শী স্তব্ধ শব্দহীন নিকষ কালো মহাকাশের পটভূমি—এ সবের প্রতিক্রিয়া আমাদের দেহ ও মনের উপর কী হবে—তার অনেকখানিই আমাদের কাছে আজো অজ্ঞাত। বায়ুমণ্ডলের স্নেহাঞ্চলের তলায় পরম নিশ্চিন্ত আরামে মানুষ তার সভ্যতা গড়ে তুলেছে, যেমন ছোট ছেলে মার আশ্রয়ে থাকে।

মানুষের মহাকাশে যাত্রা যেন ছোট ছেলে বড়ো হবার পর মায়ের স্নেহাঞ্চল ছাড়িয়ে, সংসারের ঝড়ঝাপ্টার সম্মুখীন হওয়া, যার দ্বারা সে একদিন মনুষ্যত্বের মহৎ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। মহাকাশে মানুষের জয়যাত্রা সমগ্র

মানবসমাজের কৈশোর পার হয়ে প্রথম যৌবনের শুভাগমনী স্থূচিত করে। আমরা স্থির বিশ্বাস করি, নব জ্ঞানলব্ধে বলীয়ান মানবসমাজের যৌবনে তার কৈশোরের গৃহবিবাদরূপ আত্মঘাতী যুদ্ধের বিভীষিকা বিলুপ্ত হতে বাধ্য, সমগ্র প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত মানুষের "pre-history" শেষ হয়ে "real history"-রই স্বর্ণযুগ আরম্ভ হবে।

মহাকাশে মানুষের প্রাণধারণের সমস্যা অবশ্য অনেক। সূর্যজাত অতি-বেগুনী রশ্মির মোকাবিলা করা হয়তো অপেক্ষাকৃত সহজ—কিন্তু বিশেষ বিপদ দেখা দেবে মহাজাগতিক রশ্মি থেকে, যার সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান এখনো অত্যন্ত অল্প। অমর কুকুর লাইকা তার জীবনদান করে কিছু তথ্য আমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছে এবং গত কয়েক বছরে কুকুর, বানর প্রভৃতি বেশ কিছু গৃহপালিত পশুকে মহাকাশের প্রান্তভাগ থেকে রকেটের সাহায্যে ঘুরিয়ে আনা হয়েছে। সুইস্ বৈজ্ঞানিক এজিস্টার বিশেষভাবে রক্ষিত মানুষের চামড়ার একটু অংশ মহাকাশের প্রান্তভাগে পাঠিয়েছিলেন, প্রত্যাবর্তনের পরে সেই চামড়াটুকু অন্য মানুষের দেহের সঙ্গে সংযোগ (graft) করে প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা হয়েছে। আমেরিকাতে এই পরীক্ষা অনেকের ওপর করা হয়েছে। এই সমস্ত পরীক্ষার ফলে ক্রমশ ধারণা হচ্ছে যে অল্পদিন স্থায়ী হলে মহাজাগতিক রশ্মির প্রভাব মারাত্মক হবে না অথবা জৈবিক বিবর্তনের ধারাকে প্রভাবান্বিত করবে না (biological mutation)। কিন্তু চাঁদে যাওয়া-আসা এবং থাকা নিয়ে প্রায় পক্ষাধিক, গ্রহান্তর যাত্রাকালে বৎসরাবধি, তাছাড়া মহাকাশ-স্টেশনে বাসকালীন, মহাজাগতিক রশ্মি আমাদের দেহের ওপর কাজ করবে। লেখকের প্রস্তাব বেশ মৌলিক ও চমকপ্রদ। তাঁর মতে স্থূল (solid) হাইড্রোজেনের আবরণ আমাদের মহাজাগতিক রশ্মির প্রভাব থেকে বাঁচাবে, আবার মহাকাশের আর এক বিপদ উল্কাপিণ্ডের আঘাতের বিরুদ্ধেও চমৎকার বর্মের মতো কাজ করবে। (পৃষ্ঠা ১৭৯)

পৃথিবীর বিরাট পরিধিতে উল্কাপিণ্ডের আঘাত প্রতি সেকেণ্ডে কয়েক সহস্র হলেও, তাদের অধিকাংশই ধূলিকণার মতো অতি ক্ষুদ্র। পৃথিবীর তুলনায় ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র মহাকাশ-স্টেশনে তাদের আঘাত হবে আরো কম। বৈজ্ঞানিক গ্রিমিঙ্গারের হিসাবটি ধরা যাক। ৪৮৩ কিলোমিটার ঊর্ধ্বে পৃথিবী-প্রদক্ষিণরত, ৯৩ বর্গমিটার ব্যাপী মহাকাশ-স্টেশনে বিভিন্ন আকারের উল্কাপিণ্ডের আঘাত হবে :

"For a meteorite with a diameter of 5·21 millimeters (the size of a drop of water) the two successive falls of meteorites on the satellite was found to be 38,800 years ; with a diameter of 1.12 millimetres, 388 years and with a diameter of 0.24 millimetre, 3.88 years." (লেখকের উদ্ধৃতি, পৃঃ ১৮০)

অতএব উল্কাপিণ্ডের আঘাত থেকে মহাকাশ-স্টেশনের বিপদের সম্ভাবনা, কলকাতার রাস্তায় চলতে চলতে গাড়ি চাপা পড়ে মৃত্যু হবার চেয়ে নিশ্চয়ই কম। তবে বহুদিন ঘূর্ণ্যমান মহাকাশ-স্টেশনে উল্কাপিণ্ডের 'ধূলিকণা' জমে জমে তার চাকচিক্য নষ্ট হবার ফলে তার অভ্যন্তরে উত্তাপের সমতা রক্ষা করা মুশকিল হতে পারে। পুরনো জিনিসকে রং করবার মতো, মহাকাশ-স্টেশনের উজ্জ্বল সাদা রংকে মাঝে মাঝে এক পোঁচ সাদা পেণ্ট দেবার ব্যবস্থা নিশ্চয়ই করতে হবে।

বড়ো উল্কাপিণ্ডের সঙ্গে সংঘাতের সম্ভাবনা, হাজার কম হলেও আছে নিশ্চয়ই—এরকম একটি আঘাতেই স্টেশনের মানুষের বাসোপযোগী কেবিন থেকে বায়ুর নিষ্কাশন হয়ে কয়েক মিনিটের মধ্যে মৃত্যু অবধারিত। এর প্রতিষেধক ব্যবস্থা নিয়ে বহু আলোচনা ও তর্কের অবতারণা হয়েছে—কেউ বলেছেন, স্টেশনের কয়েকটি স্তরভাগ করতে, কেউ বলেছেন মোটর গাড়ির বাম্পারের মতো স্টেশনের চতুর্দিকে সামান্য দূরে (২-৩ সেন্টিমিটার) বাম্পার তৈরি করতে। আলোচ্য লেখকের মতে :

"The meteor hazard can perhaps be eliminated by the aid of radar installations which automatically would change the path of the artificial satellite. The maximum velocity of a meteorite relative to the sun in the neighbourhood of the earth is 42 kilometres per second. The maximum velocity of an artificial satellite relative to the sun, however, is not over 11 kilometres per second plus the velocity of the earth (about 30 kilometres per second), i.e. not over 41 kilometres per second in all. Consequently, even in the opposed motion, meeting a satellite, the impact velocity of a meteorite on a satellite cannot exceed 83 kilometres per second. For this reason, if radar detects the approach of a meteoric body of a

distance of 1,000 kilometres, the automatic devices would have 12 seconds available, which would be entirely sufficient to change the satellite's course." (পৃষ্ঠা ১৮২)
প্রস্তাবটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য, সন্দেহ নেই।

মহাকাশে স্টেশন বা ব্যোমযানে ওজনবিহীন অবস্থায় বাস করার অনেক রকম সমস্যা ও উদ্ভট অবস্থার সৃষ্টি হবে। তাছাড়া রকেটযাত্রার শুরুতে, পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের নাগপাশ যখন তার শতবাহু মেলে আমাদের পৃথিবী-কেন্দ্রের দিকে টানতে থাকবে এবং তার বিরুদ্ধে আমাদের রকেটের মোটর চালিয়ে (গ্যাসের বিস্ফোরণ করে) রকেটকে ছুট দিতে হবে, তখন ওজন বেড়ে যাবে ৬।৭ বা ৮ গুণ। ৮ গুণ ওজন বাড়লে (৮-G) হলে মানুষ সম্পূর্ণ জ্ঞান হারাবে এবং এই অবস্থায় মানুষকে বেশিক্ষণ রাখা যায় না। আর রকেটের মোটর বন্ধ করলেই ওজনহীন অবস্থায় পড়তে হবে। ওজন বাড়লে মানবদেহে কী প্রতিক্রিয়া হয়, তার পরীক্ষা centrifuge যন্ত্রের সাহায্যে (কেন্দ্রাতিগ বলের দ্বারা ওজনকে কৃত্রিম উপায়ে বাড়িয়ে) করা হয়েছে। ওজনবিহীন অবস্থার পরীক্ষার জন্য জেট এরোপ্লেনকে ভূপৃষ্ঠের অনেক উঁচুতে, একটা বিশেষ পরাবৃত্তাকারে ধাবমান করিয়ে মিনিটখানেকের মতো ওজনবিহীন অবস্থার সৃষ্টি করা যায়। কাজেই ওজনবিহীন অবস্থার পুরো পরীক্ষা মহাকাশে না গেলে করা হয়তো সম্ভব নয়। এই বিষয়ে বিভিন্ন দেশের পরীক্ষার একটা চলতি বিবরণ বইখানাতে বেশ ভালো করে সাজিয়ে দেওয়া আছে (পৃষ্ঠা ১৬৭-১৭৩)। শুনে লোভ হবে স্টেশনের যাবতীয় কাজকর্ম চালাবার জন্য সূর্যরশ্মিজাত অফুরন্ত বিদ্যুৎশক্তি পাওয়া যাবে, প্রায় বিনা খরচে।

পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তনের উপায়

মহাকাশ-স্টেশন থেকে ভূপৃষ্ঠে সরাসরি নেমে এলে উল্কাপিণ্ডের মতো জ্বলে ছাই হয়ে রকেটের ভস্মাবশেষ মাত্র ধরাপৃষ্ঠে এসে পৌঁছতে পারে। সম্প্রতি দু-একটা পরীক্ষা থেকে বোঝা যাচ্ছে, বায়ুমণ্ডলের সংঘর্ষজাত উত্তাপের কিছু ভাগ বায়ুকণার মৌলিক গঠনকে ভাঙতে সাহায্য করার জন্য (thermal dissociation) সংঘর্ষজাত উত্তাপ কিছু কম হবে।

পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ভেতর দিয়ে সোজা না নেমে এসে, প্রথমে

উপবৃত্তাকার কক্ষপথে টেরচাভাবে সবচেয়ে উপরের পাতলা বায়ুস্তর ছুঁয়ে মহাকাশে ছুটে, বেরিয়ে সারা ভূমণ্ডল প্রদক্ষিণ করে, দ্বিতীয়বার আরো একটু নিচের দিকে (অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠের দিকে) ছুঁয়ে, বায়ুমণ্ডলের মধ্যে স্প্রিংয়ের মতো কয়েকবার পাক খেতে খেতে নামতে হবে। বেশ জটিল পরিকল্পনা, আর আমাদের জ্ঞান এ-সম্বন্ধে এখনো অত্যন্ত কম। বিশেষ করে, প্রত্যাবর্তনকারী রকেটের চলমান ও স্থৈতিক (kinetic and potential) শক্তির আনুপাতিক কতখানি অংশ বায়ুসংঘাতে উত্তাপশক্তিতে (thermal energy) পরিণত হবে, কতখানি অংশ অন্য ধরনের শক্তিতে রূপান্তরিত হবে, তার কোনো হিসাব আমরা এখনও দিতে পারি না। তাছাড়া রকেটকে কতখানি এবং কিভাবে ছিমছাম (streamlined) করা দরকার এবং সম্ভব, সে সম্বন্ধেও আগে থেকে পুরো অনুসন্ধান চালিয়ে আমাদের জ্ঞানকে যতদূর সম্ভব সুস্থির করা দরকার।

আলোচ্য পুস্তকের ২১০ থেকে ৩৩৬ পৃষ্ঠা অবধি স্পুৎনিকদের থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন তথ্যের বিশ্লেষণ, ভবিষ্যতে আরো কী কী পাবার সম্ভাবনা, চাঁদের এবং মঙ্গলগ্রহের চতুর্দিকে উপগ্রহ স্থাপনের পরিকল্পনা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। চাঁদে বা মঙ্গলগ্রহে গমন ও অবতরণের পরিকল্পনা ইত্যাদি কোনো বক্তব্য এখানে উপস্থিত করা হয় নি। লেখকের "Interplanetary Travel" বইতে এর ওপর কিছু আলোচনা আছে। এই পুস্তকের পরিকল্পনা অনুযায়ী স্পুৎনিক ও মহাকাশের স্টেশনের যাবতীয় সমস্যার বিশদ ব্যাখ্যা দেওয়াই বইয়ের উদ্দেশ্য ছিল।

মহাকাশে আইনগত অধিকার

একেবারে শেষে, 'পরিশিষ্টে', মহাকাশে আইনগত অধিকারের ওপর একটি ছোট বক্তব্য রাখা হয়েছে। সাম্প্রতিক কালে, Space Medicine-এর মতো Space Law-ও বিদ্বৎসমাজে একটি পৃথক বিষয়বস্তু বলে পরিগণিত হতে পারে। সম্প্রতি জাতিসংঘের আইনবিভাগের সহ-অধ্যক্ষ অস্কার স্চাটার (Oscar Schachter) "Across the Space Frontier" পুস্তকে এবং মস্কোতে প্রকাশিত "International Affairs" নামে মাসিক পত্রিকাতে এ বিষয়ে কিছু কিছু আলোচনা হয়েছে।

সমালোচকের মতে, মহাকাশে কোনো দেশের ভৌগোলিক সীমারেখার

ভিত্তিতে জাতীয় সার্বভৌমত্বের দাবি তোলা একেবারেই অবাস্তব; কারণ পৃথিবীর বার্ষিক ও আহ্নিক গতির ফলে, মহাকাশের পটভূমিতে, প্রত্যেক দেশের ওপরকার মহাকাশের (যাকে ভৌগোলিক অধিকারের ভিত্তিতে নিজস্ব ভূমি বলে দাবি করা হয়) প্রতি মুহূর্তেই স্থান পরিবর্তন হচ্ছে। প্রত্যেকের দেশের ওপরকার বায়ুমণ্ডল ঘেরা আকাশ সম্বন্ধে এ কথা খাটে না। কাজেই এরোপ্লেনের আবিষ্কারের ফলে Air Law করা সম্ভব হয়েছিল। আইনের পূর্বানুবর্তিতা বা precedence অনুসারে মহাকাশের ক্ষেত্রে মহাসমুদ্রে প্রযোজ্য কোনো কোনো নিয়মের সঙ্গে মিল পাওয়া যেতে পারে; যেমন মহাকাশে ভ্রাম্যমান বিশেষ ব্যোমযানকে বিশেষ দেশের ভৌগোলিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত বলে ধরা যেতে পারে।

সম্প্রতি চাঁদে সোভিয়েত রাষ্ট্রের প্রতীককে পাঠানোর সময়ে আমেরিকাতে ভ্রমণরত ক্রুশ্চেভকে বারবার প্রশ্ন করা হয়েছিল, এর দ্বারা সোভিয়েত চাঁদকে নিজের জমির অন্তর্ভুক্ত বলে দাবি করবে কি না? ব্যাপারটা হয়তো ঠিক হাস্যকর নয়, কারণ কয়েক বছর আগে "Destination Moon" ফিল্মে, চাঁদে অবতরণের পরে ছবির নায়করা সমস্ত চাঁদকে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নামে দাবি করেছিল। আমেরিকার পক্ষে অবশ্য এখনো সমস্ত দাবিটা কল্পনার রাজত্বেই থেকে গেছে, তাঁদের রকেট বার-দুয়েক চাঁদে যাবার চেষ্টা করে, যান্ত্রিক গোলমালের দরুণ মাঝপথে পৃথিবীতে ফিরে এসে, প্রশান্ত মহাসাগরে সলিল-সমাধি প্রাপ্তি হয়েছে। রাষ্ট্রপ্রতীক পাঠালে চাঁদের জমিতে অধিকার দাবি করা হবে—এই অমূলক ভয়টার পেছনে খানিকটা মধ্যযুগীয় জলদস্যুসুলভ "skull and cross bones"-এর ঐতিহ্য বোধ হয় রয়েছে। যাই হোক সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রীর দ্বিধাহীন ঘোষণা এ ব্যাপারে সমস্ত সন্দেহের নিরসন করেছে। অসকার স্যাটার (Oscar Schachter) ঠিকই বলেছেন:

"...there would be the baffling question of the extent of the territory claimed—how much of the moon, for example, should belong to the country whose rocket ships landed in one or two places and whose authority could in any event be only nominal with respect to that territory.... to many it would be no less than appalling that the moon, the planets, and perhaps the stars, which have

for ever belonged to all humanity, should suddenly become the exclusive property of particular countries." ('Across the Space Frontier'—পৃষ্ঠা ১২৩)

আমরা জাতি-সঙ্ঘের আইনবিভাগের সহ-অধ্যক্ষ, অস্কার স্যাটারের উপরিউক্ত মনোভাবের সঙ্গে নিশ্চয়ই একমত হতে পারি।

ওয়েরনার ভন ব্রাউন মহাকাশে স্টেশন স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা সামরিক কারণেও বিশেষ দরকারী বলে মনে করেন। তাঁর মতে:

"...certainly no place on earth from pole to pole would be safe from such a weapon (এটম বোমাযুক্ত রকেট বা ক্ষেপণাস্ত্র) fired from a satellite in space. In view of the station's ability to pass over all inhabited regions on earth, such atom-bombing techniques would offer the satellite's builders the most important tactical and strategic advantage in military history." ('Across the Space Frontier', পৃষ্ঠা ৫৫)

আমাদের আলোচ্য লেখক এই ধরনের উক্তির বিরুদ্ধে ধীরভাবে বলেছেন:

"The adherents of the use of artificial satellite as bomb carriers should bear in mind, however, that such a satellite is very difficult to build and is much easier to shoot down. If a satellite is struck by a missile aimed in its direction, even at the instant when the missile stops for a moment (at the ceiling) the missile will still puncture the satellite's skin, since the relative velocity of impact of satellite and missile (or its fragments if the missile has exploded) is several times as high as the impact velocity of an artillery shell." (পৃষ্ঠা ৩১৫)

মহাকাশে স্টেশনগুলি পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ বলের প্রভাবে পৃথিবী-প্রদক্ষিণ করার ফলে, তাকে বাধ্য হয়েই পৃথিবী-কেন্দ্র দিয়ে লাইন টানলে যে তলের (plane) কল্পনা করা হয়, সেই তলেই একমাত্র ঘুরতে পারে (যাকে বলা যেতে পারে plane of the great circle)। কেবল মেরুদেশের ওপরে, বা কোনো অক্ষরেখা ধরে পৃথিবী-প্রদক্ষিণ করা সম্ভব নয়। তাহলে একমাত্র বিষুবরেখার উপরে অবস্থিত দেশগুলি ছাড়া আর

যে কোনো দেশেরই তৈরি মহাকাশ-স্টেশন (যেটা তাদেরই দেশের মা থেকে নিশ্চয়ই ছোঁড়া হবে) অন্য দেশের ওপরের অঞ্চল (অবশ্য মহাকাশে প্রান্তভাগ-অঞ্চল) দিয়ে যেতে বাধ্য। ধরা যাক, ক্যানাডা ৮০ ডিগ্রি অক্ষরেখার উপরে অবস্থিত গ্রাণ্টল্যাণ্ড থেকে মহাকাশ-স্টেশন ছুঁড়লো। সেক্ষেত্রে, একদিকে যেমন ক্যানাডার ছোঁড়বার অধিকার নিশ্চয়ই আছে, অন্যদিকে সেই স্টেশনটি বিষুবরেখা পার হয়ে সমস্ত দক্ষিণ গোলার্ধ পরিভ্রমণ করবে দক্ষিণমেরু অবধি—প্রাকৃতিক নিয়মের বশে এর অন্যথা হতে পারে না। অথচ যে যে দেশের উপর দিয়ে স্টেশনটি যাবে, তারা যদি প্রতিবাদ করে তাদের জাতীয় সার্বভৌমত্ব খর্ব করা হচ্ছে এই যুক্তিতে! উভয়সংকট আর কি? তাহলে তো বিষুবরেখাতে অবস্থিত দেশগুলি ছাড়া আর কেউ-ই মহাকাশে স্টেশন স্থাপন করতে পারবে না। একমাত্র তারাই ইচ্ছা করলে স্টেশনগুলিকে তাদের দেশের উপরকার মহাকাশ-অঞ্চলে স্থিরভাবে রাখতে পারে। স্টেশনগুলি অবশ্য স্থাণু হয়ে থাকবে না, পৃথিবীর আহ্নিক গতির সঙ্গে তাদের গতির সমতা রক্ষিত হবার ফলে তাদের স্থির বলে প্রতীয়মান হবে।

পৃথিবী ছাড়িয়ে মহাকাশে যাত্রা শুরু করলে সমস্ত পৃথিবীটাকেই একটা সামগ্রিক সত্তা হিসাবে ধারণা করবার মানসিক তাগিদ থাকবে শুধু তাই নয়, কার্যক্ষেত্রেও সেটা ছাড়া আর কোনো উপায়ে এগোনো যাবে না। সম্প্রতি আন্তর্জাতিক ভূ-পদার্থ বিজ্ঞানবর্ষেও (International Geophysical Year, ১লা জুলাই, ১৯৫৭ থেকে ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৫৮) পৃথিবীর বিজ্ঞানকে পূর্ণাঙ্গ করবার প্রচেষ্টাতে ৬৭ দেশের ৫,০০০ বৈজ্ঞানিককে সারা পৃথিবী জুড়ে ২,৫০০ রিসার্চ স্টেশন থেকে একজোটে কাজ করতে হয়েছে। এই রিসার্চের ক্ষেত্র মহাকাশেও বিস্তৃত ছিল। সোভিয়েত এবং আমেরিকান কৃত্রিম উপগ্রহেরা যেন উড়ন্ত গবেষণাগার, মহাকাশ থেকে "নিরীক্ষণ" করে পৃথিবীকে আরো ভালো করে জানবার জন্য বহু নতুন তথ্য আমাদের কাছে পৌছে দিচ্ছে। পৃথিবীকে জানতে হলে কোনো বিশেষ দেশের, যত বড়োই হোক না কেন, কোণ থেকে জানা যায় না।

আজকে পৃথিবীকে জানবার ও অদূর ভবিষ্যতে মহাকাশে অন্য 'পৃথিবীকে', চাঁদকে অথবা মঙ্গলগ্রহকে জানবার প্রচেষ্টা একমাত্র জাতিতে জাতিতে সম্প্রীতি ও সহযোগিতার ভিত্তিতেই হতে পারে, এই সহজ সত্যটি ক্রমশ স্বচ্ছ

হয়ে আসতে বাধ্য। সোভিয়েত ও আমেরিকান কৃত্রিম উপগ্রহেরা এবং এই দুই দেশ থেকে প্রেরিত সূর্যের কৃত্রিম গ্রহেরাও এ পর্যন্ত শান্তির কাজে মানুষের জ্ঞানভাণ্ডারে বহু নতুন রত্নের সমাবেশ করেছে। শান্তি ও সম্প্রীতির আবহাওয়া বজায় থাকলে আইনের জটিলতা দূর হয়ে যাবে—এই স্থির বিশ্বাস আমাদের আলোচ্য লেখকও তাঁর বইয়ের শেষ কয়টি লাইনে ব্যক্ত করেছেন :

"It is obvious that all these questions, despite their complexity, can be solved if the contracting parties approach the subject with goodwill and under the condition that artificial satellites shall be utilised, only for peaceful purposes."

কৃষ্ণ আফ্রিকার মর্মবাণী

গোপাল হালদার

'আফ্রিকা বর্ষ'—ইং ১৯৬০ সাল ইতিমধ্যেই এই নামে পরিচিত। রা পোহাতেই প্রায় প্রতিদিন শুনি—ছোট হোক, বড় হোক, আর এক এতদিনের অজ্ঞাত-কুল-শীল জাতি স্বাধীন হতে যাচ্ছে, মানুষের ইতিহাসে পা প্রবেশাধিকার।

দশ বছর আগেও ঈথোপিয়া (খ্রী. পূঃ ২০০ অব্দ থেকে) ও লাইবেরিয়া (ই ১৮৪৭ থেকে) ব্যতীত আফ্রিকার কোনো দেশ স্বাধীন ছিল না—মিশরে স্বাধীনতা ছিল প্রায় প্রবঞ্চনা, আর দক্ষিণ-আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ স্বাধীনতা তখ বা এখনও স্বাধীনতার ব্যভিচার। আজ অবশ্য পর্তুগাল, স্পেন ও দক্ষি আফ্রিকার মতো ফ্যাসিস্ত রাজ্য ছাড়া কেউ আর আফ্রিকার স্বাধীনতার দাবি প্রকাশ্যত অস্বীকার করতে চায় না। তবে অনেক দেশের নব-লব্ধ স্বাধীনত এখন পর্যন্ত অনিশ্চিত, আর অনেক দেশে তা প্রায় প্রবঞ্চনা। এ বিরাট মহাদেশের সুপ্তিভঙ্গে পৃথিবীর ইতিহাসে কোন সম্ভাবনা সন্নিকট, কে বলবে?

পশ্চিম আফ্রিকার অভিজ্ঞতা

কৃষ্ণ আফ্রিকার অভিযান স্বাভাবিকভাবেই অভিনন্দিত করেছে সোভিয়েত, চীন প্রভৃতি সমাজতন্ত্রী দেশ আর ভারতবর্ষের মতো সদ্যস্বাধীন এশিয়ার জাতিরা। আফ্রিকার জাতিরাও এই দুই গোষ্ঠীর জাতিদেরই নিজেদের আত্মীয় বলে জানে, ভালবাসে, মান্য করে—আফ্রেশীয় সম্মেলনে তা দেখা যায়।

কৃষ্ণ আফ্রিকার নব-প্রতিষ্ঠিত রাজ্যের মধ্যে ঘানাই শিক্ষাদীক্ষায় অগ্রগণ্য, —তারপরেই স্থান নাইজেরিয়ার। দুই দেশই ভারতবর্ষকে মনে করে তাদের

Asianism: The African Personality: Suniti, Kumar Chatterji., Bengal Publishers, Calcutta. P 220+24 Plates, 1960, Price Rs. 16.00.

অগ্রজ—বান্দুং সম্মেলনে (১৯৫৫-এর এপ্রিল মাসে) পণ্ডিত জওহরলাল ও চৌ এন-লাইয়ের নেতৃত্বে আফ্রেশীয় সংহতির গোড়াপত্তন হয়। ঘানার নেতৃত্ব তখন থেকে আফ্রিকার সংহতি গঠনের কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন। আজ আফ্রেশীয় সংহতির প্রধান এক কেন্দ্র আক্রা—ঘানার রাজধানী। ১৯৫৪ সালের জুলাইর শেষ সপ্তাহে আক্রায় স্বায়ত্তশাসন-প্রাপ্ত ঘানার প্রথম পার্লামেন্টের উদ্বোধন উৎসব হয়। ভারতের পক্ষ থেকে শুভকামনা বহন করে সে উৎসবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। জুলাইর শেষ সপ্তাহে তিনি ঘানায় যান, এবং ঘানা, নাইজেরিয়া, লাইবেরিয়া —এ তিনটি দেশ দর্শন করে ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন করেন আগস্টের শেষে। পশ্চিম আফ্রিকার প্রায় পাঁচ সপ্তাহ কালের এই ভ্রমণ অভিজ্ঞতা ও কৃষ্ণ আফ্রিকার সংস্কৃতি ও সাধনা বিষয়ে তাঁর নিজস্ব ধারণা ও ভাবনার কথা তিনি কিছু কিছু 'বিশ্বভারতী' প্রভৃতি পত্রের পৃষ্ঠায় বিবৃত করেছিলেন। সম্প্রতি ইংরেজী ভাষায় সম্পূর্ণ বক্তব্য গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে—সেই সঙ্গে সে-গ্রন্থে আছে ডাক্তার রাধাকৃষ্ণনের লিখিত পরিচিতি, আর কৃষ্ণ আফ্রিকার শিল্পপরিচায়ক কয়েকখানা চমৎকার চিত্র; ভাষা-নির্দেশক একখানি মানচিত্র।

শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ভ্রাম্যমান নন, ভ্রমণ-বিলাসীও নন। বিশ্বরূপ-দর্শনেই তাঁর আগ্রহ। এ আগ্রহ বাঙালীর মধ্যে বিরল, সামর্থ্যও দুর্লভ। রবীন্দ্রনাথের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র। সম্ভবত অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায়ের বহুমুখী দৃষ্টিও সেই কবি-দৃষ্টির প্রসাদে ভ্রমণ-রসের সঙ্গে জীবন-বোধের সংযোগ-সাধনে অভ্যস্ত। তাঁর স্বকীয় সম্পদও অসামান্য—অফুরন্ত জিজ্ঞাসা, অশেষ পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা, অক্ষয় স্মৃতি সম্পদ। কৌতুকদৃষ্টিও তাঁর স্বভাবগত, তথাপি তাঁর ভ্রমণ-কথার প্রধান ধর্ম—বিষয়-গৌরব, তা রম্য-রচনা নয়। লঘু-ভঙ্গিতে কথিত হলেও তাঁর ভ্রমণ-কথা তথ্য-সমৃদ্ধ আলোচনা, ভাবনা-সমৃদ্ধ জিজ্ঞাসা। 'আফ্রিকানিজম' গ্রন্থখানা বিশেষ করে সেরূপ।

গ্রন্থের নাম থেকেই বোঝা যায়—ভ্রমণ-কথা তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য নয়। ভ্রমণাংশটুকু তিনি প্রায় দিনপঞ্জীর সংক্ষিপ্ত হিসাবের মতো উপস্থাপিত করেছেন গ্রন্থের শেষ দিকে। কিন্তু দর্শনীয় বিষয় অপেক্ষাও জীবন-দর্শনই এ গ্রন্থের বিশেষ বিষয়—অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায়ের লক্ষ্য শুধু পশ্চিম আফ্রিকার কৃষ্ণ জাতিদের জীবনযাত্রা নয়, সেই জীবনযাত্রার বিশিষ্ট অর্থ, অথবা তারও বেশি।

—কৃষ্ণ আফ্রিকার মানব-স্বরূপ, দি আফ্রিকান পার্সোনালিটি, কৃষ্ণ আ
মর্মবাণী, 'আফ্রিকেয় যান'। অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় অবশ্য
'ভেলটেনশৌঙ' বা বিশ্ববীক্ষা শব্দটি প্রয়োগ করেন—এবং 'এ ওয়ে অব্ লা
অ্যাণ্ড এ ওয়ে অব্ থট্' এই ব্যাপক অর্থেই কালচার শব্দটিও প্রয়োগ কর
—'আফ্রিকেয় যান' না বলে আরও সহজ কথায় হয়তো বলতে পারি অধ্যা
চট্টোপাধ্যায়ের মূল বিষয় 'কৃষ্ণ আফ্রিকার সাধনা।' অবশ্য তা সত্ত্বেও
ভ্রমণ ও ভাবনার মধ্যে তথ্য ও সরস উক্তির অভাব নেই আর মূল বক্ত
বাস্তব পটভূমির একটি আবশ্যকীয় আভাসও পাঠককে তিনি দিতে কা
করেন নি।

নাম ও গোত্র

আফ্রিকা বলতে গ্রন্থকার কৃষ্ণ আফ্রিকাই বোঝেন—উত্তরের-আরব-
মণ্ডল বোঝাতে চান না, এমনকি, ঈথোপিয়া সোমালি দেশও বোঝাতে
না। কারণ, উত্তর অঞ্চল চিরদিনই হাম ও সেম বংশীয় শ্বেতাঙ্গদের স্বদেশ,
ভূমধ্য-জাতিদের সঙ্গে সংযুক্ত। কৃষ্ণ আফ্রিকার জীবন-ধর্ম ও তাদের জী
ধর্ম স্বতন্ত্র। ঈথোপিয়া, সোমালিয়া প্রভৃতি কৃষ্ণাঙ্গ জাতির স্বদেশ হ
ঈথোপীয়রা বহুকাল থেকেই খ্রীষ্টান, সোমালিরা ও আরবীয় ইসলামের অনু
এরা এশিয়ার ধর্ম ও জীবনধারার অনুসরণে এখন অভ্যস্ত—কৃষ্ণ আফ্রি
সাধনা সেখানে বিস্মৃত। স্বকীয় জীবনযাত্রা ও স্বকীয় সাধনায় অবিচ
রয়েছে তাই সাহারা মরুভূমির দক্ষিণস্থ এই মহাদেশের মধ্য ও দক্ষিণ ভূখ
পশ্চিমে ১৫ ও পূর্বে ১০ অক্ষাংশ থেকে দক্ষিণে এ ভূখণ্ডের বিস্তার। ভৌগো
অর্থে না হোক, সাংস্কৃতিক অর্থে, সাধনার দিক থেকে, এই কৃষ্ণ ভূখণ্ডকেই
আফ্রিকা বলা যুক্তি-সঙ্গত।

একটা কথা অবশ্য আমাদের মনে রাখা দরকার—'নিজার' (নদী)
থেকে নিগ্রো শব্দটির উৎপত্তি; কিন্তু এ শব্দটি হীনতাবাচক হয়ে উঠেছে।
নিগ্রো' ও 'বান্টু', দু জাতিরই ও-শব্দটিতে আপত্তি। তারা নিজেদের
আফ্রিকান্' বলেই পরিচয় দেন। সেই অর্থে তাঁদের ভূখণ্ডকে 'মেলানাফ্রি
(আমাদের ভাষায় 'মলিনাফ্রিকা') বলাও চলতে পারে, আর এই বি
জাতি মানুষকে 'মেলনাফ্রিকান্' বা 'মলিনাফ্রিকান'ও বলা সম্ভব।
উচিত নিগ্রো না বলে 'কৃষ্ণ আফ্রিকান্' যেন আমরা বলি, কিংবা বলি 'সু

আফ্রিকান্' ও 'বান্টু আফ্রিকান্'; তারপর নিজ নিজ দেশের বা জাতির নামে তাঁদের যেন চিহ্নিত করি, ঘানায় 'কৃষ্ণ আফ্রিকান্', 'নাইজেরীয় কৃষ্ণ আফ্রিকান্', কিংবা আকান্ (তোয়ে ও ফান্তে), যোরুবা, ইগবোস, হাউসা ইত্যাদি।

কৃষ্ণ আফ্রিকা অবশ্য রাষ্ট্রীয় অর্থে বিভিন্ন রাজ্যে বিভক্ত। জাতি-উপজাতির গণনায়, ভাষার হিসাবে, তা বহু বিচিত্র। সংস্কৃতির হিসাবে, অন্তত প্রাথমিক স্তরে জাতির সংস্কার ও ভাষার বন্ধনই হয় মৌলিক উপাদান। নৃ-বিজ্ঞানের হিসাবে এ-আফ্রিকায় প্রধানত দুটি প্রধান কৃষ্ণাঙ্গ গোষ্ঠীর বাস—মধ্যে ও উত্তরে বাস করে যাদের বলা হয় সুদানী বা 'খাঁটি নিগ্রো' তারা, আর দক্ষিণে বাস করে যাদের বলা হয় 'বান্টু' তারা। আর আছে কঙ্গোতে কিছু কৃষ্ণাঙ্গ নিগ্রোবটু বা 'পিগমি', দক্ষিণ-পশ্চিমে 'হটেনটট্', 'বুশম্যান' প্রভৃতি পৃথক ক্ষুদ্রতর গোষ্ঠীর মানুষ। এরাই আফ্রিকার 'আদিবাসী'—কৃষ্ণ আফ্রিকা এদেরই স্বদেশ।

'সুদানী' ও 'বান্টু' এই দুই প্রধান গোষ্ঠীর মানুষও আবার বহু জাতি উপ-জাতিতে বিভক্ত। তাদের অধিকাংশই উল্লেখযোগ্য কোনো সভ্যতার স্তরে গিয়ে উত্তীর্ণ হতে পারে নি। পশ্চিমে মালি সাম্রাজ্য ও লাগোস্, টিম্বাক্টু প্রভৃতি শহরে 'সুদানী' বা খাঁটি নিগ্রো জাতিরা পাঁচ শত বৎসর পূর্ব পর্যন্তও একটা সভ্য রাজ্য টিকিয়ে রেখেছিল। পূর্বেও 'বান্টু'-গোষ্ঠী পূর্ব আফ্রিকায়, রোডেশিয়ায়, সভ্যতার কিছু বিকাশ ঘটিয়েছিল। কিন্তু বর্তমান কালে এই কৃষ্ণাঙ্গ সমাজের মধ্যে সভ্যতার নূতন পথে পদার্পণ করতে পেরেছে সেই পশ্চিম আফ্রিকার ঘানা নাইজেরিয়া প্রভৃতি দেশের সুদানী গোষ্ঠীর জাতি-উপজাতিরা। ধর্ম হিসাবে অবশ্য উত্তর থেকে ইসলামের নিঃশব্দ প্রসার তাদের মধ্যে অগ্রসর; পাশ্চাত্ত্য ঔপনিবেশিকদের প্রভাবে বিবিধ খ্রীষ্টান চার্চেরও প্রসার এখন যথেষ্ট। কিন্তু তাতেও এসব জাতির আবহমান জীবন-বেদ এখনো প্রাণবন্ত; এখনো স্বতন্ত্র, আফ্রিকেয় স্বরূপ ও আফ্রিকেয় স্বধর্মে তারা বিশিষ্ট।

বহুজাতি থেকে মহাজাতি ?

ঘানা এখন জাতীয় রাষ্ট্র গঠন করছে। কিন্তু ঘানা এখন পর্যন্ত সম্পূর্ণ 'নেশন' হয়ে ওঠে নি। নানা উপজাতি নিয়ে ঘানা। উত্তরে আছে 'গুর' বংশের দাগোম্বা, তাম্‌প্রুসি প্রভৃতি উপজাতির, তারা অনেকেই ধর্মে মুসলমান। মধ্যে

ও দক্ষিণে 'আকান' বংশের তোয়ি (আশান্তি), ফন্তে প্রভৃতি; উপজাতি
এরাই বেশি উন্নত, অনেকেই এরা খ্রীষ্টান। নাইজেরিয়াও নানা উপজাতি
দেশ—তার মধ্যে প্রধান য়োরুবা (৫০ লক্ষ), ইবোস প্রভৃতি। কেউ খ্রীষ্টান
কেউ মুসলমান ; কেউ আদিধর্মাশ্রয়ী। তারপরে উত্তরে হাউসা উপজাতি
(প্রায় ১.৫ কোটির উপর)—সকলেই প্রায় মুসলমান। এরা সংখ্যায় বেশি
হলেও য়োরুবারাই উন্নত। আরও খণ্ডজাতি, উপজাতি, শাখা-প্রশাখা
আছে। তাদের সর্দার-সামন্তও আছে। লাইবেরিয়া অবশ্য অনেকদিন
স্বাধীন—আমেরিকার নিগ্রোরা এখানে একটি কৃষ্ণাঙ্গ স্বতন্ত্র রাজ্য প্রতিষ্ঠা
করতে পেরেছিল। সেই আমেরিকো-লাইবেরিয়ান্‌রাই এ রাজ্যের নেতা, তারা
ইংরেজী-ভাষী ও খ্রীষ্টান। কিন্তু লাইবেরিয়ার জাতি-উপজাতিগুলো ক্রম
উত্তরের মুসলমান ধর্মের নিঃশব্দ প্রসারে দ্রুত মুসলমান হয়ে যাচ্ছে। ফলে
রাজনৈতিক জটিলতা দেখা দেবার সম্ভাবনাও আছে। জাতির ও ধর্মের পার্থক্য
ছাড়া আরও পার্থক্য এসব কৃষ্ণ আফ্রিকার দেশে আছে—তা ভাষার পার্থক্য।
প্রত্যেক রাজ্যের নানা উপজাতির নানা ভাষা। যেমন ঘানা বেড়িওতে ৬০
ঘানার ভাষা চলে। আরও মজার কথা—এসব ভাষা পূর্বে লিখিতও হয় নি,
তাতে সাহিত্যও রচিত হয় নি। মুখে মুখে চলত লোক-গীতি প্রবাদ প্রবচন।
কিন্তু সাহিত্যচর্চা কোথাও ছিল না। ঔপনিবেশিক যুগে শিক্ষাদীক্ষা চলেছে
শাসকদের ভাষায়—স্বভাষা চর্চার বা উপজাতিক ভাষা ভেঙে-চুরে একটা
জাতীয় ভাষা গড়ে তোলার অবকাশও হয় নি। তাই, ঘানা, নাইজেরিয়া,
লাইবেরিয়া প্রভৃতি অঞ্চলের শিক্ষা ও সাহিত্যের প্রধান ভাষা এখনো ইংরেজী।
সেরূপই ফরাসী উপনিবেশে তা ফরাসী। ঘানায় আকন ভাষা (তোয়ি ও ফান্তে)
রাষ্ট্রভাষা হবে কিনা ; য়োরুবা ভাষা নাইজেরিয়ার রাষ্ট্রভাষা হতে পারে কিনা,
সন্দেহ। শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে সমস্ত কৃষ্ণ আফ্রিকার পক্ষে
ইংরেজীকে 'সাংস্কৃতিক ভাষা' (কুল্‌ত্‌-স্প্রাখে) বলে গ্রহণ করাই হবে সমুচিত।
কারণ তাতে আফ্রিকান্ ঐক্য ও আফ্রিকান্ মানসিক বিকাশ সুসম্ভব। এটা
অবশ্য অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায়ের নিছক ইংরেজী অনুরাগ নয়। কৃষ্ণ আফ্রিকার
ভারতবর্ষের মতো বিকশিত ভাষা ও সাহিত্য নেই। তাদের পক্ষে এই
কারণেও একটা উন্নত ভাষা অন্তত নিজেদের ঐক্য ও বিকাশের জন্য গ্রহণ
করা প্রয়োজন। আর তা করতে হলে ইংরেজী ভাষাই গ্রহণ করা শ্রেয়,
এ কথা মানা যেতে পারে।

একটা কথা, ভাষার বাধা, উপজাতিক পার্থক্যের বাধা, আর এ কালের ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের তৈরি করা রাজনৈতিক প্রশাসনিক পার্থক্যের প্রাচীর—এসব সত্ত্বেও সাধারণভাবে কৃষ্ণ আফ্রিকেয়দের মনের মূল বনিয়াদ একই উপাদানে রচিত, আর একালে তাদের মানসিক ঐক্যও (ইমোশন্যাল ইন্‌টিগ্রিটি) অন্য অনেক দেশের অপেক্ষা সহজতর ও সুসাধ্য। 'নেশন' নামক স্বতন্ত্র সংগঠন তত উগ্র নয় বলেই হয়তো এই সকল কৃষ্ণ-গোষ্ঠীর মূলগত আত্মীয়তা, দ্বিতীয়ত ঔপনিবেশিক সমাজের লোকেদের আভ্যন্তরীণ স্বার্থসাম্য, আর তৃতীয়ত যুগোপযোগী রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক আবশ্যকতা—এই তিনটি ঐক্যসূত্রে সমস্ত কৃষ্ণ আফ্রিকা এক মহাজাতির সমবায় (কন্‌ফেডারেশন) রূপে গড়ে উঠতে পারে। ভৌগোলিক ও সামাজিক-রাজনৈতিক প্রয়োজন মতো স্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র রাজ্যসমূহ স্বেচ্ছায় এক-একটা বড় বড় সংযুক্ত রাষ্ট্রে (ফেডারেশন) সম্মেলিত হওয়া অসম্ভব নয়। ঘানা ও নাইজেরিয়ার বর্তমান রাজনৈতিক নেতারাও আফ্রিকা সম্মেলনকে সেই পরিণতির জন্যই প্রস্তুত করছেন বলে অনুমান করা যায়। যাকে 'আফ্রিকান নেশনালিজম্' বলা হয় তা আসলে আমরা যা দেখতে অভ্যস্ত তেমনিতর 'নেশন'-আশ্রয়ী জাতীয়তাবাদ নয় ; তা বরং 'মাল্‌টি-নেশন' (বহুক্ষেত্রে মালটি-ট্রাইব) আশ্রয়ী মহাজাতির কৃষ্ণ-আফ্রিকাকে আত্মীয়তাবোধ, রাজনৈতিক চেতনা—এই বৈশিষ্ট্যটুকু লক্ষণীয়। বাঁচতে হলে একে আশ্রয় করেই আফ্রিকেয় জাতিরা বাঁচবে—অবশ্য যদি অর্থনৈতিক সহায়তার নামে মার্কিন প্রাধান্য তাতে চেপে না বসে। অন্তত ইউরোপীয় জাতিদের মতো স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নেশনের দুস্তর পরিখায় নিজেদের বেঁধে নেওয়া আফ্রিকান্ দেশগুলির পক্ষে হয়তো অনাবশ্যক এবং অসম্ভব।

আফ্রিকেয় সংস্কৃতির সংজ্ঞা

কিন্তু বাঁচবে তারা কেন—ইতিহাসের কোন প্রয়োজনে? অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায়ের জিজ্ঞাসা প্রধানত তা—সামাজিক-রাজনৈতিক রূপায়ণের প্রশ্ন নয়। কৃষ্ণ আফ্রিকার এ ধরনের রূপায়ণ বোধহয় তিনিও সম্ভাব্য বলেই মনে করেন এবং রাজনৈতিক ব্লকের বাইরে তাদের 'নিরপেক্ষ' আফ্রিকেয় ফেডারেশনরূপে বিকাশ কামনা করেন। কিন্তু তাঁর জিজ্ঞাস্য—মানুষের ইতিহাসের কোন প্রয়োজন মেটাবে এই কৃষ্ণ আফ্রিকান জাতিরা? কৃষ্ণ আফ্রিকেয়দের প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধা ও তেমনি গভীর মানব-প্রীতি নিয়ে

অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় এই কথা আলোচনা করেছেন। তাঁর তথ্য-নি মন কৃষ্ণ আফ্রিকার নৃতাত্ত্বিক, ভাষাতাত্ত্বিক কোনো বৈশিষ্ট্য, কোনো প্রশ্নে উদাসীন নয় আর দার্শনিক ভাবনা ও প্রশ্নেও তাঁর তেমনি বিশেষ আগ্রহ। তথাপি সেসব জড়িয়ে ও সেসব ছাড়িয়ে যে প্রশ্ন—সংস্কৃতির প্রশ্ন, সাধনার প্রশ্ন, কৃষ্ণ আফ্রিকেয় মর্মবাণীর প্রশ্ন—তাতেই অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের আগ্রহ। গ্রন্থের প্রধান অধ্যায় তিনটি এই আলোচনাতেই সমৃদ্ধ—যথা, 'আফ্রিকেয় পার্সোনালিটি' ও 'আফ্রিকানিজম' (আফ্রিকান মানবস্বরূপ, আফ্রিকেয় বা আফ্রিকার সাধনা), 'দি কালচার অ্যাণ্ড রিলিজিয়ন অব দি য়োরুবাস' (পশ্চিম আফ্রিকার য়োরুবা সংস্কৃতি ও ধর্ম), 'দি আফ্রিকান কনসেপশান অব দি ডিভিনিটি' (আফ্রিকেয় দেবতত্ত্ব)। পরবর্তী অন্য প্রসঙ্গ কয়টি ভ্রমণবিবরণ ও সাক্ষাৎ পরিচয়ের কথা। অবশ্য ওই বিশেষ প্রসঙ্গেরই সঙ্গে তাও জড়িত, আর একই দৃষ্টিভঙ্গি ও ভাবনার দ্বারা নিশ্চয়ই অনুপ্রাণিত। মূল প্রসঙ্গ আফ্রিকেয় 'কালচার'।

শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায় 'কালচার' বলতে সাধারণত যে উদার ও ব্যাপক জীবন-চর্যা বোঝেন, এখানে তা পুনরালোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। তবে এ-গ্রন্থে আফ্রিকান মানব-স্বরূপের সন্ধানে প্রথমেই তা তিনি বিজ্ঞাপিত করেছেন (পৃঃ ১০)। 'কালচার' অর্থ 'ভাবনাধারা ও জীবনধারা'; এ ক্ষেত্রে কিন্তু তাঁর বিশেষ আলোচ্য 'ভাবনাধারা', 'জীবনধারা' তার পশ্চাদ্ভূমি—ভ্রমণোপলক্ষেও তার আভাস তিনি কিছু কিছু দিয়েছেন। ভাবনাধারার মধ্যেও তাঁর দৃষ্টি আবার বিশেষ নিবদ্ধ 'ধর্মভাবনা ও দেবভাবনার' দিকে, উপরোক্ত প্রধান প্রসঙ্গত্রয় থেকে তা অনুমেয়। তিনি অবশ্য য়োরুবাধর্মের আলোচনাকালে জানিয়েছেন (পৃঃ ৯০), কোনো জাতির ধর্মচিন্তা সাধারণত এসব জিনিসের ওপর নির্ভর করে—সে জাতির মূল প্রকৃতি বা চরিত্র, তার বাস্তব পারিপার্শ্বিক, তার অর্থনৈতিক জীবন ও জীবিকোপায় এবং যে অবকাশ—ক্ষুধাতৃষ্ণা আত্মরক্ষা প্রভৃতি প্রাথমিক প্রয়োজনের দাবি মিটিয়ে—গভীর ও সুন্দর জিনিসের চর্চার জন্য সে পায়। তাছাড়া, আরও অন্য জাতির সঙ্গে যোগাযোগের ওপরও তা নির্ভর করে। মানব-বিজ্ঞানীদের কথাও মোটের উপর এরূপ। (ভেসলারের মতানুযায়ী) ভাষা, বাস্তব-উপাদান, শিল্প, পুরাকাহিনী, বিদ্যা, ধর্ম, পরিবার ও সমাজব্যবস্থা, সম্পত্তি, রাষ্ট্র-ব্যবস্থা, যুদ্ধ—এ সব হচ্ছে কালচারের বিভিন্ন অঙ্গ। কোনো একটাই একক ও

বিচ্ছিন্ন থাকে না, নানা সূত্রে প্রত্যেকটি প্রত্যেকটির সঙ্গে জড়িত। অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায়ও তা জানেন। এই আপেক্ষিকতা মেনেই তাঁর বিশেষ আলোচ্য কৃষ্ণ আফ্রিকার ধর্ম ও অধ্যাত্মভাবনা,—তাদের আর্ট ও দেবতত্ত্বে যার পরিচয় পাওয়া যায়, আর প্রধানত যার থেকে তাই তিনি কৃষ্ণ আফ্রিকান মানবস্বরূপ লক্ষ্য করতে পারেন এবং বুঝতে পারেন কৃষ্ণ আফ্রিকান জাতীয়তার মর্মবাণী।

প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বে আফ্রিকার আর্ট ও দেবতত্ত্ব অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায়কে কৃষ্ণ আফ্রিকার সম্বন্ধে উৎসুক ও শ্রদ্ধাবান করে তোলে। তখন (১৯১৯) তিনি ছিলেন লণ্ডনে ছাত্র। লণ্ডন মিউজিয়ামে রক্ষিত বেনিনের রানীর ব্রোঞ্জ মুখমণ্ডলের (ষোড়শ শতাব্দীর) শান্ত-বিষণ্ণ গভীর ভাবে তিনি অভিভূত হন। হাতির দাঁতের, কাঠের, পাথরের, মাটির ভাস্কর্যোপকরণে তিনি চমৎকৃত হন। সে সময়েই তাঁর পরিচয় ঘটে নাইজেরিয়ার য়োরুবা-জাতীয় শিক্ষিত দু-একজন পুরুষের সঙ্গে, একজন মুসলমানধর্মী অভিজাত সর্দার ও তাঁর যুবক পুত্রের সঙ্গে। মানুষ হিসাবে দেহে-মনে তাঁরা সকলেই সম্মানের যোগ্য—সুঠাম বলিষ্ঠ দেহের শক্তিময় শ্রীতে, শিক্ষা, বুদ্ধি ও আভিজাত্যের সংযত প্রকাশে। তারপর, অধ্যয়নে অভিজ্ঞতায় তিনি একদিকে পেলেন কৃষ্ণ আফ্রিকান জাতীয় বৈশিষ্ট্যের সন্ধান, অন্যদিকে বুঝলেন মানব-ইতিহাসে এই কৃষ্ণাঙ্গ, প্রায়-অনাবিষ্কৃত মহাজাতির মহৎ সম্ভাবনার কথা। অবশ্য জানতেন—শ্বেত, কৃষ্ণ, পীত সকল জাতির মতোই তাঁদেরও চাই বিশ্বসমাজে আত্মপ্রতিষ্ঠা; আর সেই আত্মপ্রতিষ্ঠার সূচনা হিসাবে প্রথমত চাই আত্মবিশ্বাস, নিজের শক্তিতে, সংস্কৃতিতে আস্থা।

আফ্রিকার প্রাণধর্ম

আস্থার হেতু যথেষ্ট—পাঁচশত বৎসর ধরে ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকদের শ্বাপদবৃত্তি কৃষ্ণ-আফ্রিকার যে ক্ষতিসাধন করেছে, মানুষের ইতিহাসে তা দুরপনেয় কলঙ্ক। তার চেয়ে বেশি ক্ষতিসাধন করেছে তাঁদের খ্রীষ্টধর্মের দম্ভ ও প্রচার। তার দৌরাত্ম্যেই আফ্রিকান ধর্ম অজ্ঞানের ধর্ম, আফ্রিকান জীবনধারা অসভ্যের জীবনধারা, আফ্রিকান মানুষ যেন মানুষই নয়—অ-মানুষ, দাস হবার জন্যই জন্ম—এ নৈরাশ্য ক্রমশ চেপে বসেছিল কৃষ্ণ আফ্রিকানদের মনে। অথচ, মানববিজ্ঞানীরাও সবিস্ময়ে দেখেছেন—

কৃষ্ণ-আফ্রিকার জাতিদের অদম্য জীবনশক্তি। কঠোরতম অবস্থায়ও তারা অদম্য শুধু আফ্রিকায় নয়, কুবায়, এমনকি, মার্কিন দেশেও। যে নিজস্ব জীবনধারায় এই জীবনীশক্তি উদ্ভূত হয়েছে, এবং শত দুর্দৈবের মধ্যেও আত্মপ্রকাশে সমর্থ, সেই আফ্রিকেয় জীবনধারা 'ওয়ে অব' লাইফ' তাহলে তার নিজস্ব পরিমণ্ডলে নিশ্চয়ই এক অভাবনীয় উদ্ভাবনা। আফ্রিকার সেই বিশেষ পরিমণ্ডলে এই কৃষ্ণাঙ্গ মানুষ বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে আপন প্রকৃতির একটি সামঞ্জস্য সাধন করতে পেরেছিল বলেই তার জীবনীশক্তির এই স্বচ্ছন্দ, সবল বিকাশ সম্ভব হয়েছে। এই সামঞ্জস্যেরই স্বাক্ষর বহন করে তাদের আর্ট, বহন করে তাদের ধর্মবোধ, নীতিবোধ, তাদের দেবকাহিনী ও তাদের দেবতত্ত্ব। ইউরোপীয় সভ্যতা ও খ্রীষ্টধর্ম তাঁদের সেই সামঞ্জস্য বিনষ্ট করতেই জানে—তার মূল্য বোঝে না। এ সিদ্ধান্তের সপক্ষে গ্রন্থকার কয়েকজন মানব-বিজ্ঞানের পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরও বিচার ও বক্তব্য উল্লেখ করেছেন। আমরাও সহজভাবে তার প্রমাণ দেখি: মার্কিনমণ্ডলের অমন বাস্তব ও মানসিক নিষ্পেষণের মধ্যেও খেলাধুলায়, কুস্তিতে-কসরতে 'নিগ্রো'দের জোরেই যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বে 'কীর্তি' স্থাপন করে। আর নাচ-গান-বাজনায় তো পৃথিবীতে কৃষ্ণজাতিদের জুড়িই কেউ নেই। কিন্তু কথাটা গভীর দরদ ও বিশ্বাসের সঙ্গে অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় উত্থাপন করেছেন। এবং এই অনস্বীকার্য সত্য থেকে অগ্রসর হয়েছেন 'আফ্রিকেয় মানবস্বরূপের' বা আফ্রিকার সাধনার আবিষ্কারে ও তার তুলনামূলক মূল্যবিচারে।

'ইণ্ডিয়ানিজম' ও 'আফ্রিকানিজম'

শুধু 'আফ্রিকানিজম' নয়, শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বিশ্বমানবের কয়েকটি প্রধান প্রধান সাধন-রূপেও বিশ্বাসী। যথা হেলেনিজম বা গ্রীকসাধনা, হেব্রেইজম বা য়িহুদীসাধনা, সিনিজম বা চীনাসাধনা, আরবিজম বা আরব-ইসলাম, ইণ্ডিয়ানিজম বা ভারতীয়সাধনা আর সর্বশেষে আফ্রিকানিজম বা আফ্রিকেয় সাধনা (তিনি অবশ্য 'সাধনার' বদলে 'যান' শব্দ প্রয়োগ করে থাকেন যেমন ইণ্ডিয়ানিজম বা 'ভারতধর্ম', 'ভারতযান')। যাঁরা গত বৎসর বিশ্ববিদ্যালয়ে সিনেটহলে কমলা লেকচর শুনেছেন তাঁরা অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায়ের 'ইণ্ডিয়ানিজম' সম্বন্ধীয় বিস্তৃত ব্যাখ্যা ও সাধারণভাবে এসব সাধনার আলোচনার সঙ্গে পরিচিত। এ পুস্তকেও সংক্ষেপে অধ্যাপক

চট্টোপাধ্যায় তা উল্লেখ করেছেন—অবশ্য পূর্বেই বলেছেন—যে সমাজের জীবন-দর্শন, বা 'অ্যাটিচুড টু লাইফ'-এর যে বৈশিষ্ট্য তিনি বিশ্লেষণ করেছেন সে সমাজের মধ্যে তার ব্যতিক্রমও কম দেখা যায় না। এবং সেসব বৈশিষ্ট্য তার একচেটিয়া সম্পত্তি নয়। অল্পাধিক সকল মানবগোষ্ঠীরই সেসব গুণ থাকে। তবে কোনো কোনো মানবগোষ্ঠীর জীবনদৃষ্টি কোনো কোনো গুণে যত বিশিষ্ট, অন্যদের তা তত নয়। এজন্যই তা সে জাতির বৈশিষ্ট্য বলে গণ্য —সমাজের 'বৈশিষ্ট্য' বা 'যান' বা 'সাধনা' বলতে এর বেশি কিছু বোঝানো তার ইঙ্গিত নয়। হেলেনিজম, সিনিজম প্রভৃতি সকল 'যানের' বিশ্লেষণ এখানে উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন—আমরা শুধু চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বিশ্লেষিত 'আফ্রিকানিজম' ও 'ইণ্ডিয়ানিজম'-এর কথাই আরও সংক্ষেপিত ভাষায় এখানে উল্লেখ করছি। কারণ, অধ্যাপক মহাশয়ের মতে এ দু যানের মধ্যে একটা মিল দেখা যায়।

'ইণ্ডিয়ানিজম' বা ভারতযানের বৈশিষ্ট্য কি? শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেন (পৃঃ ৩৪-৩৭) প্রথমত অদৃশ্য এক পরম সত্যে বিশ্বাস; দ্বিতীয়ত সেই পরম সত্যই জীবনের চরম কাম্য, পরমার্থ, এই বিশ্বাস; তৃতীয়ত জগৎ দুঃখ-বেদনাময় এই ধারণা; চতুর্থত 'কর্ম' ও 'সংসার' তত্ত্বে বিশ্বাস; পঞ্চমত 'জীবে দয়া' এই বোধ বা 'জীব-শিব' অনুভূতি: চার ধর্ম অহিংসা, মৈত্রী, মুদিতা, উপেক্ষা, নীতিতে আস্থা; ষষ্ঠত ধর্ম ('ঋত') নামক সনাতন নীতিতে আস্থা; সপ্তমত জ্ঞান ও যুক্তিতে শ্রদ্ধা; আর অষ্টমত পরমতবাদ-সহিষ্ণুতা ('যত মত তত পথ')। তর্কের অবকাশ থাকলেও এ সব ধারণায় ভারতবর্ষ মূল্য দেয়, তা মানা যায়।

'আফ্রিকানিজম' বা আফ্রিকেয় যানের বৈশিষ্ট্য কি? অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় বলেন (পৃঃ ৩৮) মূল কয়েকটি বিশ্বাস ও বোধ তাদের মধ্যে পরিব্যাপ্ত; যেমন বিশ্বের চেতনাচেতন তাবৎ চরাচরের মধ্যে এক অদৃশ্য শক্তি বা আত্মা আছেন। দ্বিতীয়ত সেই অদৃশ্য মহাশক্তিই আদিদেব রূপে (ব্রহ্ম?) প্রকাশিত, মানুষের অনুভব-গোচর এবং ক্ষুদ্রতর দেবতার মাধ্যমে কিছু সক্রিয়। তৃতীয়ত, জীবন অবিচ্ছিন্ন বহমান, ক্ষুধা, জীবলোক ও প্রেতলোক বিযুক্ত নয়। চতুর্থত, ব্যষ্টিজীবন অপেক্ষা সমষ্টিজীবনের গুরুত্ব অধিক। পঞ্চমত, জগৎ-জোড়া ছন্দ, বর্ণ, রূপের অনুভূতি এই জাতিদের মধ্যে স্বচ্ছন্দ। পশ্চিম আফ্রিকার মেদে, ওলোফ, মোসি সোঙবই, আকন,

এয়োয়ে, য়োরুবা, এদো, ইগবো প্রভৃতি উপজাতির এবং মধ্য ও দক্ষি আফ্রিকায় বানটুবংশীয় জাতি উপজাতির মধ্যে নৃত্য ও বাদ্যগীতির্তে, পরিচ্ছদে ও ভাস্কর্যে এই অনুভূতির প্রকাশ অপূর্ব।

সত্যই এ সব বৈশিষ্ট্য আফ্রিকানদের মর্মমূলে নিহিত। এ সব নিয়েই আফ্রিকার মানব-স্বরূপ। তবে এই সব মূল বৈশিষ্ট্য ব্যতীত কিছু কিছু লক্ষণ ও তথ্যও ডাক্তার চট্টোপাধ্যায়ের মতে আফ্রিকার ব্যক্তিসত্তার বা মানব-আত্মার ভাবনায় স্থান পেয়েছে। যেমন, আকন (ঘানার) মতে একই মানুষের আত্মার আছে পৃথক পৃথক বহুসত্তা বা এনটিটি। তার দেহভিত্তিক সত্তার নাম 'স্রো', তার ব্যক্তিসত্তার নাম 'ফুনসুম', তার প্রাণশক্তির নাম 'আবুসুয়া', তার দৈবসত্তার নাম 'ক্রা' (প্রাচীন মিশরবাসীরাও ব্যক্তির বহুসত্তার ধারণা পোষণ করতেন, এ কথাটাও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়)। আর একটি লক্ষণীয় আফ্রিকান ধারণা হচ্ছে—প্রাণময়তা বা শক্তিময়তার ধারণা। অচেতন জড় বস্তুও প্রাণময়, এ ধারণারই কদর্য ব্যাখ্যা করে খ্রীষ্টান পাদ্রিরা, নাম দেয় 'ফেটিশিজম'। কিন্তু মূলত এ হচ্ছে প্রাণের সর্বব্যাপকতার ও তাবৎ বস্তুর গতিময়তার ধারণা—পাশ্চাত্ত্য ভাষায় যাকে বলে অ্যানিমিজম বা ডাইনেমিজম, আর তার সঙ্গে প্যানিথিইজম-এর ধারণা।

অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় সত্য কথাই বলেছেন, এ সব ধারণা বা বিশ্বাস হিন্দুর নিকট খুব অপরিচিত ঠেকে না। কারণ, ভারতীয় আদিম ও প্রাথমিক সমাজের ভাবনা-অনুভূতিকে অঙ্গীভূত করেই বহুলাংশে হিন্দু জীবন বিকশিত হয়েছে। এশিয়ায়-আফ্রিকায় সর্বত্রই হয়তো সভ্যতার প্রাথমিক রূপ মূলত একই ধরনের। সেই তুলনা-মূলক বিচারে প্রবেশ করবার পূর্বে আফ্রিকার ধর্মতত্ত্ব ও দেববাদের আরও একটু পরিচয় গ্রহণ করে নিই—'য়োরুবা ধর্ম' ও 'আকন দেবতত্ত্বের' প্রসঙ্গে অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় তা উপস্থাপিত করেছেন।

নাইজেরিয়ার য়োরুবাদের পরমাত্মা 'ওলোরুম্'—আমাদের নির্গুণ পরম ব্রহ্মের সঙ্গে তার তুলনা চলে। শুধু য়োরুবা নয়, আফ্রিকার বহুজাতির মধ্যেই এরূপ ধারণা দেখা যায়, আকনদের অনুরূপ দেবতার নাম 'ওনিয়নকোপোন' জ্ঞানময় অজ্ঞাননাশক পরমেশ্বর। তবে আরও অন্য নামেও 'ওলোরুম'-কে বিবৃত করা হয়—স্রষ্টা বোঝাতে, জীবন-কর্তা বোঝাতে স্বয়ম্ভু, সর্বনিয়ন্তা, প্রভু, ইত্যাদি বোঝাতে। তেমনি 'ওনিয়নকোপনে'র ত্রিবিধ কল্পনা আছে

—মহাশক্তি, সূর্যদেবতা, বিশ্বরূপাত্মা। বারোটি নাম আছে, 'সর্বজ্ঞ', 'শান্তি-স্বরূপ', 'বিশ্বপতি' (ওপাজিন্), 'পরমপিতা' ('নাকা'), ইত্যাদি অর্থে। য়োরুবার পরমেশ্বর 'ওলোরুম্' নির্গুণ নিষ্ক্রিয়। জগৎ-ব্যাপার নিয়মিত করেন ক্ষুদ্রতর দেবতারা, যাঁদের নাম 'ওরিশা'—তার মধ্যে বজ্রদেবতা 'সাংগো' আর দৈববাণীর দেবতা 'ইফা' খুব জনপ্রিয়। 'ওরিশাদের' পূজা হয়। মন্দির আছে, পুরোহিত আছে, গৃহেও পূজাস্থল আছে, পূজাবিধি আছে—এসব অনেক কিছুই আছে। য়োরুবারা আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস করে, জন্মান্তরেও বিশ্বাস করে, 'ওলোরুম'—এই পরম শান্তি। আকনরাও বহু দেববাদী, সেই ক্ষুদ্রতর দেবতাদের সাধারণ নাম 'ওবোসোম'—দেবতারা সবাই যে মঙ্গলদায়ক তাও নয়। এক দেবী পৃথ্বী মাতা বা 'আসাসে আফুয়া'; পরম দেবতার এক প্রকাশ সূর্য, তিনি দ্যৌঃ পিতার অনুরূপ। আরও দেবতা আছেন। তবে য়োরুবাদের মতো বা আমাদের হিন্দুদের মতো আকনরা দেবলোক ও পুরাণ কাহিনী অত সবিস্তারে কল্পনা করতে পারেন নি। কিন্তু পিতৃপুরুষের পূজা তাদের ধর্মের একটা প্রকাণ্ড বড় জিনিস। দেবতাদের পরেই পিতৃপুরুষ, ক্রিয়াকলাপে তাদের শ্রদ্ধা দেখানো হয়—খ্রীষ্টান হলেও সে ধারণা কেউ বড় ত্যাগ করে না। এই ধারণার জন্য তাদের সমাজের আত্মীয়বন্ধন সুস্থির, সমাজ-চেতনা সুদৃঢ়। কিন্তু প্রধান কথা হচ্ছে এক পরম সত্যের ধারণায় এসব কৃষ্ণ জাতির ধর্মজীবন সুগঠিত—সে সত্যকেই চেতনাচেতনে নানারূপে, নানা নামে এ সব জাতি উপলব্ধি করে। তাতে তাদের যে জীবন বিধৃত সে জীবনে সহজ আনন্দ আছে, শ্রী আছে, ব্যক্তি অপেক্ষাও সামাজিক কল্যাণবোধ তাতে স্বভাবগত, নীতিবোধ সুস্থ। সভ্যতার নানা কৃত্রিমতা অপেক্ষা স্বাভাবিক সততা তাদের মজ্জাগত—ভাবনার জটিলতা অপেক্ষা জীবনানন্দ স্বতঃস্ফূর্ত।

শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এসব কারণে আফ্রিকানদের ধারণার সঙ্গে ভারতীয় ভাবনার একটা মিল দেখছেন, আর তাঁদের শিল্প-বোধ, জীবন-বোধ ও এই বিশিষ্ট বিশ্ব-রহস্যবোধের জন্য বিবেচনা করেন—ইতিহাসে তাঁদের দেবার মতো বিশিষ্ট দান আছে। অবশ্য তিনি ভুলে যান নি যে, অনেক নিষ্ঠুর ও অচল প্রথা-অনুষ্ঠান কৃষ্ণ আফ্রিকান জাতিদের মধ্যে ছিল ও আছে, তা ত্যাগ করতে হবে। যুগ-সভ্যতার নিয়মেই তাদের প্রয়োজন হবে অনেক বর্জন, আর অনেক গ্রহণ এবং একদিক খ্রীষ্টধর্ম একদিকে মুসলমান ধর্ম প্রভৃতি যা এসেছে তাকে আফ্রিকার মতো করে 'স্বজাতীয়' করে নিতে হবে, অন্য

দিকে নিজস্ব জীবন-ধারা ও ভাবনা-ধারাতেও আনতে হবে যুক্তি-শোধন নবরূপায়ণ (পৃঃ ৫৯)। অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় আফ্রিকার 'জাগরণের দি বিকাশের জন্য চান বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে আফ্রিকেয় সাধনার পোষণ আয়োজ আফ্রিকার সমাজ-চেতনা ও সমাজ-গঠনের যথোচিত পুষ্টি; তাদের শি চেতনার পরিপোষণ ইত্যাদি। গ্রন্থের বহুস্থলে বারে বারে যা তিনি বলেছে তাতে মনে হয়—তিনি শুধু আফ্রিকার শিল্প, আফ্রিকার এই জীবনধারা ভাবনাধারারই মহত্ত্ব অনুভব করেন না, বিশেষ করে অনুভব করেন আর বড় সত্য—মানুষের মহিমা। সে মহিমাবোধ তাঁকে প্রত্যেক জাতির প্রতি শ্রদ্ধাবান করে, তার দানকে স্বীকার করতে প্রবুদ্ধ করে। আর, মনস্বী লেখকের সৌন্দর্য-বোধ, কল্যাণ-বোধ এক রহস্যময় বিশ্বানুভূতির সঙ্গে মিলি হয়ে তাঁর উদার মানবিকতাও করেছে অধ্যাত্ম রহস্যে অভিষিক্ত।

রূপান্তরের অনিবার্যতা

এইখানেই পাঠকের প্রশ্ন থেকে যায়—মানবিকতাকে যাঁরা মূলতঃ ঐহি মানবিকতা বলেই জানেন, তাঁরা সে হিসাবেই মানেন মানবিকতার অধ্যা মূল্য। যদিও অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি কিছুমাত্র খর্ব করতে স্বীকৃত নন, কিন্তু কালচার বা সংস্কৃতির আলোচনা ক্ষেত্রে বাস্তব উপাদান অপেক্ষা ভাবময় উপাদান সমূহকেই তিনি প্রাধান্য দেন। এ গ্রন্থেও প্রধান আলোচ্য—বাস্তব 'ওয়ে অব লাইফ্', জীবনধারা ততটা নয় যতটা 'ওয়ে অব থট্'—কৃষ্ণ-আফ্রিকার ধর্ম-ভাবনা, দেব-ভাবনা। সকল তথ্যকেই তত্ত্বাকারে (জেনারেলিজেশন) গ্রথিত করতে গেলে কিছুটা তর্কের অবকাশ থেকে যায়। বিশেষ করে 'ওয়ে অব থট্' নিয়ে তত্ত্ব (ইজম্) রচনাকালে তা আরও বাড়বার সম্ভাবনা। যেমন 'ভারতধর্ম' বা 'ইণ্ডিয়ানিজম্'-এর যে বৈশিষ্ট্যসমূহ তিনি উল্লেখ করেছেন, তার একটিও মিথ্যা নয়, কিন্তু তাদের আপেক্ষিক গুরুত্ব ও বাস্তব কার্যকারিতা তর্কাতীত নয়। তারপর যতটা গুরুত্ব ভারতীয় বা আফ্রিকেয় এই 'ওয়ে অব থট্'-এর উপর তিনি আরোপ করছেন তা কি সত্যই তত গুরুতর? 'ওয়ে অব লাইফ' বা জীবন-ধারার সঙ্গেই ভাবনা-জড়িত। আফ্রিকেয় জীবনধারা দীর্ঘকাল এক পরিবেশে অব্যাহত ছিল। কাজেই, সেই প্রাথমিক জীবন-ধারা ও সেই প্রাথমিক ভাবনা-ধারা একটা সুস্থ পরিণতিও সেখানে লাভ করেছে। তাই আফ্রিকানরা দেহমনে এত

সুস্থ ও প্রাণবন্ত। কিন্তু সে জীবনধারা এখন পরিবর্তনের মুখে। পরিবর্তন বলাও ঠিক নয়। কৃষ্ণ-আফ্রিকায় রূপান্তর আসন্ন—আধুনিক যন্ত্রশিল্পের প্রবর্তনে ভারতবর্ষের, চীনের যে পরিবর্তন তার চেয়েও অনেক বড় হবে এই আফ্রিকার পরিবর্তন। আফ্রিকার সভ্যতার প্রাথমিক যুগের অবসান আবশ্যক—প্রাথমিক জীবন-ধারা—ট্রাইবল জীবন, বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠী-জীবনও ভেঙে যাওয়া অনিবার্য,—কী হবে তার নব কলেবর তা বলা সম্ভব না হলেও অনুমান করা যায় তা আধুনিক সভ্য-মানুষের অনুরূপ জীবন-যাত্রাই হবে। আর, ভাবনা-ধারাও সেই সঙ্গে যথাসম্ভব আধুনিকই হবে—যদিও পুরাতনের অনেক জিনিসই হয়তো বাঞ্ছনীয় এবং কিছু কিছু পুরাতনের জেরও আধুনিক জীবনযাত্রা ও ভাবনার তলে থাকবে। কিন্তু সেই old gods will die natural death—পুনরাবির্ভাব হতে পারে মানবীয় values রূপে।

ভাবী রূপান্তরের প্রয়োজন মনে রেখেই তাই জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে কোন্ আধুনিক ধর্ম বা বৈশিষ্ট্য কৃষ্ণ আফ্রিকেয় জাতিদেরও এ সমস্যায় অবশ্য গ্রাহ্য?—মানুষের আত্মশক্তিতে আস্থা, আধুনিক মানবিকতা। আর কোন্ "old god" বা আফ্রিকেয় ধর্ম ভাবীকালেও সংরক্ষণীয়? আফ্রিকার এনিমিজম নয়, ডাইনামিজম নয়, বহুদেববাদও নয়, এমনকি অতিপ্রাকৃত ব্রহ্মবাদও ততটা অপরিহার্য নয়।—একটি আফ্রিকার জীবনানন্দ, শিল্প নৃত্যবাদ্যে ছন্দের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশের স্বাভাবিক প্রবণতা। দ্বিতীয়টি—কৃষ্ণ আফ্রিকেয় জীবন-ধারায় সমাজ-চেতনার প্রাধান্য। যন্ত্র-শিল্প অনেক স্বচ্ছন্দ জাতির প্রাণৈশ্বর্য নষ্ট করেছে, আগামী কারুবিপ্লব তা পুনঃস্থাপন করতে পারবে কিনা জানি না, মানব-প্রকৃতি ও বিশ্বপ্রকৃতির সম্পর্ককে স্বচ্ছন্দ করে তুলে মানুষকে নতুন করে in tune with the Infinite হতে না দিলে তা সম্ভব নয়। মানুষের ইতিহাসে আফ্রিকেয় সভ্যতার সেই দান যদি রক্ষা পায় তবে তাই হবে আফ্রিকার মহৎ দান। এই প্রকৃতির সন্তানরা বিশ্ব-প্রকৃতি ও মানব-প্রকৃতির স্বচ্ছন্দ মিলনের ফলে এক সুস্থ প্রাণময় লীলা-রসের অধিকারী হয়েছিল—এই সত্যই ঘানার কবি মিসেস সাদারল্যাণ্ড সগর্বে বলেছেন—আমরা বড় শহর, সৌধাদি গড়ি নি, "we are living our life।" তা-ই আফ্রিকেয় কালচার—তা-ই আফ্রিকার মর্মবাণী,—অন্য বৈশিষ্ট্যের মূল্য সে তুলনায় গৌণ। এই স্বাস্থ্য, সততা ও প্রাণৈশ্বর্য যদি আধুনিক সভ্যতায় বিনষ্ট না হয়, তাহলে আধুনিক সভ্যতাও ধন্য হবে, সফলতর হবে।

আফ্রিকার জীবনাগ্রহ

এই প্রসঙ্গেই সুবিচার করা যেতে পারে—আফ্রিকের সাধনার সঙ্গে আমাদে ভারতধর্মের যে মিলের কথাটা। সে মিল মুখ্যত এই যে আমরাও প্রাথমি সভ্যতার 'পেগান'-সুলভ ধর্মকে একেবারে ত্যাগ করি নি। তাই ধর্মবো দেবতত্ত্বে কিছু না কিছু সমতুল্যতাও আফ্রিকার ও ভারতীয় সাধনার আছে কিন্তু ভারতবর্ষের যে দুঃখবাদের কথা অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায়ও উল্লেখ করেছে —যা তার প্রায় মজ্জাগত, জীবন সম্বন্ধে উপনিষদের সময় থেকে যে অনী (বৈরাগ্য বা সন্ন্যাস) ভারতীয় চিন্তায় পরিব্যাপ্ত—আফ্রিকানদের জীবনান জীবনাগ্রহ প্রভৃতির সঙ্গে তার মিল কোথায়? এ কথা তো মিথ্যা নয়— জীবনে অনীহাই অনেকাংশে ভারতীয়কে অধ্যাত্মবাদের, বিশ্বাতীত পরমা তত্ত্বের দিকে ঠেলে নিয়ে গিয়েছে—জীবনবিমুখ করে ছেড়েছে।

অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় অবশ্য সেরূপ পুরুষার্থহীন, অধ্যাত্মবাদের মোটে অনুরাগী নন। কিন্তু অধ্যাত্মবোধের যে ভিত্তি তিনি গ্রহণ করেছেন—পরমা বোধ, 'এ সেন্স অব্ আলটিমেট রিয়ালিটি বিয়ণ্ড দি ওয়ার্লড'—তা প্রথম মনে হয় বিপজ্জনক এক চোরাবালির সমুদ্রসৈকত, দ্বিতীয়ত তাঁর অভী এ কালের মানুষের মানবিকতার বিকাশে এই পারমার্থিকতা অনাবশ্যকও নিশ্চয়ই মানবিকতার বিকাশে মানুষের হৃদয়-মন ও আত্মার সম্যক্ স্ফূর্তি প্রয়োজন, কল্পনার ও অনুভূতির সুস্থ পরিপোষণ আবশ্যক, শুধু 'রুটি আর সার্কাসে' সভ্যতার অপমৃত্যু অনিবার্য; বাস্তববাদীও তা মানবেন। কিন্তু বাস্তব-বাদীরা বলবেন, বিজ্ঞানের চর্চায় মানবাত্মার বিকাশের অফুরন্ত অবকাশ আছে; আর বিশ্ব-প্রকৃতি ও মানব-প্রকৃতির এই ঐহিক লীলা-বাসরে রহস্যানুভূতির অবকাশও সামান্য নয়। শিল্পকলা, সৌন্দর্য-চর্চা কল্পনার সেই প্রকাশপথ রচনা করে, আত্মাকে জীবন-রসের মধ্যেই সেই স্বচ্ছন্দ ও মানবীয় অধ্যাত্মরসের সন্ধান দেবে। আর সেদিকেই যে কৃষ্ণ আফ্রিকান্‌রা পৃথিবীর সভ্যতার পৌরোহিত্য করবেন না, এমন কথা কে আজ বলতে পারে? অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায়ের বিশ্বাসভরা উক্তিই তো সে বিষয়ে আমাদের আশ্বাসিত করে। একাধিকবার (পৃঃ ৬,১৩) তিনি মনে করিয়ে দিয়েছেন—দু হাজার-আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে গ্রীসে বা রোমে কে জানত যে মধ্য ও উত্তর ইউরোপের তখনকার বন্য অসভ্যজাতিরাই হবে বিংশ শতকে সভ্যতার মহত্তম সাধনার অগ্রদূত? কে বলবে কৃষ্ণ আফ্রিকার অজ্ঞাত-কুল-শীল মানুষেরা পাঁচ শত

বৎসর পরে আগামী দিনে তেমনি হবে না সভ্যতায় অগ্রগণ্য কৃষ্টি-সরস নতুন অধ্যাত্ম-সম্পদের ধারক, নতুন জীবন-বেদের উদ্গাতা? অরণ্য সবে কথা কইতে শুরু করেছে; সভ্যতা তার মর্মবাণীর প্রতীক্ষায় অপেক্ষমাণ।

অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায়ের মন আফ্রিকার মহৎ সম্ভাবনায় আস্থাবান। আফ্রিকার কাছে তাঁর অনেক আশা। আফ্রিকার প্রতি তাঁর অনেক ভালোবাসা—দুই কারণে—আফ্রিকার শিল্পকলা, আফ্রিকার সুস্থ মানসিকতা। আরও বড় কারণও আছে—এ গ্রন্থের পাঠকমাত্রই তা অনুভব করবেন গভীর সুপ্রশস্ত মানবিক মমতাই অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায়ের মূল প্রেরণা—যে মানবিকতা রবীন্দ্রনাথের শিক্ষায় সম্ভবত আরও সমৃদ্ধতর হয়েছে। এ গ্রন্থও 'আফ্রিকা' কবিতার ইংরেজী অনুবাদ শুদ্ধ রবীন্দ্রনাথের নামেই উৎসর্গীকৃত।

'আফ্রিকা বর্বের' এটি যোগ্য উপহার ভারতীয় মনস্বীর—মহাকবির উদ্দেশ্যেও যোগ্য নিবেদন। কিন্তু শুধু ইংরেজীতেই কি আমাদের এ উপহার নিবদ্ধ থাকবে? বাঙালীর মধ্যে এদিকে এরূপ জিজ্ঞাসা ও অভিজ্ঞতা আর কারও আছে কিনা সন্দেহ। এমনি সশ্রদ্ধ চিত্তে, এমনি মানবিক দৃষ্টি নিয়ে, এমনি মমতা নিয়ে আর কেউ কৃষ্ণ আফ্রিকার সম্বন্ধে লিখতে পারবেন কিনা জানি না। কৃষ্ণ আফ্রিকার ভৌগোলিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক পশ্চাৎপটকে আরও একটু বাঙালী পাঠকের পক্ষে বিশদ করে—অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বাঙলা ভাষায় আফ্রিকার মানবস্বরূপকে ব্যাখ্যা করবেন—এই দাবি আমরা করতে পারি। আশা করব, ভ্রমণাংশের কথাও তাতে আরও একটু বিশদ করে, উপাদেয় করে তখন পরিবেশন করবেন। কারণ, বাঙলা ভাষায় পশ্চিম আফ্রিকার কথা কে পড়তে পায়?—কেনিয়া, টাঙ্গানিয়াকা, দক্ষিণ-আফ্রিকা সম্বন্ধেই বা কয়জনা লেখেন? তারপর, 'ফু-ফু' বা 'পাম-ওলিভ চপই' যে শুধু উপাদেয় বস্তু তা নয়। লাগোস-এর সেই গ্বাদামোসির মতো মানুষদের কথাও কি কম সরস?—গ্বাদামোসি নিজে মুসলমান, কিন্তু তিনি উদার মুসলমান। তাঁর ছোট ভাই ও ভ্রাতৃবধূ খ্রীষ্টান। কিন্তু শ্রীযুক্ত গ্বাদামোসি নিজের রিফ্রেজেরাটারে তাঁদের শুকর মাংস রাখতে অনুমতি দিয়েছেন। অবশ্য একটা শর্তে—তাঁদের ছেলেমেয়েরা সবাই মুসলমান ধর্মানুযায়ীই মানুষ হবে। এরূপ নানা ঘটনা ও নানা মানুষের সরস বা গম্ভীর পরিচয় থেকেও যেন বাঙালী পাঠককে শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বঞ্চিত না করেন।

খোলাচোখে মহাচীন

শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ

১৯৫৭ সাল, সেপ্টেম্বর মাসের কথা। রাজধানী পিকিন্ শহরে বহু জনসমা
হয়েছিল ১লা অক্টোবর মুক্তিউৎসবের প্রাক্কালে। তার মধ্যে হেমাঙ্গ
ছিলেন। আলাপ করে জানলাম যে তিনি ইতিমধ্যে ছয়মাস সময় সে-দে
গ্রামাঞ্চলে ঘুরে, দোভাষীর সাহায্য পরিহার করে, জনসাধারণের
নিবিড়ভাবে মিশে কিছুটা ভাষা আয়ত্ত করে ফেলেছেন। উৎসাহে
উত্তেজনায় উদ্দীপ্ত দেখলাম তাঁকে। সকল কথা স্মরণ নেই, কি
মোটামুটি বলেছিলেন যে বিশ্বমানবের ইতিহাসে এমন প্রচণ্ড গুরুত
সামাজিক বিপ্লব এত দ্রুত ও শান্তিপূর্ণভাবে কখনও সংঘটিত হয় নি
তিনি যেন এক বিপুল ও অভূতপূর্ব গণঅভ্যুত্থানের তীর্থসঙ্গমে উপস্থিত
শারীরিক অসুস্থতাও ভুলে রয়েছেন। মাও-সে-তুং-এর প্রশংসায় শত
হয়েছিলেন। কথাগুলির তাৎপর্য অবশ্য ইতিপূর্বেই অনুভব করেছিল
কিন্তু অনতিপরে যখন সাত লক্ষ চল্লিশ হাজার কৃষিসমবায় ছা
হাজার কমিউনে পরিণত হয়ে গণসংগঠনগুলিকে প্রবলভাবে শক্তিমন্ত ক
তুলল তখন আমরা স্বদেশে ফিরে এসেছি। হেমাঙ্গবাবু আরও দু ব
সে-দেশে এই বিরাট সংস্থাগুলির সম্প্রসারণ ও সাফল্য দেখে আস
সুযোগ পেয়েছেন। ততদিনে ভাষা রপ্ত হয়ে গিয়েছিল তাঁর ভালো করে এ
যদৃচ্ছা ঘুরে বেড়িয়েছেন।

আলোচ্য পুস্তিকাটির * মুখবন্ধে তিনি বলেছেন যে, দেশে ফিরে তাঁ
অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করছিলেন গ্রন্থাকারে প্রকাশের উদ্দেশে, কিন্তু মধ্য
সে কাজ স্থগিত রেখে তিনজন অপবাদকের মিথ্যা ভাষণের প্রতি
করতে হল। অপপ্রচারকত্রয়ের মিথ্যাপ্রচারকে গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়ো
হল যেহেতু গণকমিউনের দ্রুত প্রসারে বহু সমাজতন্ত্রে আস্থাবান ব্যক্তি

* Witnessing China with Eyes: Hemanga Biswas. Nati
Book Agency (P.) Ltd. Calcutta. 12. 0·75 nP.

আশঙ্কিত হয়ে ভেবেছেন হয়তো বা বাস্তবিকই সে-দেশে পারিবারিক জীবন বিপর্যস্ত, শ্রমগ্রহণে বুঝিবা বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে।

হেমাঙ্গবাবুর কৃতিত্ব যে তিনি সরল সুন্দর ঝরঝরে ইংরেজী ভাষায় সংক্ষেপে একই সঙ্গে অপপ্রচার খণ্ডন ও গণকমিউনের প্রকৃত পরিচয় দিতে সমর্থ হয়েছেন। ভাষার জন্য তিনি ঋণ স্বীকার করেছেন বন্ধুবর শৈলেশ সেনগুপ্তর কাছে কিন্তু রচনার প্রতিটি ছত্রে অনুভূত হয় অন্তরের আবেগ এবং সেইজন্যই কথনভঙ্গি এতখানি হৃদয়গ্রাহী হয়েছে। উৎপাদনবৃদ্ধির অঙ্ক, শিক্ষাবিস্তারের বর্ণনা ইত্যাদি সংবাদের উল্লেখ পর্যন্ত না করে তিনি ভালোই করেছেন। জোর দেওয়া হয়েছে মানবীয় সত্তাগুলির ওপর। বলা হয়েছে যে কোনো কোনো সময় উৎসাহের আতিশয্যে ভুল-ত্রুটি ঘটে যায় কিন্তু মানুষের মন যেখানে মুক্ত, কর্মপ্রেরণা যেখানে বাধাশূন্য, সংকল্প যেখানে বৈজ্ঞানিক প্রথায় সুনিয়ন্ত্রিত সেখানে সকল কিছু স্বতঃই সংশোধিত হয়ে যায়।

পুস্তিকাটির একটি পরিচ্ছেদে কমিউন গঠনের পূর্বেকার "আত্মজিজ্ঞাসা (রেকটিফিকেশন্) অভিযান" সম্বন্ধে একটি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ জবাবদিহি দেওয়া হয়েছে কিন্তু তাতে রচনা ভারাক্রান্ত হয় নি।

বিশেষভাবে মনোজ্ঞ হয়েছে শ্রমদানের জলন্ত উদাহরণ, সঙ্কল্পবাণীর বর্ণনা ও লোকসঙ্গীত থেকে কয়েক ছত্রের অনুবাদ।

সহস্র সহস্র বছরের অবদমিত, অনাহার-ক্লিষ্ট, নিরক্ষর মানুষ আকাশে মাথা তুলে গিরিশিখরকে আদেশ করছে, নত হয়ে তার চলার পথ অবারিত করতে। প্রাচীরপত্রে ঘোষিত হচ্ছে, "পর্বত উৎপাটিত করে সমুদ্রগহ্বর ভরাট কর।" এ উক্তিগুলি অনর্থক দম্ভের নয়, গণশক্তিতে প্রতীতি প্রকাশ সঙ্কল্পের বাণীতে। গ্রাম্য কবি আজ গাইছে: সে এতদিন যে গান গেয়েছে পর্বতশিখরে বসে তার সবটুকু গেছে বাতাসে উড়ে, সে আজীবন যে সঙ্গীত করেছে নদীতীরে, ভেসে গেছে তা জলের স্রোতে, কিন্তু আজকের গান তার প্রতিটি হৃদয়ে ধ্বনিত হচ্ছে।

পুস্তিকাটির বহুল প্রচার কামনা করি।

স্পেনের অগ্নিক্ষরা দিনগুলি

কৃষ্ণ ধর

স্পেনের ফ্যাসি-বিরোধী সংগ্রামের স্মৃতি আমার কাছে এক দুর্লভ সম্প… সে স্মৃতি নিজের অভিজ্ঞতার নয়, তবু তা একান্তভাবেই অভিজ্ঞতার … উজ্জ্বল চেতনায় সংযুক্ত। কলকাতায় থেকে মাদ্রিদের স্বপ্ন দেখে… স্পেনের শহরে, অরণ্যে জলপাইপাতার অন্তরালে সেই দৃঢ়চেতা মানুষগুলো… সঙ্গে ভ্রাতৃত্বের অবিচ্ছেদ্য বন্ধন অনুভব করেছি। ফ্যাসিস্ত ডিক্টেটর ফ্রা… স্পেনের গণতন্ত্রকে হত্যা করে জয়ী হল। স্পেনের মানুষের সেই পরা… বিষণ্ণ হয়েছি। কিন্তু সেই অপরিসীম বীর্যের কথা ভুলি নি। স্পেন আমা… ভবিষ্যতের জন্য যুদ্ধ করেছিল, শুধু স্পেনের জন্য নয়। স্পেনের মানুষের … দোষ ছিল? তারা চেয়েছিলেন শান্তি ও গণতন্ত্র, নিজেদের জন্য মুক্ত ও স্ব… জীবন, আগামীকালের জন্যও। সেই অপরাধে রক্তের স্রোতে, চোখের … স্নাত হয়েছে মাদ্রিদ, ভেসেছে বার্সিলোনা, কিন্তু তাঁরা পারেন নি। ডিক্টে… ফ্রাঙ্কো দুর্মদ শক্তি নিয়ে মুসোলিনীর ইতালী, আর হিটলারের জার্মানি… সহযোগিতায় হত্যা করল স্পেনের গণতন্ত্র। স্পেনের রিপাব্লিকের পতন… ফাসিস্ত ফ্রাঙ্কো-বাহিনীর ক্ষমতা দখলে ইউরোপের ইতিহাসে ফ্যাসিবাদে… যুদ্ধাভিযানকে উৎসাহিত করল।

দুই দশকেরও বেশি, স্পেনের দরজা গণতান্ত্রিক মানুষের কাছে 'বন্ধ… সেখানে নতুন পৃথিবীর কোনো কথা গিয়ে আর পৌছয় না। এ… সবচেয়ে আশ্চর্য, ফ্যাসিস্ত ফ্রাঙ্কো এখনও দণ্ডমুণ্ডের অধীশ্বর, স্পেনের গণতন্ত্রে… জল্লাদ। এই গণতন্ত্রকে বাঁচাবার জন্য পৃথিবীর সকল দেশের স্বাধীনতাকা… মানুষ চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ঠিক আগের কয়টি বছ… গণতন্ত্রের শ্মশানবন্ধুদের সেই উন্মত্ত নৃত্য, স্পেনের মাটিতে রক্তের দাগে… অশ্রুমাখা ইতিহাস এখনও মুছে যায় নি।

Men In Battle: Alva Bessie. Seven Seas Publishers, Berl… (Distributors: National Book Agency Private Ltd. Calcutta-12.) Rs. …

আলভা বেসি, ব্রুকলিনের মার্কিন নাগরিক, আব্রাহাম লিঙ্কন ব্রিগেডের স্বেচ্ছাসেনা; সুদূর আমেরিকা থেকে আদর্শের তাগিদে ছুটে গিয়েছিলেন স্পেনের রক্তাক্ত প্রান্তরে, মুরদের দেশে, ফ্যাসিজমের হাত থেকে গণতন্ত্রকে মুক্ত করবার অক্লান্ত বাসনায়, ইণ্টারন্যাশনাল ব্রিগেডের হয়ে যুদ্ধ করবার জন্য। আজকের রুদ্ধকণ্ঠ স্পেন কারাগারের অন্তরালে, ফ্রাঙ্কোর বেয়নেটের ধারালো ডগার ঝলকানির আসরে সেই অবিস্মরণীয় দিনগুলিকে স্মরণ করে। নন-ইণ্টারভেনশনের ছদ্মবেশের আড়ালে ফ্রাঙ্কোর দস্যুদলকে পরোক্ষ সহায়তা করেছিল ইয়রো-মার্কিন শক্তির দল। সেই নিদারুণ সংকটের দিনে যৌবনের পতাকা উড়িয়ে, মুক্ত মানুষের জয়গানে স্পেনের আকাশ বাতাস মুখরিত করে উপস্থিত হয়েছিল ইণ্টারন্যাশনাল ব্রিগেড। নাৎসী শক্তিতে বলীয়ান ফ্রাঙ্কোর ফ্যাসিস্ত বাহিনীর মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়াল ব্রিটিশ, মার্কিন, ফরাসী, চীনা, জার্মান ও পোলিশ তরুণের দল। এদের কেউ শিল্পী, কেউ সাহিত্যিক, কেউ বা সদ্য কলেজে-পড়া আদর্শবাদী যুবক। সকলেই কাঁধে নিল বন্দুক। গণতন্ত্রের জন্য মহা আহবে প্রাণ দিতে। যুদ্ধের শিক্ষাও নেই সকলের; সেনাবাহিনীর প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র, রসদের যোগান দেবার মতো ক্ষমতাও তখন ছিল না রিপাব্লিকান সরকারের। তবু প্রাণের অদম্য ইচ্ছা-শক্তিতে, শান্তি ও গণতন্ত্রের পবিত্র সংগ্রামে, স্পেনের মুক্তিকামী মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে, ইণ্টারন্যাশনাল ব্রিগেড উচ্চকণ্ঠে হাঁক দিল:

Hold, Madrid, for we are coming,
I. B. men be strong……
Side-by-side, we'll battle on-ward,
vic-tory will come!

সেই অবিনশ্বর সংগীতের ডায়েরি 'মেন ইন ব্যাটল্'। এই ডায়েরির পাতায় পাতায় এক দুঃস্বপ্নের ইতিকথা মর্মরিত। এর অন্তরালে লুকিয়ে আছে অনেক আশা ও আকাঙ্ক্ষা। যা সেদিন পূর্ণ হয় নি। তবু একদিন তারা কথা বলবে: এই মৌন আকাঙ্ক্ষাগুলো মুখর হয়ে উঠবে যেদিন মুসোলিনি ও হিটলারের মতো মুছে যাবে ফ্রাঙ্কো, মাদ্রিদে আবার মুক্ত মানুষের জয়গান হবে উচ্চারিত।

আলভা বেসি-র বর্ণনায় একটি আদর্শবাদী সৈনিকের স্মৃতিচিত্রণের অন্তরঙ্গরূপ বিশ্বাসে ও প্রেরণায় উজ্জ্বলতর হয়ে ফুটে উঠেছে। এক গভীর

সংকটে, মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও ইণ্টারন্যাশনাল ব্রিগেড স্পেনের মানুষ সাহস দিয়েছিল, হেসে, গান গেয়ে প্রাণের অফুরন্ত যৌবন-প্রেরণার স্বগ বিশ্বাসে। সে কষ্টের তুলনা নেই। ইণ্টারন্যাশনাল ব্রিগেড স্পেনের মানুষ কাছে তখন একটি প্রতীক, পৃথিবীর গণতান্ত্রিক মানুষের ঐক্যবদ্ধ সংকল্প একটি সিম্বল। পুরনো ভাঙাচোরা ট্রেনে, দশজনের জায়গায় কুড়িজন এক একটি কামরায় গাদাগাদি করে বসে, চাঁদের আলোতে গান গেয়ে জলপাইয়ের অরণ্যের ভিতর দিয়ে তারা এগিয়ে গেল ফ্রণ্টের দিকে। মাদ্রি আর কতদূর! গীর্জায় গীর্জায় স্পেনের মানুষ প্রার্থনা করত, প্রতি স্টেশনে এসে জানাত বন্ধুত্বের সম্ভাষণ: দরিদ্র, ক্ষুধার্ত গ্রাম্য শিশুরা এসে ভি চাইত এক টুকরো রুটি, এক টুকরো সিগারেট :

Un poco de pan, Camarada ? Tienes pan ? Tiene tabaco por mi padre ?

এর পরিবর্তে তারা দিত কমলালেবু, বড় টসটসে পাকা কমলালে সৈনিকরা তাদের ওপর রুটি আর সিগারেট বৃষ্টি করত। সেই বিষণ্ণ, ক্ষুধা শিশু আর নারীদের দেখে সৈনিকরা উচ্চকণ্ঠে গেয়ে উঠত :

Arise, ye prisoners of starvation !

স্টেশনে সমবেত জনতা মুষ্টিবদ্ধ হাত উঁচু করে সুরে সুর মেলাত, জাগো অনশন-বন্দী যত, জগতের নিপীড়িত ভাগ্যহত। ট্রেন ছাড়ে। যতক্ষণ পর্য দেখা যায়, আন্তর্জাতিক সর্বহারাদের সেই গান, ফ্যাসিস্ত ফ্রাঙ্কোর মনে আত স্বষ্টি করে, মুখর করে রাখত প্রতিটি স্টেশন। আলভা বেসি সেই মেঘে-ঢাকা আকাশের দিনগুলোর কথা লিখেছেন, যখন উজ্জল সূর্যকরের জন্তে মানুষে প্রার্থনার অন্ত ছিল না। তিনি নিজের প্রেরণার সততায় সেই বিগতদিনে অনুভূতি উত্তরকালে আমাদের জন্য গচ্ছিত রেখেছিলেন। হতাশা কোনোদিন তাঁরা হতোদ্যম হন নি, গভীর দুঃখে হন নি বিচলিত। মৃত্যু এই মানুষগুলির ইতিহাস পড়ে কতবার চকিত হয়েছি, কত বিনিদ্র রাত্রি ভেবেছি, কলকাতা থেকে মাদ্রিদের দূরত্ব কি দুরতিক্রম্য! আলভা বেসি এই উত্তপ্ত হৃদয়ের বর্ণনা আমার সেই প্রশ্নের উত্তর এনে দিয়েছে। কী ক ভুলি স্পেনের নির্মম তুষার বিছনো প্রান্তরে সেদিন ঘুম পাড়িয়ে এসে কডওয়েলকে, রালফ ফক্সকে, জন কর্নফোর্ডকে। ফ্যাসিস্ত ফ্রাঙ্কোর ঘাত হরণ করে নিয়েছে গ্রাৎসিয়া লরকার অমূল্য জীবন। সেই জ্বালা, আমা

কাছে, আত্মীয়বিয়োগের জালার থেকেও অধিক। আমার চেতনায় হয়তো আজীবন তার উত্তপ্ত উপস্থিতি চিরস্থায়ী আসন নিল। প্রাণচঞ্চল যৌবনের উত্তাপে, আদর্শের উজ্জল প্রেরণায় লিঙ্কন ব্রিগেডের প্রতিটি স্বেচ্ছাসৈনিক সেদিন স্পেনের অপরিচিত প্রান্তরে স্পেনের মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল, রক্ত দিয়ে রুখল ফ্যাসিজমের বিরাট দানবকে। কারণ তারা জানত ফ্যাসিজম থেকে পশ্চাৎপসরণ অসম্ভব। আরভিং বলেছিলেন : Comrades, don't you realise that it's impossible to retreat from Fascism ?

অনেকেই প্রাণ দিলেন, কিন্তু পশ্চাৎপসরণ করেন নি কেউ। ছাউনিতে বসে এরাই গীটার বাজিয়ে কখনও গেয়েছেন :

Give me a home, where the buf-falo roam,
Where the deer and the ant-elope play,
Where sel-dom is heard, a dis-couraging word,
And the skies are not cloudy all day.

এই স্বস্তি, শান্তি ও সুখ, এদের একার কামনা নয়, পৃথিবীর অগণিত মানুষের। আলভা বেসি তাই বলেছেন :

During that struggle we partisans of the Republic said that if Spain was lost there would be a second world war. Since World War II ended we have been saying that if Spain remains fascist, the danger of third is always imminent.

আজ আবার আমারা এই নির্মম সত্যের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছি। 'মেন ইন ব্যাটল' সেই সত্যের মুখাবরণ উন্মোচিত করেছে। এই গ্রন্থ ইতিহাস থেকে ভবিষ্যতের দিকে জলন্ত অঙ্গুলি নির্দেশ।

মাকিন দেবদূত

প্রছোৎ গুহ

'দি আগলি আমেরিকান'* উপন্যাস নয়। জ্যাকেটে ফিকশন বলে পরি দেওয়া সত্ত্বেও উপন্যাসের কোনো উপাদানই নেই বইটিতে—না কো পরিণতিশীল কাহিনী, না চরিত্রের বিকাশ, না মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ। তবে ফিক উপন্যাসের প্রতিশব্দ নয়। যে কোনো কাল্পনিক কাহিনীই ফিকশ সেদিক থেকে 'আগলি আমেরিকান'কে ফিকশন বলে আখ্যাত ক অসঙ্গত নয় (যদিও হয়তো তাতে প্রকাশকের পাটোয়ারী বুদ্ধিই প্রকটি হবে), কেননা, বইটির ঘটনাস্থল কাল্পনিক রাজ্য সরথান এবং পাত্রপা কল্পলোকের অধিবাসী।

কিন্তু 'আগলি আমেরিকান' উপন্যাস হোক চাই না হোক, উপভোগ্য যে তাতে সন্দেহ নেই। লেখকদ্বয়ের লিপিকুশলতার গুণে বইটি এক নিঃশ্বা পড়ে ফেলা যায় আর পড়ে ফেলে আপসোসের কারণ ঘটে না। মান চরিত্রের কোনো নতুন দিকের উপর আলো না ফেলুক বইটি মাকি পররাষ্ট্রনীতির, বিশেষ করে দূরপ্রাচ্যনীতির অনেক অন্ধকার অলিগ আলোকিত করে তোলে।

গল্পরসিকদের পক্ষে অবশ্য এটা খুবই তুচ্ছ সান্ত্বনা হবে কিন্তু তাদের মেটাবার জন্য লেখকদ্বয় কলম ধরেন নি। ভূমিকাতে তাঁরা স্পষ্ট ক বলেছেন, গল্পাকারে লেখা হলেও বইটি সত্যমূলক। তাঁদের উদ্দেশ্য stimulate thought—and, we hope, action.'

স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, বইটিতে চিন্তার খোরাক সত্যিই পাওয়া এবং হয়তো চিন্তিত হবারও। 'অ্যাকশানে' উদ্বুদ্ধ করতে অবশ্য লেখকে চেয়েছেন মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেণ্টকে, আমাদের নয়। বইটি সম্পর্কে তা

---

* The Ugly American : William J. Lederer and Eugine Burdi Victor Gollancz Ltd., London 16 s.

কি প্রতিক্রিয়া তা আমাদের জানা নেই। তবে একথা সত্য 'আগলি আমেরিকান'-এ মার্কিন দূরপ্রাচ্যনীতি এবং দূতাবাসের কার্যকলাপের তীব্র সমালোচনা আছে। লেখকদ্বয় দেখাতে চেয়েছেন মার্কিন দূরপ্রাচ্যনীতি পৃথিবীর ঐ অংশের বাস্তব অবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত নয় এবং মার্কিন দূতাবাসগুলি দূরপ্রাচ্যের রাজনীতিকে সামান্যই প্রভাবিত করতে পেরেছে।

এর নানাবিধ কারণ আছে, তার মধ্যে একটি প্রধান কারণ হল কর্মী-নির্বাচনের ত্রুটি। লেখকেরা দেখিয়েছেন, রাষ্ট্রদূত নির্বাচনের ব্যাপারে যোগ্যতা অপেক্ষা পার্টিগত বিবেচনাই প্রাধান্য পায়।

সেনেট নির্বাচনে পরাজিত লুই সিয়ার্স চেয়েছিলেন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতির পদ। কিন্তু যেহেতু কোনো বিচারপতির পদ খালি ছিল না, তাঁকে রাষ্ট্রদূত করে পাঠান হল সরথানে: সিয়ার্স সরথানের রাজনীতি সম্পর্কে অজ্ঞ, ভাষা জানে না, কারোর সঙ্গে মেশে না, তার মধ্যে প্রবণতারও অভাব। তদুপরি সে জানে, আজ হোক কাল হোক, জজপদের শিকে তার ভাগ্যে ছিঁড়বেই। সে-কটা দিন এই পাণ্ডববর্জিত দেশে কোনো রকমে কাটিয়ে দিতে পারলেই হল।

এদিকে সরথান দূরপ্রাচ্যে আমেরিকার গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি। সাহায্য হিসাবে আমেরিকা প্রচুর অর্থ ব্যয় করে সেদেশে। তবু দেশবাসীর মন পায় না। মার্কিন-বিরোধীরা সেদেশে অতিমাত্রায় সক্রিয়, দেশের নীতি-হীন নেতারা মুখে দরদ দেখালেও, মনে মনে আমেরিকার প্রতি বিরূপ মনোভাবই পোষণ করে। অথচ সিয়ার্সের ধারণা—সব ঠিক হ্যায়।

যে সব বেসরকারী আমেরিকান নাগরিকেরা নিজেদের উদ্যোগে, নিজেদের সাধ্যমতো কিছু "কাজ" করবার চেষ্টা করে তাদের সাহায্য করা তো দূরে থাক—কমিউনিস্টদের হাতে লাঞ্ছিত হলেও সিয়ার্স তাদের রক্ষা করেন না। বরং কমিউনিস্টদের রটানো অপবাদে বিশ্বাস করে লাঞ্ছিত আমেরিকানকেই অবাঞ্ছিত বলে দেশে ফেরত পাঠান। আমেরিকার পার্টি-কর্তাদের প্রিয়পাত্র সিয়ার্স। কাজের গলদ ধরা পড়লেও তাঁর কেশাগ্র স্পর্শ করার সাধ্য কারো নেই।

দূতাবাসের সাধারণ কর্মী নিয়োগের দৃষ্টিভঙ্গিও ভ্রমাত্মক। মোটা মাইনে এবং বিলাস-ব্যসনের লোভ দেখিয়ে কর্মী রিক্রুট করা হয়। দূতাবাসের কাজটা যে একটা 'মিশন' তা মোটেই বলা হয় না। তাই উৎসাহী, কর্মক্ষম,

যোগ্য লোকেরা এ-কাজে আসতে চায় না। যারা আসে তাদের দৃষ্টিভ রথ দেখার এবং কলা বেচার—রহস্যাবৃত প্রাচ্য দেশও দেখা হবে, আবার বিলাসে-ব্যসনে দিনগুলিও কাটবে ভালো। মোটা মাইনে, নিখরচায় কোয়ার্টার, সস্তা খানাপিনা—হাতেও দু পয়সা জমবে। স্বভাবতই বিদেশে গিয়ে দূতাবাসের চৌহদ্দির মধ্যেই তারা নিজেদের আবদ্ধ রাখে, নির্ধারিত কাজটুকু করে খালাস পেতে চায়, স্বদেশের স্বার্থ প্রবর্ধনই যে তাদের প্রধান কাজ তা মনে রাখে না।

সিয়ার্সের স্থলবর্তী গিলবার্ট ম্যাকহোয়াইট অবশ্য অন্য ধরনের মানুষ— উৎসাহী, কর্মক্ষম এবং সর্বোপরি নিজের দায়িত্ব এবং কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন। সরখানে যে কোনো সময়ে 'কমিউনিস্ট উপদ্রব' শুরু হতে পারে। তাই 'কমিউনিস্ট উপক্রত' দেশসমূহ পরিভ্রমণ করে কমিউনিস্টদের রীতিপদ্ধতি আয়ত্ত করবার প্রয়াস পায় সে। ঐসব দেশে কীভাবে কমিউনিস্ট উপদ্রবের মোকাবিলা করা হচ্ছে এবং তার গলদ কোথায় তা অনুধাবন করে তদনুসারে নিজের এলাকায় ব্যবস্থা অবলম্বনে উদ্যোগী হয়। কিন্তু বাধা আসে স্টেট ডিপার্টমেণ্টের দূরদৃষ্টিহীন টিনের দেবতাদের কাছ থেকে। ম্যাকহোয়াইটকে শেষ পর্যন্ত হার মানতে হয়।

শুধু নেতিবাচক সমালোচনাই নয় মার্কিননীতি যাতে সত্যই লক্ষ্যভেদ করতে পারে সেই উদ্দেশ্যে কিছু গঠনমূলক পরামর্শও গ্রন্থকর্তারা দিয়েছেন গল্পচ্ছলে। তাঁরা দেখিয়েছেন পেছিয়ে-পড়া প্রাচ্যদেশগুলির সাহায্য খাতে যে বিপুল অর্থ আমেরিকা ব্যয় করে তার অধিকাংশই কার্যত অপব্যয়িত হয়। চোখ ধাঁধানো বিশালকায় প্রজেক্টের দিকেই আমেরিকার আগ্রহ। অথচ এতে আশু ফল পাওয়া যায় না। তাই জোর দেওয়া দরকার স্বল্প মেয়াদী ছোটখাট প্রজেক্টের উপর। তাতে একদিকে যেমন হাতে হাতে ফল পাওয়া যায় অন্যদিকে তেমনি অজ্ঞ, সংস্কারাচ্ছন্ন গ্রামবাসীর মধ্যে আত্মবিশ্বাস জাগে, কর্মোদ্যোগের উদ্বোধন হয়, দূর হয় আমেরিকানদের সম্পর্কে তাদের ভয় এবং অবিশ্বাস। আর এইটাই হচ্ছে কমিউনিজমের বিরুদ্ধে ধন্বন্তরী ওষুধ।

মানতেই হয়, এই সমালোচনা অনেকাংশে সত্য। সত্যিই হয়তো আমেরিকান দূতাবাসগুলি যথেষ্ট পরিমাণে সক্রিয় নয়। সম্প্রতিকালে দক্ষিণ কোরিয়া এবং জাপানে যে ঘটনা ঘটে গেল—তা যে স্টেট ডিপার্টমেণ্টের উপর অকস্মাৎ এসে পড়েছিল, মার্কিন রাষ্ট্রনেতাদের কথা-বার্তা, আচার-আচরণে তাই

মনে হয়। মার্কিন সাহায্য সম্পর্কে লেখকদ্বয় যে সমালোচনা করেছেন তা যে কতটা খাঁটি তা আমরা নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকেই বুঝতে পারি। তবু না বলে পারা যায় না, 'আগলি আমেরিকান'-এ মার্কিন দূরপ্রাচ্যনীতির যে সমালোচনা করা হয়েছে মোটের উপর তা লক্ষ্যভ্রষ্ট।

লেখকদ্বয়ের মতে এশিয়া ভূখণ্ডের প্রধান সমস্যা কমিউনিজম এবং মার্কিন দেবদূতগণের উপর অর্শেছে এই সমস্যা সমাধানের পবিত্র দায়িত্ব। এই নিরিখেই তারা মার্কিন নীতির বিচার করেছেন এবং সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে মার্কিন নীতি ঈশ্বর-আদিষ্ট এই পবিত্র কর্তব্য পালনে অপারগ হয়েছে।

বলতেই হয় লেখকেরা রোগ নির্ণয়েই ভুল করেছেন। এশিয়ার সমস্যা কমিউনিজম নয়—দারিদ্র্য, অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা—আর তা সাম্রাজ্যবাদেরই সৃষ্টি। এশিয়ার এই সমস্যা যদি আমেরিকা মেটাতে পারে তবেই এশিয়াবাসীর সদিচ্ছা সে পাবে, অন্যথায় নয়। কিন্তু তাই বলে সে যদি ভেবে থাকে সাহায্যের রুপোর শিকল দিয়ে এশিয়াকে নতুন করে বাঁধতে পারবে—তবে তার মোহভঙ্গ অচিরেই ঘটবে, যার লক্ষণ ইতিমধ্যেই দেখা যাচ্ছে দক্ষিণ কোরিয়ায়, জাপানে। কমিউনিজমকে লেখকদ্বয় যেমন অবিমিশ্র অভিশাপ মনে করেন, এশিয়াবাসী তা করে না। কেননা, চীনের দৃষ্টান্তে তাঁরা দেখেছেন, এশিয়ার প্রধান সমস্যাগুলি সমাধানে কমিউনিজম যতটা সক্ষম হয়েছে আর কেউ ততটা হয় নি। সাম্রাজ্যবাদী হলাহল পানে নীলকণ্ঠ এশিয়া অসাম্যের অভিশাপ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছে। কমিউনিজমের সাম্যের আদর্শের আকর্ষণ তাই তাদের কাছে প্রায় অপ্রতিরোধ্য। কায়েমী স্বার্থের সঙ্গে (যারা আবার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছিল সাম্রাজ্যবাদের তল্পিবাহক) হাত মিলিয়ে গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার ফাঁকা বুলি আওড়ালেই এশিয়াবাসীর মন ভিজবে, না বলে পারা যায় না, এটা একান্তই দূরাশা। গণতন্ত্র, স্বাধীনতা ইত্যাদি মহান আদর্শের প্রতি তথাকথিত মুক্ত দুনিয়ার দেশগুলির আনুগত্য যে কতটা—যুগযুগ ধরে লাঠি ও গুলির মধ্য দিয়ে তার মর্মান্তিক পরিচয় এশিয়াবাসী পেয়েছে।

এশিয়াবাসীর মুক্তি-সংগ্রামে কমিউনিস্টরা হয় নেতৃত্ব করেছে, নয়তো অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছে। আর আমেরিকানরা গাঁটছড়া বেঁধেছে তাদেরই সঙ্গে যারা প্রয়াস পেয়েছে এশিয়াবাসীর মুক্তি সংগ্রামকে রক্তের বন্যায় ডুবিয়ে দিতে। ভিয়েৎনামে কমিউনিজমের সঙ্গে গণতন্ত্রের লড়াই

হয় নি, হয়েছে সাম্রাজ্যবাদী প্রভুদের সঙ্গে মুক্তিকামী জনগণের, আমেরিকা ফরাসী সাম্রাজ্যবাদকেই সমর্থন করেছে। সুতরাং দূতাবাসে বাছা করিৎকর্মা লোক নিয়োগ করলেই এশিয়াবাসী তাদের কমিউনিস্টদের ফেলে বিদেশী আমেরিকানদের পুজো শুরু করবেন লেখ যদি তাই ভেবে থাকেন তাহলে বলতেই হয়, ধন্য আশা কুহকিনী 'দি কোয়ায়েট আমেরিকান'-এর পাইল লেখকদ্বয়ের মাপকাঠিতে নিশ্চ আদর্শ আমেরিকান। তার পরিণতির কথাটা স্মরণ করতে বলি। তা মৃত্যুবরণই করতে হয়েছে। প্রসঙ্গত স্মরণীয় উপন্যাসটির ঘটনাস্থল ভিয়েৎনা এবং গ্রেহাম গ্রীন কমিউনিস্ট নন, ক্যাথলিক।

কিন্তু রোগ নির্ণয়ে ভ্রান্তি অপেক্ষাও, রোগ নিরাময়ের জন্য যে ব্যবস্থা- লেখকদ্বয় বাতলেছেন তাই অধিকতর দুশ্চিন্তার কারণ হয়।

ফিলিপাইনের পুতুল-প্রেসিডেন্ট ম্যাগসেসের মুখ দিয়ে লেখকে বলিয়েছেন, average Americans in their natural state...are t best ambassadors a country can have.

অতএব এই বে-সরকারী নাগরিকদের "কাজ করার" অবাধ সুযোগ দি হবে।

এরা কি ধরনের "কাজ" করবেন—লেখকদ্বয় গল্পচ্ছলে তারও কিছু আঁচ দিয়েছেন।

বিদেশে গিয়ে মার্কিন নাগরিকেরা সেই দেশের মানুষদের সঙ্গে জমাবেন। সাংবাদিকদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে তাঁদের প্রভাবি করবার চেষ্টা করবেন। পাদ্রীরা ধর্মপ্রচারের নামে কমিউনিস্টবিরো প্রচার চালাবেন। শুধু প্রচার নয় অস্ত্রশস্ত্রের যোগান দেবেন, দরকার কমিউনিস্ট নিধনেও পেছপা হবেন না। প্রাচ্য দেশের লোকেরা কুসংস্কারা —তারা ভবিষ্যৎ গণনায় বিশ্বাস করে। তাই হাত দেখার ছল করে তা প্রতিবেশী কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে উস্কে দিতে হবে।

ফিলিপাইনে মার্কিন নাগরিকদের এই ধরনের কার্যকলাপের অ স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছিল বলেই নাকি ম্যাগসেসের পক্ষে নির্বাচনে সম্ভব হয়েছিল। লেখকদ্বয় একটি দৃষ্টান্তও দিয়েছেন। ম্যানিলার এ প্রদেশে নাকি কমিউনিস্টরা যথেষ্ট বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছিল। অবস্থা কে আয়ত্তে আনতে পারছিল না। তখন 'র‍্যাগটাইম কিড' নামে পরি

জনৈক আমেরিকান, বাঁশি বাজিয়ে, ফিলিপিনো ভাষায় কথা বলে, গ্রামবাসীদের সঙ্গে খানা খেয়ে এমন অবস্থা সৃষ্টি করলেন যে, "...95 per cent of the inhabitants of that province voted for President Magsaysay and his *pro-American platform* in the 1953 elections." (ইটালিকস্ সমালোচকের)।

মার্কিন পরিভাষায় এই ধরনের কার্যকলাপকে কি বলে জানি না। পৃথিবীর অপর গোলার্ধে কিন্তু এই ধরনের কার্যকলাপ পরদেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ বলেই গণ্য হয়ে থাকে। আর তা কারোর কাছেই উপাদেয় নয়।

'দি আগলি আমেরিকান' পড়বার পর ফিনিয়ানের মতো পাদ্রী সাহেব বা 'র‍্যাগটাইম কিড'-এর মতো দিলদরিয়া আমেরিকানদের সন্দেহের চোখে না দেখে পারা যায় না। আমেরিকানদের ভারত-সংস্কৃতি প্রেম কতট কামগন্ধহীন—মনে এ-প্রশ্নও জাগে।

হাজার বছরের প্রেমের কবিতা

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

"খ্রীষ্টপূর্ব ষোলো থেকে খ্রীষ্টীয় সতেরো শতক পর্যন্ত প্রায় সোয়া তিন হাজার বছরের প্রেমের কবিতার" এই সংকলনটি* হাতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মন খুশি হয়। উপহারযোগ্যতার দিক থেকে বইখানির অঙ্গসজ্জা অসামান্যভাবে সার্থক—শিল্পী এবং প্রকাশক সেজন্যে সমভাবে সাধুবাদ দাবি করতে পারেন। সেই সঙ্গে কৃতজ্ঞতাভাজন সম্পাদক—তাঁর এই প্রচেষ্টাটির জন্যে ; তথ্যপূর্ণ সুলিখিত ভূমিকাটি পড়েও পাঠক হিসেবে অত্যন্ত উপকৃত হয়েছি।

সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত, মিশরীয়, হিব্রু, চীনা, গ্রীক, লাতিন, আরবী, জাপানী ও ফারসী—এই ক'টি ভাষা থেকে সূক্ত, শ্লোক, প্রেমের কবিতা ও গান প্রভৃতি এতে অনূদিত হয়েছে (জয়দেব উদ্ধৃত হয়েছেন, অনূদিত হন নি)। অনুবাদকদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, নজরুল থেকে আরম্ভ করে প্রাচীন, আধুনিক এবং অতি-সাম্প্রতিক বহু লব্ধনামা কবি উপস্থিত আছেন। বহুজনের হস্তস্পর্শে যা হয়ে থাকে, অনুবাদের মান সর্বত্র এক নয়, শক্তির তারতম্য ঘটেছে, ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যের ছায়া পড়েছে। তবু সব মিলিয়ে বইখানি বাংলা সাহিত্যে একটি মূল্যবান সংযোজন। যে কোনো সাহিত্য-পাঠকই বইখানিকে নিজের শেল্‌ফে রাখবার জন্যে প্রলুব্ধি বোধ করবেন এবং উপহার দিয়ে খুশি হবেন।

যথাসম্ভব মূলানুবর্তী অথচ ভাষান্তরিত হয়েও শিল্পসিদ্ধ—এই হল সার্থক অনুবাদের মাপকাঠি। অতএব মূল ভাষার অধিকার এবং অনুবাদ্য রচনাগুলি হাতের কাছে না থাকলে আলোচ্য বইটির কৃতিত্বের যথাযোগ্য পরিমাপ সম্ভব নয়। সুতরাং বিচ্ছিন্ন এবং স্বাধীন কবিতা হিসেবে এগুলি কতটা সফল হয়েছে পাঠক সেইভাবেই বিচার করে দেখবেন। এবং সানন্দে বলতে পারি অধিকাংশ কবিতাই তাঁদের খুশি করবে।

আর, পাঠকরূপেই দু-একটি কথা নিবেদন করি।

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে "পুরুরবা ও উর্বশী সংবাদ" বহুখ্যাত। অত্যন্ত ঔৎসুক্য নিয়ে অনুবাদটি পড়লাম। কিন্তু উর্বশী যখন বলেন :

* হাজার বছরের প্রেমের কবিতা॥ সম্পাদনা : অবন্তী সান্যাল। নয়া সাহিত্য ভবন। আট টাকা॥

"ছিলাম ভালোই, দিনে একবার খাইয়া একটু ঘি,
তাতেই আমার বেশ চলে যেত বেশি আর লাগে কি—" [পৃঃ ৩৭]

তখন ব্যাপারটা হাসির কবিতার মতো মনে হয়।

শ্রদ্ধেয় প্রবীণ কবি কালিদাস রায় 'রঘুবংশ' থেকে 'অজ-বিলাপে'র কিছু অংশ অনুবাদ করেছেন। অনুবাদ সুন্দর হয়েছে, কিন্তু ৫৯—৬৫ শ্লোকগুলি বর্জিত হল কেন ? আয়তনের দৈর্ঘ্যের জন্যে নিশ্চয়ই নয়—কারণ এর চাইতে দীর্ঘতর অনেক কবিতা বইতে স্থান পেয়েছে। পরিবর্জিত শ্লোক ক'টি যে কাব্যসৌন্দর্যে হীনতর—এ-কথা জোর করে বলা যায় না—বরং ও-ক'টি থাকলেই একটা সমগ্রতা আসত বলে মনে হয়।

'বিজ্জকা'র দ্বিতীয় কবিতাটি 'অমরু'র চতুর্থটির সঙ্গে ভাব ও ভাষার দিক থেকে প্রায় অভিন্ন। এদের একটিকে স্বচ্ছন্দেই বর্জন করা যেত।

'বিহ্লণে'র বানান 'বিহ্লন' লেখা হয়েছে—এটি অবশ্য সংশোধনযোগ্য। তাছাড়া তাঁর রচনার নাম 'চৌরপঞ্চাশিকা' নয়—'চৌরপঞ্চাশৎ' অথবা 'চৌরী-সুরতপঞ্চাশিকা।' আর ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর' থেকে দুর্বল অনুবাদই বা সম্পাদক গ্রহণ করলেন কেন ? যে কোনো আধুনিক শক্তিমান কবিকে দিয়ে তিনি স্বচ্ছন্দে কয়েকটি শ্লোক নতুনভাবে অনুবাদ করিয়ে নিতে পারতেন। আশা করি, পরবর্তী সংস্করণের সময় কথাটা তিনি ভেবে দেখবেন।

ভারতীয় অধ্যায়ে একটি গুরুতর বিচ্যুতির দিকেও সম্পাদকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তাঁর ভূমিকায় হালের 'গাথা সতসই'-এর উল্লেখ দেখছি। কিন্তু এই সুদীর্ঘ এবং অতিশয় মূল্যবান বইখানি থেকে একটি কবিতাও গ্রন্থে সংকলিত হয় নি। এই অসতর্কতা পীড়াদায়ক।

ভারতীয় প্রেমকাব্যের অনুবাদে শ্যামাপদ চক্রবর্তীর 'অমরু' এবং সুরেশচন্দ্র সরকারের 'পঞ্চশিখ গন্ধর্বের গান' আমার অপূর্ব মনে হয়েছে।

'মিশরীয়' কবিতায় চমৎকার অনুবাদ করেছেন অবন্তী সান্যাল এবং মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়। হিব্রুর অনুবাদে 'রাজা সলোমনের পদাবলী' ইংরেজী বাইবেলের সঙ্গে মিলিয়ে পড়েছি এবং কবি সুরেশচন্দ্র সরকারের নৈপুণ্যে মুগ্ধ হয়েছি।

চীনা প্রেম কবিতার সম্ভারটি বিশেষভাবে উল্লেখ্য। যেমন আশ্চর্য কবিতা, তেমনি উপভোগ্য অনুবাদের কৃতিত্ব সিদ্ধেশ্বর সেন এবং কানাই

সামন্তের। সিদ্ধেশ্বর সেনের 'সুন্দরীর প্রতি' এই সংকলনের অন্যতম সম্প
কিন্তু শ্রদ্ধেয় বিষ্ণু দের :

"রাগে বিবর্ণ এই বাতাস আজ আর এই দিনটাকে
স্বচ্ছ আকাশে শেষ হতে দেবে না, এই পণ।
মেঘের পিছনে মেঘেরা ধাওয়া করছে।
নির্মম চিন্তা যত,
জেনে থাকি আজ সকরুণ গুঞ্জনে—" [পৃঃ ১১৩]

এই অনুবাদ আমার ভালো লাগল না। রবীন্দ্রনাথের 'একটি বধূর কা চৈনিক অংশের গৌরব বাড়িয়েছে। গ্রীক অংশে কয়েকটি কবিতা যে অস্বচ্ছ ও আড়ষ্ট লাগল। 'স্যাফো'র এই অনুবাদ কেমন শোনাচ্ছে ?

"এসো আমার কাছে,
আমার নিষ্ঠুর দুঃখ মুক্ত করো,
আমার অন্তরাত্মা যে সম্পাদনা চায়,
তুমি আমার জন্য সম্পাদনা করো
তুমি স্বয়ং আমার সহকারী হও।" [পৃঃ ১৪০]

প্রেমের ব্যঞ্জনা পাচ্ছি না—খবরের কাগজের কথাই মনে হচ্ছে।

অনুবাদ করতে গিয়ে মূলের সঙ্গে সংযোগ রাখবার প্রয়োজনে অনেক সম কোনো কোনো জায়গা কানে লাগতে পারে। সেগুলো অতিক্রম কর ওপরেই অনুবাদকের কৃতিত্বের পরিচয় মেলে। বিশেষভাবে প্রেমে কবিতাকে যথাসম্ভব স্থান-কালের সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত করে সর্বদেশীয় মানুষে হৃদয়ের কাছে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব রয়েছে। যদি কোনো উৎকৃ কবিতাতেও এমন স্থানিকতা বা কালিকতা থাকে যে তাকে কোনোমতে নির্বিশেষ করা সম্ভব নয়, তাহলে সে কবিতা পরিহার্য বলেই মনে করি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি :

"তবুও হৃদয়ে স্থায়ী রোদান্থে যে জাগে।
স্তব্ধ হও বাচালের দল,
ফিলোমেলো-জিহ্বাচ্ছেদ করেছি কি আমি ?
চলে যাও পর্বতচূড়ায়,
চলে যাও পাহাড়ে বাসায়
চিত্রপুচ্ছ সে পাখির—
সেখানে ইতুলোস্ শোকে হওগে অধীর—" [পৃঃ ১৫১]

পাঠকের কেমন লাগছে ? বইয়ের শেষে গ্রীক-পুরাণের রেফারেন্স না হয় পাওয়া গেল, কিন্তু তা সত্ত্বেও কতটা রসাস্বাদন সম্ভব হয় বলা কঠিন। 'প্রেম-মাধুর্য' কবিতায় দেখছি : 'নাবিকের চোখে মধু উদীচী-শিখর।' এখানে নিশ্চয়ই রাত্রির যাত্রার পর নাবিকের প্রত্যাশী দৃষ্টির সামনে পূর্বাকাশে সূর্যোদয়ের ইঙ্গিত করা হয়েছে। কিন্তু 'উদয়' কথার সঙ্গে ধ্বনিগত নৈকট্য আছে বলেই 'উদীচী' পুব দিক নয়—ওর অর্থ উত্তর দিক। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'হতাম যদি হাওয়া' অনুবাদটি খুব ভালো লাগল।

লাতিনে হরপ্রসাদ মিত্র কয়েকটি স্বচ্ছ অনুবাদ উপহার দিয়েছেন। 'আরবী' কবিতায় নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী এবং অবন্তী সান্যাল, জাপানী কবিতায় কানাই সামন্ত এবং ফারসীতে প্রমোদ মুখোপাধ্যায় নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। ফারসী কবিতার প্রসঙ্গে একটি কথা মনে হল। 'রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজে'র নজরুলকৃত মূল্যবান অনুবাদ সত্ত্বেও সম্পাদক একবার স্বর্গীয় কান্তিচন্দ্র ঘোষকে স্মরণ করতে পারতেন। তাঁর ওমর-খায়েম সম্পর্কে বিতর্ক থাকতে পারে, তার জন্যে ফিট্জেরালড্ও অনেকটা দায়ী, কিন্তু কান্তিচন্দ্রের 'রুবাইয়াৎ-ই-হাফেজিয়ানা' নিঃসন্দেহে প্রথম শ্রেণীর রসসার্থক অনুবাদ। একটি রুবাই উদ্ধৃত করছি :

গালের কাছে তিলটি কালো না হয় আছেই আঁকা,
তাই বলে কি গর্ব এত ? মুখ ফিরিয়ে থাকা ?
তিলটি তোমার—শুনলে পরে করবে নাকি মাপ ?
আমারি এক গোপন দিঠির একটি ক্ষুদ্র ছাপ !"

এর সৌন্দর্য, আশা করি ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। কান্তিচন্দ্রের কয়েকটি অনুবাদ পরের সংস্করণে স্থান পেলে খুশি হব।

বইটি পড়তে গিয়ে আর একটি সত্য আবিষ্কার করা গেল। আজ পর্যন্ত বিদেশী কবিতার অনুবাদে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত অনতিক্রান্ত। এই সংকলনেও শ্রেষ্ঠ অনুবাদকের গৌরব তাঁরই প্রাপ্য।

কিছু কিছু অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও 'হাজার বছরের প্রেমের কবিতা' রূপে এবং রসে অতি চমৎকার বই। বিস্ময়কর দ্রুততার সঙ্গে এর সংস্করণ হবে বলে আশা করি। সম্পাদক অবন্তী সান্যাল, প্রকাশক অনিলকুমার সিংহ এবং শিল্পী পূর্ণেন্দু পত্রীকে আর একবার অভিনন্দন জানালাম।

রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজ

সুরজিৎ দাশগুপ্ত

যে-কোনও দেশের কাব্যধারাতেই রবীন্দ্রনাথের মতো প্রতিভার আবির্ভা একটি সৌর-বিপ্লবের সামিল এবং তার প্রভাব সর্বদাই প্রচণ্ড ও প্রব হতে বাধ্য। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশকের যে-কাব্য তা সেই প্রভাবে আবর্ত থেকে অব্যাহতি পায় নি।* বরং সেকালের অনেক কবি রবীন্দ্রনাথের আবর্তনকেই কবিজন্মের মোক্ষ বলে ধরে নিয়েছিলেন। ফলে সূর্যের প্রখর আলোতে এঁদের কাব্য এতই প্রভাহীন যে তা আজ আমাদে চোখে অদৃশ্য। এঁদের মাঝারি কবিও বলা যায় কিনা সন্দেহ, অন্তত বলতে হলে মাঝারি-কবি অভিহিত ব্যক্তিটির নিজত্বকে অর্থাৎ কবিসত্তা অথ ব্যক্তিস্বরূপকে প্রমাণ করতে হবে। রবীন্দ্রনাথের প্রভাবমুক্ত কবি কজন বা আছেন? তাঁর প্রভাব সুধীন্দ্রনাথ দত্তের উপরে পড়ে নি? অমি চক্রবর্তী কি বুদ্ধদেব বসুর উপরে পড়ে নি? নিশ্চয়ই পড়েছে। ত যে আজ তাঁদের নাম বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করা হয়ে থাকে তার কার তাঁদের প্রকট নিজত্ব।

প্রত্যেক কবিরই কিছু-না-কিছু নিজত্ব থাকে। হয়তো রবীন্দ্রানুসারী কবিদের ক্ষেত্রে সে-নিজত্ব কিছু প্রচ্ছন্ন ছিল। যেমন করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতায়। ছন্দে, শব্দচয়নে, বর্ণনাভঙ্গিতে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর খুব বেশি মিল আছে, এ-কথা হাজারবার সত্যি। তেমনি রয়েছে বৈশিষ্ট্য : তাঁর প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে তিনি প্রকৃতির কবি যে-অর্থে ওয়র্ডসওয়র্থ বা জীবনানন্দকে প্রকৃতির কবি বলা হয়েছে, হুবহু সেই অর্থে, কিন্তু তিনজনের কাছে প্রকৃতি তিন বিভিন্নরূপে স্বতঃপ্রকাশিত করুণানিধানের কাছে এই প্রকৃতিই তাঁর প্রিয়া—চণ্ডীদাসের ভাবগম্ভীর ব্যথাভারাতুরা নায়িকা নয়—তাঁর প্রকৃতি লীলাচপলা রঙ্গবিলাসিনী কিশোরী নায়িকা, যে কখনও ধরা দেয় না, কেবল বারবার সামনে এসে পালিয়ে যা

---

*রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজ। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়। এ, মুখার্জি অ্যাণ্ড কো প্রাইভেট লিমিটেড। ছয় টাকা॥

কবির নাগালের বাইরে এবং যার ছলনাতে কবি পুলকিত ও মুগ্ধ। এ-প্রকৃতি যে রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি থেকে স্বতন্ত্র তা বলে দিতে হয় না।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই যে রবীন্দ্রানুসারী কবি কাকে বলব? শ্রীঅরুণকুমার মুখোপাধ্যায় "রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজ" বলতে সেই সব কবিদের বুঝিয়েছেন বিংশ শতাব্দীর গোড়াতে যাঁরা রবীন্দ্রকাব্যের অনুসরণে ও সেই ধারায় কাব্যচর্চা শুরু করেছিলেন, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ছিলেন যাঁদের নেতা, যাঁদের কাব্যে ঐতিহ্যপ্রীতি ও গ্রামবাংলার প্রকৃতিপ্রীতি বিশেষরূপে সক্রিয়, নারীবন্দনা, গার্হস্থ্যজীবনের ছবি, দেশপ্রেম যাঁদের কাব্যে আধেয়রূপে বর্তমান। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, যতীন্দ্রমোহন, যতীন্দ্রনাথ, মোহিতলাল, কুমুদরঞ্জন, কালিদাস রায়, সাবিত্রীপ্রসন্ন, নজরুল ইসলাম প্রমুখ তেরোজন কবি সম্পর্কে লেখক আলোচনা করেছেন। গ্রন্থের শুরুতেই লেখক মাঝারি-কবিদের সম্বন্ধে বলেছেন, "এঁরা হয়তো কোনও মহৎ সাহিত্যকীর্তি রেখে যান না, কিন্তু ইতিহাসের জগতে এঁদের না থাকলে চলে না। সাহিত্যের ধারাকে নিয়ত প্রবহমান রাখার দায়িত্ব এঁরাই গ্রহণ করেন, পালন করেন। মহৎ লেখকের আবির্ভাবকে এঁরাই সুগম ও ত্বরান্বিত করেন। এঁরা সাহিত্যে সম্মানীয়, কেননা এঁরা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেই থাকেন। তাই মাঝারি-কবিদের কথাও সৎ সাহিত্যপাঠকের কাছে গুরুত্বপূর্ণ।" এইটুকু পড়ে আশা করা যেতে পারে যে একজন সৎ সাহিত্যপাঠক হিসেবে শ্রীমুখোপাধ্যায়ের কাছে এইসব মাঝারি-কবিদের কতখানি গুরুত্ব তা বইটি পড়লে বোঝা যাবে এবং সেই গুরুত্ব সম্বন্ধে আমাদের মতো সাধারণ পাঠকদের তিনি অবহিত ও সচেতন করে তুলবেন। কিন্তু আফসোস এই যে গ্রন্থকার আমাদের আশাপূরণে সমর্থ হন নি। বইটি হাতে নিলেই বুঝি যে মাঝারি-কবিদের একটা গুরুত্ব আছে—নতুবা তাঁদের সম্বন্ধে ছয় টাকা মূল্যের একটি বই লেখা হবে কেন? কিন্তু এখানেই গুরুত্বের শেষ। তার প্রধান কারণ এই যে এ-সব কবিদের নিজত্ব সম্পর্কে লেখক নিরুৎসুক। ফলে যে-আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে শ্রীমুখোপাধ্যায় এ-গ্রন্থ প্রণয়নে উদ্‌যোগী হয়েছেন বলে গোড়াতে মনে হয়, শেষ পর্যন্ত সে-আদর্শের ফলশ্রুতি পাঠকের দৃষ্টিগোচর হয় না এবং এইসব কবিদের নিজত্ব সম্বন্ধে পাঠক সেই তিমিরেই থাকেন। আরও পরিতাপের কথা এই যে লেখকের নিজের মতামত এ-গ্রন্থে সামান্যই আছে, প্রায় অপর কোনও সমালোচকের মতামত উদ্ধার করে তাতে তিনি কেবল

সায় দিয়ে গেছেন অর্থাৎ ওই পূর্বসূরী সমালোচকের মতামতটাই নিজের মতামত। এ-বইয়ের যে-কটি মতামত গুরুত্বপূর্ণ তথা পাঠক অভিনিবেশ দাবি করে তার প্রায় সবগুলিরই দায়িত্ব অন্য কোন সমালোচকের, আলোচ্য গ্রন্থলেখকের নয়।

। দুই ।

শ্রীঅরুণকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন, "রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজের কাব্য-পাঠের প্রধান শর্ত হল, পাঠক বাংলাদেশের গ্রামজীবনের প্রতি শ্রদ্ধাবান এ লোকসংস্কৃতি ও পুরাণকাহিনীর ভক্ত হবেন। আধুনিক জীবনের প্রতি সংশয় ও বিক্ষোভ, নৈরাশ্য ও ব্যর্থতা নিয়ে এঁদের কবিতা পড়ে রস আস্বা করতে গেলে আমরা ব্যর্থ হব।" মাননীয় গ্রন্থকারকে প্রশ্ন করি, কাব্য-পাঠের এবম্বিধ শর্ত কি কিছুটা কৌতুকজনক নয়? রবীন্দ্রনাথের কাব্যপা এরকম শর্ত যখন সম্পূর্ণ অর্থহীন তখন তাঁকে অনুসরণ করে যাঁরা কবি লিখেছেন সে-সব কবিদের ক্ষেত্রেই বা তা সমান হাস্যকর ঠেকবে না কেন কয়েক পংক্তি পরেই শ্রীমুখোপাধ্যায় বলেছেন, "এলিঅট যে-'ট্রাডিশনে' কথা বলেছেন, তার গণ্ডী ছেড়ে এঁরা বাইরে যান নি। তাই এঁদে কাব্যভূগোল-পরিধি সংকীর্ণ, সীমাবদ্ধ।" এখানে দ্বিতীয় বাক্যের প্রথ শব্দ "তাই" দেখে খটকা লাগল। এলিয়ট-কথিত 'ট্রাডিশনে'র সা কাব্যভূগোল-পরিধির সংকীর্ণতা ও সীমাবদ্ধতার অবশ্যম্ভাবী কার্যকারণ যো রয়েছে, এটাই কি লেখকের বক্তব্য? তা যদি হয় তবে লেখকের অভিনব আছে বটে। পূর্বোদ্ধৃত বাক্যের অব্যবহিত পরের বাক্যটি হল এই "দেশের পুরনো সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে এঁরা নবরূপে আমাদের সামনে উপস্থি করেছেন।" কেবল যতীন্দ্রমোহন বাগচী মহাভারতের একটি চরিত্র নতুনভাবে এঁকেছেন, এ ছাড়া আর কোন কবি কোনখানে দেশের সংস্কৃ ও ঐতিহ্যকে নতুন রূপ দিয়েছেন তা শ্রীমুখোপাধ্যায় তিনশো আটা পৃষ্ঠার মধ্যে কোথাও দেখান নি। অবশ্য সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য যদি সত্যি নতুন রূপ পেয়ে থাকে তবে তা কি সেই সঙ্গে কাব্যের ভূগোলকে বিচিত্র বিস্তৃত করে নি? ভূতপূর্ব রামতনু লাহিড়ী গবেষকের (তথ্যটি গ্রন্থকা গ্রন্থমধ্যে স্বয়ং পরিবেশন করেছেন) পক্ষে এ ধরনের পরস্পরবিরোধী বক্তব্য পাশাপাশি ঠাঁই দেওয়া কেমন করে সম্ভব হয় জানি নে।

অবশ্য "রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজ" কথাটাই এক হেঁয়ালি। কারণটা খুলে বলি। রবীন্দ্রনাথের বিশেষ একটি পর্যায়ের প্রভাব কয়েকজন কবির উপর পড়েছে; কিন্তু এই প্রভাব যতটা বাহ্যিক ততটা আন্তরিক নয়। তদুপরি এটাও লক্ষণীয় যে প্রথম মহাযুদ্ধের শুরু থেকে মৃত্যু পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ যে সকল কবিতা লিখে গেছেন এবং এই সময়ের মধ্যে তাঁর অধ্যাত্মজগতে যে পরিবর্তন এসেছে তার কোনও প্রভাব তথাকথিত রবীন্দ্রানুসারী কবি-সমাজের উপর পড়ে নি। তাহলে এই কয়জন কবিকে বিশেষরূপে রবীন্দ্রানুসারী বলব কেন? সত্যি বলতে কি, গ্রাম-বাংলার প্রকৃতিকে জীবনানন্দ যেমন করে দেখিয়েছেন তেমন করে কয়জন তথাকথিত রবীন্দ্রানুসারী কবি দেখাতে পেরেছেন? সংস্কৃত ভাষা ও প্রাচীন সংস্কৃতিকে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত যেভাবে ব্যবহার করেছেন তেমনভাবে কয়জন তথাকথিত রবীন্দ্রানুসারী কবি করতে পেরেছেন? রবীন্দ্রনাথের শান্তি ও মঙ্গল চেতনা, তাঁর আস্তিকতা যেমন সর্বান্তঃকরণে অমিয় চক্রবর্তী মেনে নিয়েছেন তেমন করে কয়জন তথাকথিত রবীন্দ্রানুসারী কবি মানতে পেরেছেন? রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজের লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্য বলে শ্রীমুখোপাধ্যায় যেগুলিকে চিহ্নিত করেছেন সেগুলি আধুনিক কবিদের কারও কারও মধ্যে বেশ প্রবলরূপেই বিদ্যমান। আসলে "রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজ" শিরোনামে কোনও সাধারণীকরণই চলতে পারে না, বিশেষ করে যখন তথাকথিত রবীন্দ্রানুসারীদের উপরে রবীন্দ্রনাথের শেষ তিরিশ-চল্লিশ বছরের কবিতা কোনও ছাপ ফেলতে পারে নি। এ-বিষয়ে আলোচ্য গ্রন্থের লেখক মৌন; সুতরাং কেন ছাপ ফেলতে পারে নি সে-প্রশ্নের জবাব তাঁর কাছ থেকে প্রত্যাশা করা ভুল।

। তিন ।

প্রকৃতপক্ষে এই শতাব্দীর প্রথম দুই-তিন দশকের যাঁরা কবি এবং পরবর্তী তিন-চার দশকের যাঁরা কবি—তাঁরা পাঁজির হিসেবে যদিও পিঠোপিঠি, তবু মনোভঙ্গির দিক দিয়ে এই দুই কবিগোষ্ঠীর মধ্যে এক মন্বন্তরের ব্যবধান। ব্যবধান কেবল এই নয় যে একদল গাঁয়ে বাস করেন, আর একদল শহরে। কালিদাস রায় একটি সাম্প্রতিক কবিতায় আক্ষেপ করেছেন "যে সজল চোখে ন বছরের কনে", "লালপেড়ে আধ ঘোমটাটি বধূর সরল সভয় তরল চোখের চাউনি", "ধনপতি সাধুর পায়ের উদ্ধত দাপট ভেঙে দিল

খুল্লনা মার চণ্ডীপূজার ঘাট", "ধানদূর্বার আশিস" প্রভৃতি "কবির
পুঁজিপাটা বিদায় নিল সবি তাহার সাথে বিদায় নিল কবি।" এখানে
দেখা যাচ্ছে যে কালিদাস রায় "কবির পুঁজিপাটা" বলতে বিশেষ কতক
প্রসঙ্গ ও বিষয়কে বুঝিয়েছেন, যেগুলিকে বাদ দিলে কবিতা লেখা
হয় না। অথচ একজন আধুনিক কবির "পুঁজিপাটা"র হিসেব
বিপরীত প্রকৃতির তালিকা পাওয়া যাবে। শহরে কি সত্যিই "ন বছরের
কনে" দেখা যায় না? "ধানদূর্বার আশিস" কি এ-কালে একেবারে
অচল? তা নয়, কিন্তু সামগ্রিকভাবে এ-সবের ব্যঞ্জনা ও তাৎপর্য
মুখে এবং আরও পরিষ্কার করে বলা যায় যে বর্তমানকালে জীবনের
সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতেই একটা পরিবর্তন এসেছে আর সেই পরিবর্তন
এসেছে বিশেষ আর্থনীতিক ব্যবস্থার চাপে। দুই কবিসমাজের মধ্যে
ব্যবধান তা আসলে দুই আর্থনীতিক ব্যবস্থার ব্যবধান। এক কবিসমাজ
কৃষিনির্ভর আর্থনীতিক ব্যবস্থার কোলে জন্মেছেন, তাকে সত্য বলে জেনেছেন
ও নিশ্চিন্তভাবে মেনেছেন, ফলে তাঁদের অন্তরে বৈষম্য ও বিরোধের
ছিল না। আর নব্য কবিসমাজ দেখেছেন শিল্পবিপ্লবের আঘাতে
করে প্রাচীন ব্যবস্থা ভেঙে পড়ছে অথচ শিল্পবিপ্লব এদেশে সম্পূর্ণ
উঠছে না এবং তার মধ্যে পশ্চিমে শিল্পবিপ্লবের শোচনীয় পরিণাম
ফলে এই নব্য কবিসমাজ বিভ্রান্ত ও দিশাহারা বোধ করেছেন, হতাশ
আক্রান্ত ও সংশয়ান্বিত হয়েছেন, সঙ্গে সঙ্গে চলেছে এই অনিশ্চয়
থেকে পলায়নের প্রয়াস, শান্তি ও সান্ত্বনার অন্বেষণ, স্বীয় মনোজগতে
নতুন মূল্যবোধ গড়ে তোলবার সাধনা। এদিকে অসম্পূর্ণ হয়েও শিল্পবি
ভারতবর্ষে যে-আঘাত হানল তাতে কৃষিনির্ভর সমাজের অবশ্যম্ভাবী পরি
রূপী দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভঙ্গির যে-দেওয়াল জীবনকে ঘিরে রয়েছিল
জীবনকে ছোট করে রেখেছিল তা ভেঙে পড়ল। এইভাবে বাঙালী ক
দৃষ্টি প্রসারিত হয়ে গেল হাজার হাজার মাইল দূরের দিগন্ত অবধি;
এই ঘটনারই সমকালে রবীন্দ্রনাথ বাংলার কবিকে করে তুললেন
কবি। একজন আধুনিক কবির কাছে তাঁর জন্মের পরিমিত ভূমিটুকুই
ঘর হয়ে রইল না, গোটা পৃথিবীটাই তাঁর ঘর হয়ে গেল। কোথায়
রাশিয়াতে কী একটা বিপ্লব হল, তাতে প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে
বাংলার কবিগণ। একে ঠাট্টা করে বলা হয়েছিল যে কামাস্কাটকায়

মরলে বৃন্দাবনে হাহাকার পড়ে যায়। কিন্তু কালের বিচারে দেখা গেল যে ঠাট্টা শেষ পর্যন্ত ঠাট্টাকারীদের পক্ষেই নিদারুণ হয়েছে। যাই হোক, জীবনানন্দের অপরিণত কাব্য 'ঝরাপালকে'ই দেখা যায় যে বাঙালী কবির মনোভঙ্গি পালটে গেছে, তাঁর ছোট ঘরের দেওয়াল ভেঙে পড়েছে, তাঁর পৃথিবী তাঁর আকাশ বড়ো হয়ে গেছে।

এই নতুন দেশকালের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে রবীন্দ্রনাথ নিজেকে বারবার ভেঙেছেন ও গড়েছেন। কিন্তু যাঁরা তাঁর অনুসরণ করেছিলেন তাঁরা আর পাল্লায় পেরে উঠলেন না। কৃষিব্যবস্থা-নির্ভর সমাজে তাঁদের জন্ম ও বৃদ্ধি, সেই সমাজের সংস্কৃতিতেই তাঁদের চেতনার পুষ্টি, সেই সমাজের সঙ্গেই তাঁদের নাড়ির যোগ এবং সেই সমাজেই তাঁদের সর্বাত্মক অস্তিত্ব নিহিত, সেজন্যে "ন বছরের কনে" নিয়েই তাঁদের কবিত্ব। পক্ষান্তরে রবীন্দ্রনাথ অদ্বিতীয় প্রতিভাবলে কৃষিব্যবস্থা-নির্ভর সমাজকে অনায়াসেই ডিঙিয়ে বের হয়ে গেছেন বৃহত্তর জগৎ ও নতুন পরিবেশের সন্ধানে। যখন তিনি এক দুঃসাহসী দুর্মর সোনালী ঈগলের মতো বিশাল পাখা বিস্তার করে একের পর এক দিগন্ত পার হয়ে যাচ্ছিলেন তখন তাঁর তথাকথিত অনুসারীগণ আপন আপন নীড়ের নিশ্চিন্ত আশ্রয়কেই পছন্দ করেছিলেন। উচিত কাজই তাঁরা করেছিলেন। কেননা রাবীন্দ্রিক দুঃসাহস তাঁদের পক্ষে আত্মঘাতী হত।

। চার ॥

যখন বাইরের জগতে ভাঙাগড়ার তুমুল গর্জন-নিনাদ বাঙালীর কানে একটু একটু করে পৌছতে লাগল, যাঁদের আমরা আধুনিক কবি অভিহিত করে থাকি তাঁদের কারও আবির্ভাব হয় নি এবং তৎকালীন বাঙালী কবিরা যে যার স্বপ্নের কুঞ্জে বসে বীণায় তান তুলছেন সে সময়ে যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের আগমন ঘটে। তাঁর ছাঁটাকাটা লাবণ্যহীন তীক্ষ্ণ বাক্‌ভঙ্গির মধ্যেই ছিল নিষ্ঠুর সত্যকে খোলাখুলিভাবে স্বীকার করবার ঋজুতা ও দৃঢ়তা, বাস্তবের নগ্নমূর্তির মুখোমুখি তাকাবার স্পর্ধা: তাঁর এক একটি শাণিত চিত্রকল্পে ভাবালুতার ফানুস ফেঁসে যেতে লাগল। তিনি বুঝেছিলেন যে আধ্যাত্মিকতার নামে এতকাল ভাবের ঘরে চুরি করাই হয়েছে, তাই বস্তুতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি তিনি অর্জন করতে চেয়েছিলেন। বাংলার সজল শ্যামল যে নিসর্গ শোভা সেকালের প্রায় তাবৎ কবিকে অভিভূত করেছিল তার মোহে মজেন নি

যতীন্দ্রনাথ, বাংলার এই ভূগোলকে অতিক্রম করে তিনি মরুভূমির আবহাওয়া ও পরিবেশে তাঁর কবিসত্তার স্বদেশকে খুঁজে পেয়েছিলেন। বাংলা ভাষার কাব্য যে কেবল বাংলাদেশেরই কাব্য, এই ভ্রান্ত ধারণা ধীরে ধীরে ভেঙে যেতে থাকল। কিন্তু মনে হয় বস্তুতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর প্রত্যাশাকে পূরণ করতে পারে নি, এই দৃষ্টিভঙ্গি সমাজের বৈষম্য দূরীকরণে অক্ষম এরকম একটি ধারণা তাঁকে অন্য এক শান্তিলোকের সন্ধানের জন্যে তাড়না করছিল। তাই তাঁর শেষ তিনটি কাব্যগ্রন্থের সুর স্নিগ্ধ, বিষণ্ণ, ভাবময় অর্থাৎ খানিকটা আধ্যাত্মিক। আধ্যাত্মিকতায় প্রত্যাবর্তনের সমান্তরালে ঘটেছে মরুভূমির ঊষরতা থেকে উর্বর বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন। অনেক সময় তাঁকে বিদ্রোহী কিংবা দুঃখবিলাসী অথবা অসূয়ক কবি বলে বর্ণনা করা হয়ে থাকে ; কিন্তু ওরকম বর্ণনাতে তাঁর প্রকৃত মূল্য বিকৃত করা হয়। যতীন্দ্রনাথের কাব্য হল সেই সেতু যা সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় পুষ্ট কাব্যধারা ও শিল্পবিপ্লব-সচেতন কাব্যধারাকে যুক্ত করেছে। অপিচ এই দুই ধারার অন্তঃস্থিত যে দ্বন্দ্ব তাঁকেও ব্যক্ত করেছে। তাই বাংলা কাব্যে যতীন্দ্রনাথের স্থান যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনই তাৎপর্যময়।

অবশ্য কেবল যতীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে নয়, কারও ক্ষেত্রেই বাংলা কাব্যে কোন কবির কী গুরুত্ব ও তাৎপর্য তা নির্ণয়ে অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বিশেষ আগ্রহ নেই, তাঁর আগ্রহ অপর অপর সমালোচক কার সম্বন্ধে কী বলেছেন তা মেনে নেওয়ার দিকে, অপরের অনুস্মৃতিতেই তাঁর তৃপ্তি—একথা আগেই বলেছি। নিজের বিচার ও বুদ্ধি প্রয়োগে তাঁর এই বিচিত্র অনীহাকে যেখানে তিনি কাটিয়ে উঠেছেন সেখানে তাঁর মতামত অনেক সময়ই বিস্ময়কর। যেমন মোহিতলাল সম্বন্ধে বলেছেন, "বাঙালী পাঠকের পক্ষে মোহিতলালের কাব্যরস-আস্বাদনে সর্বপ্রধান বাধা এখানেই এই ভোগবাদ।" যেহেতু বাঙালীর মানসজগতে ভোগবাদ নেই, তাই বাঙালী পাঠকের পক্ষে মোহিতলালের কাব্যরস আস্বাদন সম্ভব নয়—মনে হয় এইটেই এখানে লেখকের বক্তব্য। অর্থাৎ বৈরাগ্য অথবা "জগৎ ও জীবনকে একটি স্বপ্নের আবেশে সুন্দর করে ভোগ করা"-ই বাঙালী প্রকৃতি। কিন্তু উদ্ধৃত বাক্যটির পরেই এই ভোগবাদ ও শাক্তভাব যে অভিন্ন তা বলতে গিয়ে শ্রীমুখোপাধ্যায় উদ্ধার করেছেন মোহিতলালকে : "স্মরগরলের কবিতাগুলিতে যে একটা সুর বেশী করিয়া বাজিয়াছে, তাহাও এই বাংলার জলমাটিতে নিহিত আছে—সে সুর 'বৈষ্ণব' নয়, অপর সাধনার সুর।" আশংকা করি মোহিতলালের কাব্যরস আস্বাদনে বাঙালীর অক্ষমতার কারণ প্রসঙ্গে স্বয়ং কবির বক্তব্য শ্রীমুখোপাধ্যায়ের বক্তব্যের প্রতি বিশ্বাস রক্ষা করতে নারাজ। প্রকৃতপক্ষে লেখক অত্যন্ত হঠোক্তিপরায়ণ, তাই তিনি হৃদয়ঙ্গম করতে চান নি যে মোহিতলালের ভোগবাদ তাঁর কাব্যরস-আস্বাদনে বাধা

নয় ; আমরা জানি এই ভোগবাদের বিপরীত বৈষ্ণবভাবসম্পন্ন অন্যান্য সমসাময়িক কবিদের রচনাবলীর তুলনায় মোহিতলালের কাব্য পাঠক মহলে অনেক বেশি শ্রদ্ধা ও আগ্রহ সঞ্চার করেছে : তাঁর কাব্যের ততটুকু বা ততখানি আধুনিক পাঠক কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়েছে, হচ্ছে ও হবে যতটুকু বা যতখানি শাক্তচেতনাতে আচ্ছন্ন—যে-শাক্তচেতনা থেকে আমাদের দেশের অসম্পূর্ণ শিল্পবিপ্লব আধুনিক পাঠককে বিচ্ছিন্ন করেছে, করছে ও করবে—এবং প্রকরণ সম্বন্ধে সামন্ততান্ত্রিক আভিজাত্যে অনড়।

কিন্তু শ্রীঅরুণকুমার মুখোপাধ্যায়ের মনে এই সকল জিজ্ঞাসার স্থান নেই ; বিভিন্ন কবির কবিতা সম্বন্ধে কিছু বর্ণনা ও বিবরণ দিয়েই তিনি কর্তব্য সমাপন করেছেন, কবিতার বিচার তিনি করেন নি, ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ করেন নি, এমনকি কবিতার রসাস্বাদনে পাঠককে কোনোরকম সাহায্য পর্যন্ত করেন নি অথবা কোনো কোনো আলোচ্য কবি সম্বন্ধে প্রচলিত বা কোনও বিশেষ ভ্রান্ত ধারণা নিরসনের প্রয়াসও তিনি পান নি। এসবে নিরস্ত থেকেছেন বলে কাব্যবিচারের কোনও নিরিখ বা মানদণ্ড প্রতিষ্ঠাও তিনি করেন নি। যতীন্দ্রনাথ বা মোহিতলাল বা নজরুলকে এ-গ্রন্থের অন্তর্গত করবার সার্থকতা কী তা শেষ পর্যন্ত জানা যায় না, কেননা কোন্ "ঐক্যসূত্রে" এঁরা তথাকথিত রবীন্দ্রানুসারীদের তালিকাভুক্ত হয়েছেন তা একবারও জানানো হয় নি। একথাও আমার মনে হয়েছে যে একমাত্র শ্রীসজনীকান্ত দাস ব্যতীত এই গ্রন্থে আলোচিত অন্যান্য কবিদের সম্বন্ধে লেখক যথার্থই শ্রদ্ধাশীল কিনা।

তবুও "রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজ" কিছু সাধুবাদ প্রত্যাশা করতে পারে। কারণ আলোচ্য কবিদের কারও সম্বন্ধে মোহিতলাল, প্রমথনাথ বিশী, শশীভূষণ দাশগুপ্ত, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ সুধীবর্গ উচ্চস্তরের প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন বটে, কিন্তু সেইসব আলোচনাকে একত্রে এরূপ গ্রন্থাকারে সংকলন তাঁরা কেউ করেন নি ; তদুপরি একসঙ্গে এই তেরোজন কবির রচনা সম্বন্ধে আলোচনাও অন্য কারও বইয়ে নেই। আবার ওইসকল বিশিষ্ট সমালোচকের বিভিন্ন মতামত এই গ্রন্থে উদ্ধৃত হওয়াতে যে সকল ছাত্রদের পক্ষে অধিক শ্রম সম্ভব নয় তাঁদের পক্ষে বইটি বেশ উপযোগী হয়েছে। এ-বইয়ের পাতা ওলটাতে ওলটাতে আলোচ্য কবিদের রচনাবলীর পাতা ওলটাবার আগ্রহ যে কারও জাগবে না, তা-ই বা বলি কী করে? যদি কারও আগ্রহ না জাগে তবে এরকম আশা নিশ্চয়ই করা যেতে পারে যে, এ-বইয়ের কোনো কোনো পাঠক হয়তো আলোচ্য কবিদের রচনাবলীর পাতা ওলটাবার প্রয়োজন বোধ করবেন। অবশ্য এ-বইয়ের সীমাবদ্ধতায় অতৃপ্ত কোনও পাঠক যদি সার্থকতর কোনও গ্রন্থ একই প্রসঙ্গে লিখতে উদ্বুদ্ধ হন তাহলে সেটাই হবে এ-বইয়ের সবচেয়ে বড়ো সার্থকতা।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতা

চিত্ত ঘোষ

প্রেমেন্দ্র মিত্র বাংলাদেশের প্রথম আধুনিক কবিদের একজন, প্রধান আধুনি কবিদের অন্যতম। এবং দ্বিতীয়ের বিচারে তিনি অদ্বিতীয় না হলে নিঃসন্দেহে অবিস্মরণীয়। তাঁর প্রাধান্য অবিসংবাদী, খ্যাতি দূরবিস্তৃ সেদিনের তপ্ত তরুণ কবি আজ প্রৌঢ়, শান্ত। তাঁর কাছে আমাদের প্রত্যা এখনো অনেক। কিন্তু প্রাপ্তি ততখানি কই? এ আক্ষেপ এজন্য যে তিনি বেশি রকম বিরল। অথচ তাকে সৃষ্টির সংহত মিতাচার বলা বোধ হয় ঠি হবে না। তাঁর সময়ের কবিরা—তাঁদের সকলে না হলেও কেউ কেউ, এখন কবিতা রচনায় অনলস, অক্লান্ত। আর প্রেমেন্দ্র মিত্র—এমনিতেই কম-লে যাঁর স্বভাব—এখন প্রায় না-লেখার পর্যায়ে পৌছে ক্বচিৎ কখনো ওপা হাঁটেন। তাঁর কবিতা ডুমুরের ফুলের মতো কালেভদ্রেই ফোটে, আমাদে চোখে পড়ে। আর সেইসব কালেভদ্রে লেখা কবিতা কুড়িয়ে-বাড়িয়ে বা হয়, যে বই হাতে পেতে আমাদের আগ্রহের অন্ত থাকে না, যে বই হাতে পে আমাদের অভিজ্ঞতায় নতুন অধ্যায় সংযুক্ত হয়।*

কবিতায় কি পেয়েছি আর কি পাই নি তার হিসেব মেলানো পণ্ডশ্র কেননা পাওয়ার হিসেব যদি বা মেলে না-পাওয়ার হিসেব কোনোদিন মিল না। তাছাড়া একথা বিদিত যে প্রেমেন্দ্র মিত্র, যাঁর ক্ষমতা অত্যন্ত উজ্জ্বল এব বহুমুখী, তাঁর সেই ক্ষমতার অনেকখানি অন্যত্র অন্যভাবে ব্যয়িত। এবং এ সংসারের সেই ব্যয়ভার আরেক সংসারকে উন না করলেও দুনো করে নি তাঁর কবি-স্বভাব চিরকালই প্রাণময়, স্নিগ্ধ সজীব। গদ্য পদ্য উভয় রচনা তিনি প্রায় জন্মসিদ্ধ। এবং কবিতায় তিনি প্রেরণায় বিশ্বাসী। পরন্তু পরিণামদ হওয়া কোনোদিনই তাঁর ধাতে সয় নি। ফলে বিশেষ করে কবিতা লেখা তিনি তাঁর হৃদয়ের ওপর যতটা ভর রেখেছেন আর কিছুর ওপর ততট নয়। স্বভাবের অভাব কবিতাকে কৃত্রিম করে, ভারাক্রান্ত করে। প্রেমে

---

* হরিণ চিতা চিল॥ প্রেমেন্দ্র মিত্র। ত্রিবেণী প্রকাশনী। তিন টাকা।

মিত্রর কবিতা সে ভার থেকে মুক্ত, স্বচ্ছন্দ, লঘুসঞ্চারী। এবং এ-সম্পর্কে তাঁর নিজের মনোভাব বোধহয় একটি অনূদিত কবিতার স্তবকে নিহিত।

নিরেট সত্য নিখুঁত মাধুরী
ছাপানই পাবে কিনতে
শুধু নির্যাস চায় না হৃদয়
পুষ্প তরুর বৃন্তে। (খুঁত)

তিনটি নয়, তিরিশটি কবিতা নিয়ে 'হরিণ চিতা চিল'। তার মধ্যে চারটি চীনদেশী কবিতার অনুবাদ। হরিণের চোখ, চিতার ডোরাকাটা চামড়া আর খয়েরী চিলের ডানা—এর কোনো একটি বইয়ের কোনো না কোনো কবিতায় সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনায় উপস্থিত। এবং পরদেশী কবিতাও যে সার্থক অনুবাদকের হাতে পড়লে দূরত্ব হারায় অনূদিত কবিতাগুলো তারই সাক্ষীসাবুদ।

"হরিণ চিতা চিল" পড়লে প্রেমেন্দ্র মিত্রকে চেনা যায়, পাওয়া যায়। আগের চেয়ে খুব বেশি বদলান নি বলেই চেনা যায়। বোঝা যায় যেমন আগে ছিলেন তেমনি এখনো তিনি কয়েকজনের জন্য নয়, অনেকজনের জন্য কবিতা লেখেন। কবিতার জন্য একটি বিশেষ জায়গা বেছে নিয়ে শুধু সেখানকার মানসিক খননকার্যে তিনি রত নন। পরন্তু যোগসূত্রে অনেকের সঙ্গেই তাঁর জানাশোনা। তাঁর পরিচয়ের পরিধি বিস্তৃত। অনুভব করা যায় বাংলা-দেশের মাটিতে, এখানকারই জলহাওয়ায় তাঁর কবিতার জন্ম ও বিকাশ। মাটির গন্ধ, জলের স্বাদু, গাছপালার স্নিগ্ধ শ্যামশ্রী, আরো অনেক কিছুর অব্যক্ত স্বাদ ও বেদনা তাঁর কবিতায়, কবিতার শব্দে, চিত্রে, ধ্বনিতে বাসা বেঁধেছে এবং তা এত গভীর যে আমরা দিনের পর দিন কলকাতায় থেকে হঠাৎ যখন এমন লাইন বা স্তবক পড়ি :

১। শস্যের তরঙ্গে-ঘেরা গ্রাম (দাম)

২। উড়ো হরিয়াল ঝাঁক বাবলা বন সবুজ বিদ্যুতে
ছুঁয়ে গেল। (ট্রেনের জানলায়)

৩। বৃষ্টি হ'ক অন্য দিগন্তের
আমি শুধু বাতাসের স্পর্শে পাই
আর্দ্র কোমলতা (অনাবিষ্কৃত)

তখন একান্তভাবে মনের মধ্যে নস্ট্যালজিআর অনুভূতি জাগে। স্মৃতি বেদনায় মনের শিকড়ে টান লাগে।

এমনি এক আর্দ্রতায় 'হরিণ চিতা চিল'-এর কবিতাগুলো স্বচ্ছ কোমল ঘনিষ্ঠ। তার জলের নীচে মাটি যেন হাতে পাওয়া যাবে। কিন্তু এ কোমলত্ব জীবনের বসতি থেকে দূরে গিয়ে প্রেমেন্দ্র মিত্রকে পেতে হয় নি। বরং তার নাগালের মধ্যে তার ভয়-ভাবনাকে হাতে ছুঁয়েই তিনি পেয়েছেন।

পায়ে পায়ে এই জড়ানো শহর
ভয়ে ভয়ে চোখ তোলা
খুঁজে পেতে হবে হয়তো দুয়ার
আরেক আকাশ খোলা। (তেরো নদী)

একজন সার্থক গল্প লেখক বলেই বোধহয় একটা সূক্ষ্ম বাস্তবতাবোধকে কবিতায় সঞ্চারিত করা প্রেমেন্দ্র মিত্রর বেশি করে সম্ভব হয়েছে। সময়ের ও সমাজের পটভূমিতে জীবন, জীবনের পরিবর্তন প্রেমেন্দ্র মিত্র দেখেছেন, এঁকেছেন। তাঁর কবিতায় সমস্যার সঙ্গে সংগীতের বিরোধ নেই। এবং তাঁর হৃদয়ে সংবেদন যেহেতু গভীর এবং অভিজ্ঞতা যেহেতু বিস্তৃত সেইহেতু বেশির ভাগ মানুষের দুঃখ শোক তাঁর কাছে বেগানা নয়। তার প্রমাণ ভস্মলোচন: একটি অনবদ্য ছড়া।

কোন মুলুকে চরে জানো
ভস্মলোচন হায়না
মড়া চিবোয়, আধমরাদের ;
জ্যান্ত ভয়ে খায় না।

* * *

ও মড়া তুই জাগবিনে
থাকবি পড়ে ডাস্টবিনে। (ভস্মলোচন)

আমাদের জীবনের হালচাল, প্রকারপদ্ধতি, নর্মকর্ম সব মিলিয়ে যার নাম সভ্যতা—সেই কৃত্রিম কুলটা সভ্যতার প্রতি প্রেমেন্দ্র মিত্রর দুঃসহ বিরাগ। এই বিরাগ বহুদিনের আশ্রিত এবং প্রায় তাঁর কবিতা লেখার সমবয়সী। অনেক অলসমনাও যে কবিতার কথা ভুলতে পারেন না, সেই "নীলকণ্ঠ" কবিতায় "কৃমিকীটের সভ্যতা গড়ার" এবং "দীর্ঘ পরমায়ু লালনের" নিরর্থকতা

ব্যক্ত। 'হরিণ চিতা চিল' কবিতাটিতেও একই বিরাগ সংক্রামিত হয়েছে। স্বাভাবিকতার প্রতি তাঁর এমন আকর্ষণ যে 'অশথ কেটে বসত করতেও' তাঁর মনের সায় নেই। বরঞ্চ সেজন্য আক্ষেপই প্রবল।

ওদিকেও সেই পিচের রাস্তা অজগর গ্রামে খুঁজবে
বনের সবুজ গাঢ় মগ্নতা
লাঙলে, কুড়ুলে ভ্রষ্টা (হরিণ চিতা চিল)

একথা আবার বলার মতো যে প্রেমেন্দ্র মিত্র কবিতায় বুদ্ধির চেয়ে হৃদয়কে বেশি প্রযুক্ত করেছেন। আবেগ থেকে মুক্ত হয়ে নয়, তার সঙ্গে যুক্ত হয়েই তাঁর কবিতার বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য। এমন চতুরালির পক্ষপাতী তিনি নন যা মনে ধন্দ লাগায়। এমন ছলাকলার প্রয়োগে তাঁর উৎসাহ নেই যা ঠকিয়ে খুশি করে। কর্ম ও বিশ্বলোকের সঙ্গে তিনি গভীরভাবে যুক্ত এবং অদৃশ্য অন্তর্লোক তাঁর কবিতায় নিশ্চয়ই মাঝে মাঝে উদ্ভাসিত কিন্তু তিনি শুধু তার প্রতি তন্নিষ্ঠ নন, সেজন্য তাঁর কবিতার তুলনা তরঙ্গের সঙ্গে যতটা মানায় স্রোতের সঙ্গে ততটা নয়।

কবিতার গঠনে প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁর হৃদয়ের উপযোগী এমন এক রচনা-রীতির পক্ষপাতী যা একান্তই সহজাত, যার লাবণ্য প্রসাধনের ওপর নির্ভর না করেও আমাদের দৃষ্টি কাড়ে। এ রীতি সচেতন পরিশ্রম আর চর্চার মিলিত যোগফল নয় বরং তাঁর একান্ত অনুভব ও প্রতীতির বিশ্বস্ত বাহন। ফলে তাঁর কবিতায় প্রকার কখনো প্রধান নয় এবং তাঁর বাহনরা অত্যন্ত মৃদুস্বভাব, আত্মঘোষণার তীব্র উচ্চারণে অনভ্যস্ত। তাঁর কবিতার সঙ্গে ভাস্কর্যের মিল নেই, মধুর আশ্চর্যের মিল আছে। সেজন্য তৎসম শব্দের ব্যবহার তাঁর কবিতায় কম। কিন্তু প্রয়োজনে ক্লাসিক রচনারীতির গাম্ভীর্য ও ঐশ্বর্য সৃষ্টিতে তিনি যে সমান পারদর্শী তার প্রমাণও হাতের কাছেই আছে।

ইতিহাস-মুগ্ধ-করা উজ্জয়িনী রূপসী নগরী
জানিনাক কোথা কোন কুটীর অঙ্গনে তার বসে
আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে
দেখেছিল নীলোৎপল পত্রকান্তি
প্রথম যে প্রাবৃটের মেঘ। (কালিদাস)

কিছুটা অবান্তর হলেও এ প্রসঙ্গে একটা কথা মনে হয়েছে। মনে হয়েছে বাংলাদেশের প্রথম আধুনিক কবিরা—তাঁদের প্রায় সকলেই নিজেদের বৈশিষ্ট্য বিকীর্ণ করে ক্লান্ত, কেউ কেউ স্তব্ধ। রবীন্দ্রনাথ তাঁর দীর্ঘ দীপ্ত জীবনে কক্ষ থেকে কক্ষান্তরে গেছেন কত অনায়াসে। এক অধ্যায় থেকে আরেক অধ্যায়ে তাঁর উত্তরণ কত সিদ্ধ। সেই অনায়াস, সেই বৈচিত্র্য যেন এখনকার কবিতায় সুদূর। সেকালের আধুনিক কবিরা এখন আর তেমন নেই যেমন তাঁরা ছিলেন আরম্ভে, তা হয়তো থাকাও যায় না। আর রবীন্দ্রনাথ অশেষ আরম্ভের কবি। অবশ্য এ সব উক্তির সার্থকতা তর্কসাপেক্ষ এবং তার মীমাংসার ক্ষেত্র এতদূর প্রসারিত নয়।

'হরিণ চিতা চিল'-এ স্মরণীয় কবিতার সংখ্যা কম নয়। তারা প্রত্যাশী মনে সুস্বাদ ছড়াতে সহজেই সক্ষম। অবশ্য প্রেমেন্দ্র মিত্র কবিতার লক্ষ্য শুধু ভেদই করেছেন, একবারও ভ্রষ্ট হন নি এমন নয়। এমন কখনো হয়ও না। এবং সব মিলিয়েই তিনি তাঁর উপলব্ধির হার্দ্য বিন্যাসে বাংলা কবিতায় উজ্জ্বল, সজীব। তিনি যাই করুন তাঁর কাছে বাংলা কবিতার পাওনা কোনোদিন মিটবে না।

তবু তেরো নদী
চাই না খুঁজতে
কোথাও তেপান্তরে
শুধু থাক তার মায়ার কাজল
নয়নে ও অন্তরে।

(তেরো নদী)

বাংলা কবিতার ঋতুবদল

মণীন্দ্র রায়

কবিতা কী, কেমন করে কবিতা লেখা হয়, আধুনিক কবিতা কাকে বলব, কাব্য-সমালোচনার যোগ্যতা কেন এত দুর্লভ—এইসব জটিল বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন লেখক।* এবং সেই আলোচনালব্ধ সিদ্ধান্তগুলিকে সামনে রেখে তিনি বাংলা কবিতার আধুনিক পর্যায়ের উৎকর্ষবিচারে ব্রতী হয়েছেন।

শ্রীঅরুণ ভট্টাচার্য নিজে কবিতা রচনায় উৎসাহী। পাঠক হিসেবেও তাঁর সহৃদয়তা বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত। উপরন্তু তিনি কাব্য-সাহিত্যের ইতিহাস এবং রসশাস্ত্রের নির্দেশগুলির বিষয়েও যথেষ্ট ওয়াকিবহাল। ফলে তাঁর বইখানি ছাত্রপাঠ্য কেতাবের বাঁধা সড়ক এড়িয়ে অনেকটা নিজের পথে এগোতে পেরেছে। বিশেষ করে সমালোচকের দায়িত্ব-বিষয়ে তাঁর সংবেদনশীল মন্তব্য অত্যন্তই আশান্বিত করে তোলে। এবং বইয়ের দ্বিতীয়-ভাগে বাংলা কবিতার আলোচনায় তাঁর অভিনিবেশ ও সূক্ষ্মদৃষ্টিতে আশ্বস্ত বোধ করি।

কিন্তু, দুঃখের বিষয়, সে-আশ্বাস সর্বত্রই প্রতিপালিত হয়েছে, তা বলতে পারি নে। প্রথম খটকা লাগে এইটে লক্ষ্য করে যে, তিনি 'সহৃদয়তার' বিষয়ে বারবার উল্লেখ করেও পক্ষপাতহীন থাকতে পারেন নি। ফলে জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অমিয় চক্রবর্তী, এমনকি বুদ্ধদেব বসু বা সঞ্জয় ভট্টাচার্যের বিষয়ে তিনি যতখানি মমত্ব দেখান, বিষ্ণু দে বা সমর সেনের বিষয়ে সেরকম ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেন না। সমর সেনের বিষয়ে তবু তাঁর কিছুটা উৎসাহ আছে, বোধ করি তিনি আর লিখছেন না বলে, কিন্তু বিষ্ণু দে-র ক্ষেত্রে লেখক যে মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন তা প্রায় ডিবেটিং ক্লাবের বক্তৃতার মতো একপেশে। এবং সমস্ত বইটি পড়লে মনে হতে থাকে, বিষ্ণু দে আকস্মিকভাবে দু-চারটি ভালো কবিতা লিখেছেন বটে, কিন্তু তিনি সঞ্জয় ভট্টাচার্যের চাইতেও ছোট কবি। কোনো দেশে ছোট-বড়-মাঝারি সবরকম কবিই থাকতে পারেন, এবং তাঁদের সীমাবদ্ধতা মেনে নিলেই তাঁদের প্রতি প্রকৃত মর্যাদা দেখানো হয়। সেদিক থেকে, উল্লেখ করেছি বলেই বলছি, সঞ্জয় ভট্টাচার্যের ইদানীং কালের কবিতাগুলির

*কবিতার ধর্ম ও বাংলা কবিতার ঋতুবদল॥ অরুণ ভট্টাচার্য। জিজ্ঞাসা। ৭॥ টাকা।

আমি নিজেও অনুরাগী পাঠক। তেমনি আরো অনেকেরই। কিন্তু বিচ্ছিন্নভাবে নয়, আধুনিক বাংলা কবিতার ধারাবাহিক আলোচনায় হয়, তখন ব্যক্তিগত বা বাম-দক্ষিণপন্থাগত এলার্জির বিষয়ে সতর্ক খোলা মনে অগ্রসর হওয়া কর্তব্য বলে বিবেচনা করি।

লেখক এ-কথা অনেকবার ব্যক্ত করেছেন যে, কবির সঙ্গে বৃহত্তর মানসের সংযোগ আছে। কিন্তু সামাজিক সম্পর্কের গোড়ায় যে অর্থনৈ বিন্যাসের টানাপোড়েন ক্রিয়াশীল, সে-বিষয়ে তিনি নিশ্চেতন বলে মনে তা না হলে সমর সেনের কবিতার আলোচনায় কী করে লিখলেন, সমর কবিতা লিখেছেন তখন "দেশে কোনোরকম রাজনৈতিক গোলোযোগ রোজ মাথাচাড়া দেয় নি।" কিংবা "প্রথম মহাযুদ্ধের কোনো প্র অবশ্য আমাদের দেশে পড়ে নি, যাতে এ-দেশের সমাজমানসে বড়ো রকমের পরিবর্তন আসতে পারে।" স্বদেশের ইতিহাসে জিজ্ঞাসু মাত্রেরই অভিজ্ঞতা অবশ্য অন্যরকম। তিরিশের যুগের এপারে-ও দৃষ্টিপাত করলে আমরা শ্রমিক আন্দোলন, ২৯ সালের মন্দার ঢেউ, গান্ধী আন্দোলন, দেশনেতাদের গ্রেপ্তার, সারা দেশে অস্থির গতিহীনতা, সন্ত্রাসবা উন্মত্ত প্রতিরোধ, কৃষাণ আন্দোলন, মধ্যবিত্তের দারুণ আশাভঙ্গ ইত্যা যে জটিল বিন্যাস দেখতে পাই, সমর সেনের (এবং আরো অনেকে কবিতার বিচার কেবল সেই পটভূমিতেই সম্ভব। তা না করে "আমাদের সামাজিক মূল্যবোধ উনবিংশ শতকের মূল্যবোধের নিশ্চিতরূপেই পৃথক হয়ে যাচ্ছিল" বললে জলে না নেমে সাঁতার ক মতোই হাস্যকর শোনায়।

এত কথা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, অরুণ ভট্টাচার্য অত্যন্ত পরি এবং যত্নবান সমালোচক। জীবনানন্দ দাশের বিষয়ে তাঁর মতামতে অন পর্যন্ত সহযাত্রী হওয়া যায়। তেমনি, তাঁর ব্যক্তিগত পছন্দ সত্ত্বেও বিস্মৃত হন নি যে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত বা অমিয় চক্রবর্তী মূলত রবীন্দ্র-প্রভা কবি; কিংবা বুদ্ধদেব বসু যে জীবন সম্বন্ধে কোনো স্থির ধারণা পারেন না, এ কথাও তিনি অকপটে ব্যক্ত করেছেন। প্রেমেন্দ্র মি বিষয়ে অবশ্য তিনি তেমন কিছু আলোকপাত করতে পারেন নি। বিবেচনায় তিনি গভীরতর অভিনিবেশের দাবি রাখেন।

যাহোক, লেখক যতদূর পর্যন্ত সফল হয়েছেন, সেইজন্যেই তাঁকে জানাই। পরবর্তী চিন্তার দায়িত্ব অবশ্যই পাঠকের। আর পা প্রবুদ্ধ করে তোলাই যেহেতু সমালোচনাগ্রন্থের প্রধান সার্থকতা, বইখানি যে অনেক পরিমাণে সফল হয়েছে তাও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে করছি।

রমেশচন্দ্র দত্তের প্রবন্ধ-রচনাবলী

রবীন্দ্র মজুমদার

"বঙ্কিমবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—যদি বাঙ্গালা পুস্তকে তোমার এত ভক্তি ও ভালবাসা, তবে তুমি বাঙ্গালা লিখ না কেন? আমি বিস্মিত হইলাম! বলিলাম,—আমি যে বাঙ্গালা লিখা কিছুই জানি না। ইংরাজি বিদ্যালয়ে পণ্ডিতকে ফাঁকি দেওয়াই রীতি, ভাল করিয়া বাঙ্গালা শিখি নাই, কখনও বাঙ্গালা রচনাপদ্ধতি জানি না! গম্ভীর স্বরে বঙ্কিমবাবু উত্তর করিলেন,—রচনাপদ্ধতি আবার কি,—তোমরা শিক্ষিত যুবক, তোমরা যাহা লিখিবে, তাহাই রচনাপদ্ধতি হইবে! তোমরাই ভাষাকে গঠিত করিবে! এই মহৎ কথা আমার মনে বরাবর জাগরিত রহিল,—তাহার তিন বৎসর পর আমার বাঙ্গালা ভাষায় প্রথম উদ্যম 'বঙ্গবিজেতা' প্রকাশ করিলাম।"

এর পর বছর পাঁচেকের মধ্যে (১৮৭৪-১৮৭৯) ক্রমান্বয়ে প্রকাশিত হল রমেশচন্দ্রের মাধবীকঙ্কণ, জীবন-প্রভাত, জীবনসন্ধ্যা। সংসার আর সমাজ প্রকাশিত হয় বেশ কিছুকাল পরে—১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি যখন ঋগ্বেদের বাঙলা অনুবাদ শুরু করেন, তারও পরে।

ঋগ্বেদের এবং অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থের ও পুরাণগ্রন্থের বাংলা অনুবাদ রমেশচন্দ্রের এক মহৎ কীর্তি। তাঁর আরেকটি মহৎ কীর্তি 'দি ইকনমিক হিস্ট্রি অফ ইণ্ডিয়া: ১৭৫৭-১৮৩৭'। বাস্তবিক পক্ষে, ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস অনুশীলনে রমেশচন্দ্রের এই গ্রন্থটি এবং 'দি পেস্যান্ট্রি অফ বেঙ্গল,' আর 'ইণ্ডিয়া ইন দি ভিক্টোরিয়্যান এজ'—এই তিনটি গ্রন্থ আজও পর্যন্ত অপরিহার্য আকরগ্রন্থ হয়ে আছে।

রমেশচন্দ্রের মননশীলতা ছিল নানা বিষয়ে বিস্তৃত, চিন্তার ও গবেষণার নানা ক্ষেত্রে পরিব্যাপ্ত—যেটা আমাদের দেশে উনবিংশ শতাব্দীর মনীষার একটি বড়ো বৈশিষ্ট্য। বাংলা সাহিত্যের ও প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা-

রমেশচন্দ্র দত্ত: **প্রবন্ধ-সংকলন**॥ সম্পাদনা: নিখিল সেন, এভারেস্ট বুক হাউস। পাঁচ টাকা।

সংস্কৃতির ইতিহাস রচনা, ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ, রামায়ণ মহাভারতের সংক্ষি ইংরেজী কাব্যানুবাদ ইত্যাদি শ্রমসাপেক্ষ কাজ যে তিনি এরকম এক কর্ম জীবনে কি করে করে উঠতে পেরেছিলেন তা ভেবে বিস্মিত না হয়ে পারা না। আর, সেই সঙ্গে তিনি ইতিহাস সাহিত্য অর্থনীতি পুরাতত্ত্ব প্রশাসনি ব্যবস্থা শিক্ষাসমস্যা ইত্যাদি নানা বিষয়ে ইংরেজীতেও বাংলায় অসংখ্য প্র লিখেছেন বিভিন্ন সময়ে। উনবিংশ শতাব্দীতে আমাদের দেশের মনীষী মধ্যে যে চিন্তার ও কর্মের বহুমুখীনতা লক্ষ্য করা যায়, রমেশচন্দ্রের রচনাবলী কর্মজীবন নিশ্চয়ই তার একটি প্রতিনিধিস্থানীয় উদাহরণ।

কর্মজীবনে তিনি ছিলেন সুদক্ষ সিভিলিয়ান। বিলেতে গিয়ে সিভি সার্ভিস পরীক্ষায় রমেশচন্দ্র ৩২৩ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে তৃতীয় স্থান অধি করেন। (সেই বারেই সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন পরবর্তীকালে বিখ্যাত ইতিহাসবিদ ভিন্‌সেন্ট স্মিথ ও রাজনৈতিক নেতা সুরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।) ম্যাজিস্ট্রেট, কালেকটর আর বিভাগীয় কমিশনার হিসে রমেশচন্দ্র যেমন সর্বাঙ্গীণ যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন, তেমনি বন্যা ও দুর্ভি দমনে, প্রজাস্বত্ব আইনের সংশোধনে, চৌকিদারি আর পঞ্চায়েত প্রথা সম্প সিডিশন ল'র বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপনে, ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল বি রচনায় তিনি আশ্চর্য বিদ্যাবত্তা এবং তথ্যনিষ্ঠ অনুসন্ধানী মনের আর মৌলি দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন। সেই সঙ্গে দিয়েছেন এক নির্ভীক ও প্র ব্যক্তিত্বের পরিচয়। অথচ এইসব প্রবন্ধে তিনি লেখনীর সংযম আর যুক্তি থেকে কোথাও বিচ্যুত হন নি, ভাবালু উচ্ছ্বাসের স্রোতে গা ভাসান নি।

রমেশচন্দ্র প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণীয় ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসের লা অধিবেশনের সভাপতি হিসেবে প্রদত্ত তাঁর ভাষণ এবং ডিসেনট্রালাইজেশ সদস্য হিসেবে তাঁর রচিত ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনব্যবস্থার ও সংবিধান কাঠামো। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রতিষ্ঠায় এবং এর প্রথম সভাপতি হিসে তাঁর কর্মোদ্যোগ; লণ্ডন ইউনিভর্সিটি কাউন্সিলের অধ্যাপক হিসেবে প্র ভারতীয় ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর বক্তৃতামালা; বরোদা রাজ্যের দেওয় হিসেবে তাঁর রচিত অনেকগুলি অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেটিভ রিপোর্ট; এনসাইক্লোপিডি ব্রিটানিকায় (১৯০২) রামমোহন বিদ্যাসাগর মধুসূদন বঙ্কিমচন্দ্র প্র সম্পর্কে তাঁর লেখা প্রবন্ধ ইত্যাদি রমেশচন্দ্রের কর্মজীবন ও সাহিত্যজী আলোচনায় অবশ্য স্মরণীয়।

রমেশচন্দ্র ইংরেজীতেই ঢের বেশি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। বাংলায় লেখা তাঁর প্রবন্ধের সংখ্যা সম্ভবত গোটা কুড়ি-বাইশের বেশি নয়। এই স্বল্প-সংখ্যক প্রবন্ধও এতদিন পর্যন্ত—অর্থাৎ রমেশচন্দ্রের মৃত্যুর পরে এই পঞ্চাশ বছরেও—গ্রন্থাকারে সংকলিত হয় নি। ভারতী, নব্যভারত, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, সাধনা, প্রভাত, নবজীবন ইত্যাদি তৎকালীন সাময়িক পত্রিকাগুলির পৃষ্ঠাতেই এগুলি ছড়িয়ে ছিল। রমেশচন্দ্রের যে-চোদ্দটি প্রবন্ধ এইসব সাময়িক পত্রিকা থেকে সংগ্রহ করে শ্রীনিখিল সেন এই গ্রন্থে মুদ্রিত করেছেন, সেগুলির মধ্যে রমেশচন্দ্রের সেই বহুমুখী মনীষার অনেকখানি পরিচয় পাওয়া যাবে।

এই গ্রন্থে সংকলিত চোদ্দটি প্রবন্ধের মধ্যে চারটি সাহিত্য-আলোচনা: বঙ্কিমচন্দ্র ও আধুনিক বঙ্গীয় সাহিত্য; মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্র; কবি কালিদাস; কবি ভবভূতি। আর, দুটি স্মৃতিকথা: বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়; ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। 'কবি কালিদাস' প্রবন্ধটিতে কালিদাসের কালনির্ণয় প্রসঙ্গে অতি মূল্যবান কতকগুলি ঐতিহাসিক তথ্য পরিবেশন আর বিশ্লেষণ করা হয়েছে। কালিদাসের নাটকগুলির প্রাকৃত ভাষা আর অন্যান্য ঐতিহাসিক সাক্ষ্য বিচার করে রমেশচন্দ্র বিজ্ঞানীর মন নিয়ে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে দ্বিধা করেন নি—"অতএব কালিদাস যে খ্রীষ্টের জন্মের ৫৬ বৎসর পূর্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন এ বিশ্বাস অগত্যা ত্যাগ করিলাম। কালিদাস খ্রীষ্টের পর ষষ্ঠ শতাব্দীর লোক।" সেই সময়ে প্রচলিত ভারতীয় সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রাচীনত্বের মোহে তিনি খ্রীষ্টপূর্ব যুগে কালিদাসের স্থান নির্দেশ করেন নি। সেই সঙ্গে, নবীনচন্দ্র দাস-কৃত রঘুবংশের ছন্দানুবাদ থেকে একটি উল্লেখযোগ্য অংশের উদ্ধৃতি দিয়ে রমেশচন্দ্র নিজের বক্তব্যের সমর্থনে তৎকালীন ভারতবর্ষের সামাজিক পটভূমিকে স্পষ্টতর করে তুলেছেন। 'কবি ভবভূতি' প্রবন্ধেও রমেশচন্দ্রের সেই ঐতিহাসিক তথ্যনিষ্ঠার পরিচয় সুস্পষ্ট।

কালিদাস-প্রসঙ্গে রমেশচন্দ্র লিখেছেন, "অন্যান্য দেশের ইতিহাসের সহিত ভারতবর্ষের ইতিহাস তুলনা করিয়া পাঠ করিলে আমরা জগতের ইতিহাস বুঝিতে পারি, এবং ঘটনাবলীর পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ ও নিয়মগুলি স্থির করিতে পারি।" ভারতীয় ইতিহাসের সঙ্গে বিশ্ব-ইতিহাসের তুলনা করে সেই পারস্পরিক সম্বন্ধ নির্ণয়ের চেষ্টায় রমেশচন্দ্র 'উন্নতির যুগ' প্রবন্ধে মানব-

সভ্যতার অগ্রগতিকে মোটামুটি সাতটি ভাগে ভাগ করে বলেছেন, "… এই যুগ কয়েকটির বিশেষ বিবরণ অবগত আছেন তিনি মনুষ্যের … ইতিহাস হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন ; কেবল যুদ্ধবর্ণনা ও সম্রাটদি… নামাবলী প্রকৃত ইতিহাস নহে।"

সামাজিক-অর্থনৈতিক বিষয়ে লেখা ছটি প্রবন্ধ এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে… ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যা ; ব্রিটিশ শাসনে ভারতীয় শিল্পের অবনতি… ভারতীয় দুর্ভিক্ষ ; বঙ্গদেশে রাজস্ব বন্দোবস্ত ; ভূমিকর আন্দোলনের ফলাফল… ভারতবাসীদিগের দরিদ্রতা ও দুর্ভিক্ষের কারণ। এইসব প্রবন্ধে রমেশ… তাঁর গভীর অর্থনৈতিক আর ঐতিহাসিক জ্ঞান নিয়ে অজস্র তথ্য দি… দেখিয়েছেন—ইংরেজ আমলে কিভাবে ভারতীয় জনসাধারণের দু… বেড়েছে ; কিভাবে ইংরেজ শোষণে আমাদের জাতীয় ঋণের পরিমাণ ১৮… ৫০ কোটি টাকা থেকে ১৯০০-তে ৩০০ কোটি টাকায় গিয়ে দাঁড়াল ; কি… ভাবে ভারতীয় ইণ্ডাস্ট্রির গলা টিপে ধরে পেসলি-ম্যাঞ্চেস্টার ফুলে … উঠল ; কিভাবে ইংরেজ মিল-মালিকদের "ভারত হইতে বার্ষিক অর্থলা… বিগত ৪০ বৎসরে ২ কোটি টাকা হইতে ২৫ কোটি টাকায় দাঁড়াইয়াছে… এই সব প্রবন্ধে তিনি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ সংযত আর সুস্পষ্ট ভাষায় ইং… সরকারকে ভারতের অর্থনৈতিক দুরবস্থার জন্যে দায়ী করতে … করেন নি।

দেশের শাসনব্যবস্থায় দেশবাসীর যথার্থ কোনো প্রতিনিধিত্ব নেই, … রমেশচন্দ্রকে পীড়া দিয়েছে। তখনকার লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের কয়েক… মাত্র সদস্য দেশবাসীদের দ্বারা নির্বাচিত হতেন এবং এই নির্বাচন-ব্যবস্থাও … অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। রমেশচন্দ্র বারবার দাবি তুলেছেন, "এই নির্বাচন-প্র… বিস্তৃত হউক, প্রত্যেক জেলা হইতে প্রতিনিধি ব্যবস্থাপক সভায় প্রে… হউক।…সকল প্রদেশেই একটি করিয়া কার্যনির্বাহক সভা (এক্সিকিউটি… কাউন্সিল) স্থাপিত হউক।" দেশের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানে রমেশ… অন্যান্য যেসব পথনির্দেশ করেছেন, সেগুলির মধ্যে প্রধান হল : জা… ঋণ আর 'হোম চার্জ' কমানো চাই ; ভারতের পক্ষে অপ্রয়োজনীয় … সেনাবাহিনীর ভরণপোষণের ব্যয় বেশির ভাগ বহন করতে হবে ইংল্যাণ্ড… ভূমিরাজস্ব আরও কমাতে হবে এবং ভূমিকর একটা নির্দিষ্ট সীমায় … দিতে হবে ; এ দেশের নিজস্ব শ্রমশিল্পোন্নয়নকে সর্বতোভাবে উৎসাহিত …

তুলতে হবে। কংগ্রেস-সভাপতি হিসেবে তাঁর ভাষণেও তিনি এসব কথা বলেছিলেন।

এই গ্রন্থের বোধহয় সবচেয়ে মূল্যবান প্রবন্ধ 'ঋগ্বেদের দেবগণ।' ১৮৮৫-৮৬ সালে 'নবজীবন' পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত এই দীর্ঘ প্রবন্ধটিকে ঋগ্বেদ পাঠের বিস্তৃত ভূমিকা বলা যেতে পারে। এই গ্রন্থের সম্পাদক বলেছেন, রমেশচন্দ্রই বোধহয় বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম বেদ ও অর্থনীতি বিষয়ক দুরূহ বিষয়ের সক্ষম আলোচনা শুরু করেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের এবং বিশেষত ঈশ্বরচন্দ্রের উৎসাহে রমেশচন্দ্র যখন ঋগ্বেদ সংহিতার অনুবাদের কাজে হাত দেন, তখন তাঁকে রক্ষণশীল গোঁড়া হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রবল বিরোধিতার মুখোমুখী হতে হয়েছিল : "বাঙালী মাত্র ঋগ্বেদের অনুবাদ পড়িবে, একথা শুনিয়া যাহারা হিন্দুধর্মের দোহাই দিয়া পয়সা আদায় করে তাহাদের মাথায় বজ্রাঘাত পড়িল। ধর্মব্যাপারিগণ ঋগ্বেদের অচিন্তিত অবমাননা ও সর্বনাশ বলিয়া গলাবাজি করিতে লাগিল।" আজ থেকে সত্তর বছরেরও বেশি আগে যে ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ হয়েছিল, তা বাংলা সাহিত্যের পক্ষে রীতিমতো গর্বের কথা। আর কোনো আধুনিক ভারতীয় ভাষায় এর আগে ঋগ্বেদের অনুবাদ হয় নি।

'ঋগ্বেদের দেবগণ' প্রবন্ধটিতে রমেশচন্দ্রের যে বৈজ্ঞানিকের মন আর সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ পেয়েছে, তা তখনকার দিনের পক্ষে যেমন অনন্যসাধারণ তেমনি বিস্ময়কর রকমের প্রগতিশীল। বৈদিক দেবদেবী সম্বন্ধে ঋক্-রচয়িতাদের ধারণা-কল্পনা আর যজ্ঞের ক্রিয়াচারগুলির পিছনে যে দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহারিক তাগিদটুকু আছে, সাংসারিক প্রয়োজনে নিজেদের প্রাণশক্তিকে আর সমষ্টিগত ঐক্যকে উদ্বুদ্ধ করার একটা লৌকিক উদ্দেশ্য আছে, রমেশচন্দ্র সেই কথাটির উপরে জোর দিয়েছেন। তখনকার দিনে যখন লোকে বেদ না পড়েই বেদ বলতে ভাবালুতায় অজ্ঞান হত (এবং এখনও হয়), তখন রমেশচন্দ্রের এই লৌকিক আর বস্তুনিষ্ঠ বেদব্যাখ্যা বিশেষভাবে শ্রদ্ধেয়। দৃষ্টিভঙ্গি বৈজ্ঞানিক ছিল বলেই রমেশচন্দ্রের রচনায় কোথাও ভাবোচ্ছ্বাসের বাষ্প নেই ; আছে সংযত ভাষায় তথ্যনির্ভর যুক্তিবিস্তার।

এই প্রবন্ধে ঋগ্বেদের অনেকগুলি সূক্তের তিনি যে অনুবাদ দিয়েছেন, তাও অপূর্ব সুন্দর—বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য দশম মণ্ডলের বিখ্যাত "কস্মৈ

দেবায় হবিষা বিধেম" ঋকগুলি। এগুলির মধ্যে রমেশচন্দ্রের কবিকৃতির পরিচয় আছে।

রমেশচন্দ্রের এই প্রবন্ধ-সংকলন পড়ে আরও একবার উপলব্ধি ক যে গত শতাব্দীর সমস্ত স্মরণীয় বাঙালী মনীষীর মতোই তিনি যেমন বিষয়ে চিন্তা করেছেন, সাহিত্য বিজ্ঞান ইতিহাসের নানা শাখায় বিদ্যাবত্তার সঙ্গে অনুশীলন-গবেষণা করেছেন, তেমনি আলোচিত প্রত্যে বিষয়েই কিছু-না-কিছু নতুন আলোকপাত করেছেন, মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির প দিয়েছেন। রমেশচন্দ্রের এই প্রবন্ধ রচনাবলী পড়তে বসে এও বিশেষ লক্ষ্য না করে পারা যায় না যে আগাগোড়া লেখনীকে তিনি কত স রেখেছেন, উচ্ছ্বাসের চেয়ে যুক্তির দিকেই কত বেশি জোর পড়েছে লেখায়।

রমেশচন্দ্রের উদ্দেশে শ্রদ্ধা জানিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, "রমেশচ চরিত্রে প্রাণের বেগের সঙ্গে অপ্রমত্ততার যে সম্মিলন ছিল তাহা এখন কালে দুর্লভ। তাঁহার সেই প্রচুর প্রাণশক্তি তাঁহাকে দেশহিতকর বি কর্মে প্রবৃত্ত করিয়াছে, অথচ সে শক্তি কোথাও আপনার মর্যাদা লংঘন ক নাই। কি সাহিত্যে, কি রাজকার্যে, কি দেশহিতে সর্বত্রই তাঁহার পূর্ণবেগে ধাবিত হইয়াছে, কিন্তু সর্বত্রই আপনাকে সংযত রাখিয়াছে—ব ইহাই বলশালিতার লক্ষণ। এই কারণে সর্বদা তাঁহার মুখে প্রসন্নতা দেখি —এই প্রসন্নতা তাঁহার জীবনের গভীরতা হইতে বিকীর্ণ।" রমেশচ প্রত্যেকটি রচনায় সেই বলশালী আর গভীর জীবননিষ্ঠ মনের স্পর্শ আ করা যায়।

একটি আশ্রমের কাহিনী

হিরণকুমার সান্যাল

রবীন্দ্রনাথ এক সময়ে দুঃখ করে বলতেন, ইস্কুল খুললাম অনেক আশা করে কিন্তু কপালে ভালো ছেলে আর জুটল না। বাইরের লোকের মনে ধারণা ছিল বোলপুরের ব্রহ্মচর্যাশ্রমে পড়তে যায় (শান্তিনিকেতন নাম তখন হয় নি) শুধু ওঁচা ছেলেরা। শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের সেই আদিযুগের অনেক ওঁচা ছেলেই তাঁদের ভবিষ্যৎ জীবনে শুধু বাপমায়ের নয় দেশমাতৃকার মুখ উজ্জ্বল করেছেন তাঁদের কীর্তিতে। সুধীরঞ্জন দাস তাঁদেরই একজন।

দেশবন্ধুর খুল্লতাতপুত্র সুধীরঞ্জন শান্তিনিকেতনে পড়তে যান নিতান্ত বাল্যবয়সে, বিদ্যালয় স্থাপনের চার-পাঁচ বছর পরে (তাঁর লেখায়* সন তারিখের উল্লেখ নাই)। সেকালের বিখ্যাত গায়িকা, যাঁর গলার জন্যে চড়া সুরে গান বাঁধতেন রবীন্দ্রনাথ, চিত্তরঞ্জনের ভগিনী, সুধীরঞ্জনের 'বড়দি' অমলা দাস ছিলেন এর মূলে। যাই হোক, বালক সুধীরঞ্জন রওনা হলেন বোলপুরের উদ্দেশে 'ভোলা দাদা'র সঙ্গে। ভোলাদা মানে দেশবন্ধুর ছোটো ভাই। তখনকার আশ্রমের ছাপা নিয়মাবলী অনুযায়ী সঙ্গে নিতে হল, পাঁচটি ধুতি, চারটি গেঞ্জি (একটি গরম) তিনটি সার্ট বা পাঞ্জাবি, দুখানা গামছা, একটি করে শতরঞ্জি, তোশক, মশারি ও মাথার বালিশ, একজোড়া বিছানার চাদর ও বালিশের ওয়াড়, একটি লেপ বা কম্বল ও একটি পট্টবস্ত্রের জোড়। তাছাড়া দু-চারটি থালা বাসন ও এক বাক্স ছুতোরের হাতিয়ার (বুনিয়াদী শিক্ষার কল্পনাও তখন গান্ধিজির মাথায় এসেছে কিনা সন্দেহ)।

বোলপুর স্টেশনে এই নবাগত বালকটির জন্যে যে অভ্যর্থনা সমিতি হাজির ছিল তার একমাত্র সভ্য কোদো—আশ্রমের ভৃত্য, সঙ্গে বয়েল গাড়ি, আর সে কী বয়েল! একেবারে নিটোল সুগোল ধবধবে সাদা রঙের মস্ত শিংওয়ালা যেন দুটি যমজ ভাই। তখন শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ের নাম ছিল বোলপুর

* **আমাদের শান্তিনিকেতন** ॥ সুধীরঞ্জন দাস। বিশ্বভারতী। পাঁচ টাকা ॥
শান্তিনিকেতন ও রবীন্দ্রনাথ ॥ প্রমথনাথ বিশী। রবীন্দ্রশতবর্ষপূর্তি গ্রন্থমালা। বিশ্বভারতী। চার টাকা ও (বহুচিত্রশোভিত) ছয় টাকা ॥

ব্রহ্মবিদ্যালয়, আর 'শান্তিনিকেতন' বলা হত বড় একটি দুতলা বাড়িকে যা তৈরি হয়েছিল মহর্ষিদেবের জন্যে। পরে এই বাড়িটি নির্দিষ্ট হয় অতিথিদের জন্যে ; বর্তমানে তা বিশ্বভারতীর গবেষণা বিভাগের অন্তর্গত। এই দুতলা বাড়ির নিচের তলায় থাকতেন 'বড়দা' দ্বিজেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিপেন্দ্রনাথ বা দিপুবাবু, আর উপরতলায় রবীন্দ্রনাথ, কোদোর ভাষায় 'বাবুমশায়'। বালক সুধীরঞ্জন বাড়ি ছেড়ে আসার আগে 'সোনাদা' ভয় দেখিয়েছিলেন রবি ঠাকুর ছেলে ঠেঙাতে ওস্তাদ। সুতরাং স্বভাবতই নবাগত বালক বাবুমশায়ের কাছে হাজির হয়েছিলেন একটু ভয়ে ভয়ে, কিন্তু তাঁর প্রশান্ত মুখশ্রী ও গলার মিষ্টি আওয়াজ শুনে মুহূর্তে বালকের ভয় কেটে মন ভরে উঠল শ্রদ্ধায় ও সম্ভ্রমে।

এর পর আরম্ভ হল রীতিমত আশ্রমবাসের পালা। এখন আশ্রম আর কেউ বলে না, তখন সবাই বলত, তবে কথাটি থেকে গেছে 'আশ্রমিক সঙ্ঘ' নামের মধ্যে। তখনকার আশ্রমের শিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন সর্বাধ্যক্ষ মোহিতচন্দ্র সেন, যিনি বাংলা ১৩১০ সালে 'কাব্যগ্রন্থ' নাম দিয়ে রবীন্দ্রনাথের কবিতার একটি সংস্করণ প্রকাশ করেন। সতীশচন্দ্র রায় অল্পদিন আগে মারা গিয়েছিলেন কিন্তু সারা আশ্রমে ছড়িয়ে ছিল তাঁর প্রভাব। আরো ছিলেন অজিতকুমার চক্রবর্তী, জগদানন্দ রায়, (ভুঁড়ির ওপর যন্ত্রটি রেখে মাটিতে বসে অদ্ভুত ভঙ্গিতে তিনি বেহালা বাজাতেন), হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (দিন শেষে চালাঘরে লণ্ঠন জেলে তাঁর বিখ্যাত বঙ্গীয় শব্দকোষের জন্য তিনি শব্দ তালিকা রচনা করতেন—দিনের পর দিন, মাসের পর মাস), ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল আর রাজেনবাবু (প্রতি বুধবার তাঁর কাছে গিয়ে খাতা পেনসিল আর বাড়িতে চিঠি লিখবার পোস্টকার্ড চেয়ে আনতে হত পুরো হিসেব দিয়ে)।

রবীন্দ্রনাথের জামাতা সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বিকেলের দিকে শরীরতত্ত্ব পড়াতেন, আর গান শেখাতেন দ্বিজেন্দ্রনাথের একমাত্র পুত্র দিনেন্দ্রনাথ বা দিনুবাবু আর মাঝে মাঝে ইংরেজীও। সুধীরঞ্জন আশ্রমবাসী হবার অল্পদিন পর এলেন বিধুশেখর শাস্ত্রী, তিনি আবার কিছুদিন পরে কলকাতায় গেলেন এন্‌ট্রান্‌স্ পরীক্ষা দিতে। মাস্টার মশায়ের পরীক্ষার কথা শুনে ছোটোরা তো অবাক। নগেন আইচ এলেন আরো কিছুদিন পরে ড্রইং মাস্টার হয়ে : ড্রয়িং মাস্টার অতএব কলাবিৎ অতএব অধিকার আছে সঙ্গীতকলার সাধনায়। কিন্তু অন্যদের পক্ষে তার ফল হল দুঃসহ, বিশেষ করে দিনুবাবুর

পক্ষে, কেননা একে সুরেলা মানুষ তার ওপর তিনি থাকতেন নগেন আইচ মশায়ের একেবারে পাশের ঘরে। একদিন গভীর রাত্রে নগেন আইচ যেই গান ধরলেন : "আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার, পরাণসখা বন্ধু হে আমার" অমনি দিনুবাবু এসরাজ বাজিয়ে তার পালটা জবাব দিলেন :

গভীর রাতে তোমার অত্যাচার
নগেন আইচ শত্রু হে আমার।
তোমার গান কান্না-সম,
আসে না ঘুম নয়নে মম,
দুয়ার খুলি হে মোর যম
তোমায় তাড়াই বারে বার।

আইচ মশায়ের সঙ্গীত সাধনায় অতঃপর পূর্ণচ্ছেদ পড়ল।

ক্ষিতিমোহন সেন, নেপালচন্দ্র রায়, কালীমোহন ঘোষ প্রভৃতি যে-সব বিখ্যাত অধ্যাপক শান্তিনিকেতনের ইতিহাসে গভীর ছাপ রেখে গেছেন, একেবারে গোড়ার দিকে তাঁরা আসেন নি। প্রমথনাথ বিশী এঁদের কথা বেশ রসিয়ে লিখেছেন। তাঁর বইটি যখন বেরোয় তখন এই পরিচয় পত্রিকাতেই আমি তার বিস্তৃত পরিচয় দিয়েছিলাম, সুতরাং দ্বিতীয় সংস্করণের উল্লেখই বোধ হয় এক্ষেত্রে যথেষ্ট। এই দুইটি বইতে আশ্রমের অনেক বছরের যে কাহিনী ফুটে উঠেছে যথাযথ ইতিহাস না হলেও তার ঐতিহাসিক মূল্য অকিঞ্চিৎকর নয়। এর পর আমরা প্রতীক্ষা করছি আশ্রমের একেবারে প্রথম কবছরের বিস্তৃত কাহিনী শোনার জন্যে। কবির পুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কবির বন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের পুত্র সন্তোষচন্দ্র মজুমদার—এই দুটি ছাত্রকে নিয়ে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের উঁচু ক্লাশের পড়ানোর কাজ শুরু হয়। এই দুইজনের আজ শুধু শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরই জীবিত। সুতরাং তাঁর কাছে আমরা দাবি করতে পারি শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের একেবারে প্রারম্ভিক পর্বের বিশদ বিবরণ—রথীবাবু তাঁর ইংরেজিতে লেখা On the Edges of Time বইতে ঐ সময়কার কথা অল্পসল্প যা লিখেছেন তার ওপর আরও কিছু।

মাঝখানে কিছুদিন (কতদিন ?) কলকাতায় মিত্র ইন্‌স্‌টিট্যুশনে পড়ে সুধীরঞ্জন দাস দ্বিতীয়বার আশ্রমবাসী হন বাংলা ১৭১৫ সালের পুজোর ছুটির পর। আগেই তো লিখেছি কোন মাসে তিনি শান্তিনিকেতনে যান তার উল্লেখ নাই। অনুমান হয় ১৩১২।১৩ সাল কেননা বছর দুয়েক আশ্রমে

থাকার কথা তিনি লিখেছেন, অর্থাৎ আশ্রম প্রতিষ্ঠার বছর চার পাঁচ পর, এমনকি আর বেশি দিন? সুতরাং যে আদর্শের প্রেরণায় রবীন্দ্রনাথ এ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন, আশ্রমের সেই ধ্রুপদী যুগে তার প্রকাশ ছিল অনাবিল ও আড়ম্বর।

এই আশ্রমের আশ্রমিক সত্তার যিনি ছিলেন প্রাণকেন্দ্র তাঁর স্পর্শ বালক সুধীরঞ্জনের মনকে কী গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল এই বইটির পাতায় পাতায় তা ফুটে উঠেছে। সুধীরঞ্জন ও তাঁর সতীর্থবৃন্দ—কতই বা ছিল তাদের বয়স। কী করে তারা উপলব্ধি করবে রবীন্দ্রনাথের মহৎ আদর্শ ও তাঁর ব্যক্তিত্বের অসাধারণত্ব? কিন্তু দিনের পর দিন তারা পেয়েছিল তাঁর অন্তরঙ্গ সান্নিধ্য। খাবার ঘরে মাঝে মাঝে তিনি এসে বসে যেতেন বালকদের সঙ্গে খেতে, তাদের নিয়ে গড়তেন গানের ও অভিনয়ের দল, মন ভোলাতেন নতুন নতুন গল্প শুনিয়ে আর নতুন প্রণালীতে রচনা করতেন পাঠ্যপুস্তক যাতে শিক্ষার পথে অনাবশ্যক বাধায় সুকুমার বালকদের পদে পদে ঠোক্কর খেতে না হয়। এই তো সত্যিকারের আচার্য! বালকেরা তাঁকে পুরোপুরি বুঝুক না বুঝুক তাদের মন তিনি ভরে দিয়েছিলেন তাঁর নিজের মনের ঐশ্বর্য দিয়ে।

আরো ছিল আশ্রমের মাটি আর আকাশ, গাছপালা ও অবারিত মাঠ। তদুপরি সতীশ ও চণ্ডী ঠাকুরের দ্বৈত কেরামতির অপরূপ নমুনা—আলুর ঝোল। এমন মুখরোচক ব্যঞ্জন নাকি বহু চেষ্টা করেও গ্রন্থকার নিজের বাড়িতে রাঁধাতে পারেন নি। কী করে পারবেন? এই সামান্য আলুর ঝোল তো শান্তিনিকেতনের অসামান্যতারই একটি অপরিহার্য অঙ্গ। বহু তুচ্ছ টুকরো জড়ো করেই তো হয় অপরূপের সৃষ্টি। শান্তিনিকেতনের সে অপরূপ ঐশ্বর্য প্রায় মিলিয়ে গেছে কালের স্রোতে, তারই বড় একটু টুকরো শ্রীযুক্ত সুধীরঞ্জন দাস আমাদের উপহার দিয়েছেন তাঁর এই বইটিতে।

প্রমথনাথ বিশী পাকা লেখক, কলম তাঁর অভ্যস্ত হাতিয়ার। সুধীরঞ্জন দাসের লেখা পড়ে মনে হয় যেন তাঁর মুখের কথা শুনছি। কিন্তু কথায় তাঁর যাদু আছে আর এই যাদুর ছোঁয়া যে তাঁর কলমেও লেগেছে তাতে প্রমাণ হয় উজ্জ্বল কর্মজীবনের অবসানে আজ শুরু হয়েছে তাঁর জীবনের উজ্জ্বলতর আধ্যায়ের—এই হল তাঁর আশ্রম-দেবতার চরম আশীর্বাদ।

সর্বশেষে সামান্য একটু আপত্তি জানাই। সুধীরঞ্জনবাবু বোধ হয় ভুলে গেছেন রবীন্দ্রনাথ সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্ কথাটি পছন্দ করতেন না। বলতেন এ হল ইংরেজীর অনুবাদ এর চেয়ে অনেক বড় কথা উপনিষদের শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্, এই হল আমার ধ্যানমন্ত্র।

সাহিত্যের সত্য ও তারাশঙ্কর

অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র

এই ছোট্ট বইটি* তারাশঙ্করের বিভিন্ন সময়ে লেখা সতেরোটি প্রবন্ধের সমষ্টি। 'সাহিত্যের সত্য' নামটি দেখে ভেবেছিলাম, বুঝিবা বইটির বিষয়বস্তু সাহিত্যতত্ত্ব ও সাহিত্যকলা। কিন্তু পড়ে দেখলাম ব্যাপারটা তেমন ভয়াবহ কিছু নয়। 'সাহিত্যের সত্য' নামে একটি পাঁচ পৃষ্ঠার প্রবন্ধ বইটিতে অবশ্যই আছে। সাহিত্যের শিরোনামা বহন করে আরো নানা প্রবন্ধ বইটিতে আছে, যথা, 'বাঙলা সাহিত্যের মর্মবাণী', 'সমাজ ও সাহিত্য', 'আধুনিক কাল ও সাহিত্য', 'আধুনিক বাঙলা নাট্যসাহিত্য' এবং 'আধুনিক সাহিত্য ও সমাজ'। কিন্তু তারাশঙ্কর অনেক প্রবন্ধেই সাহিত্যের ক্ষেত্র বর্জন করে রাজনীতির ও সমাজনীতির চরেই আটকা পড়ে গেছেন। এই জন্যে বইটির সমালোচনাও সাহিত্যের ক্ষেত্রে আবদ্ধ না থেকে রাজনীতির ও সমাজনীতির ক্ষেত্রে প্রবেশ করতে বাধ্য। এ বিষয়ে তারাশঙ্করই আমাদের নিরুপায় করে ফেলেছেন।

'বাঙলা সাহিত্যের মর্মবাণী' ১৯৫৬ সালে এশীয় লেখক সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ। এই ধরনের সম্মেলনে সচরাচর যেমনটি হয়ে থাকে তাই হয়েছে, অর্থাৎ কিঞ্চিৎ অতিভাষণ। বিদেশের কাছে বাংলা সাহিত্যের ইতিমূলক ও কৃতিত্বমূলক দিকগুলিকে অবশ্যই আমরা যতদূর সম্ভব তুলে ধরব, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। এ কাজ করার জন্যে আরূঢ় সাহিত্যসম্রাট তারাশঙ্করের চেয়ে যোগ্যতর ব্যক্তি কেই বা আছেন! বাঙলা সাহিত্য বিক্রয় লিমিটেড কোম্পানির সুপরিচিত প্রসপেকটাসের সমস্ত পয়েণ্টগুলিকেই তারাশঙ্কর যথাবিহিতভাবে তুলে ধরেছেন। আনন্দের সন্ধান, দৈহিক ও ঐহিক শাসনের ও ভয়ের হাত থেকে মানবাত্মার মুক্তি, অহিংসা ও প্রেমধর্ম, সাম্য ও মৈত্রী, "সবার উপরে মানুষ সত্য"-বাদ, সর্বধর্মসমন্বয় ও সর্বসংস্কৃতিসমন্বয়, এই সকল

* সাহিত্যের সত্য ॥ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। পরিবেশক: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। দু টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা ॥

আদর্শের ও লক্ষ্যের দ্বারাই বাংলা সাহিত্য বরাবর অনুপ্রাণিত হয়ে এসে এবং এই দিক থেকে বাংলার তথা ভারতের কাছ থেকে জড়বাদী ইউরোপে অনেক কিছু শিক্ষা করার আছে—এসব কথার পুনরুক্তি করতে করতে আম কিন্তু এমন একটা স্বকীয় উন্মাদনায় নিজেদের আচ্ছন্ন করে ফেলেছি যে হয়, বুদ্ধিমান ও ভদ্র বিদেশীরা যদিও মুখে আমাদের বাহবা দেবেন, তবু এ কথা শুনে মনে মনে তাঁরা আমাদের শ্রদ্ধা করতে পারবেন না। খুব ভা আধুনিক প্রোপাগ্যাণ্ডার লাইনও তো এটা নয়!

অন্য বিপদও আছে। সাহিত্যে সত্যের সন্ধানও এর দ্বারা বিপন্ন হ পড়তে পারে। "সবার উপরে মানুষ সত্য", এই তত্ত্বটি মূলতঃ সহজিয়া তত্ত্ব এর মধ্যে একটা আদিম ধরনের মানবিকতা অবশ্যই আছে কিন্তু সে সামাজিক মানবিকতা কিনা তা সন্দেহের বিষয়। সাহিত্যে আধুনি মানবতাবাদ পশ্চিম থেকেই ভারতে এসেছে, বুর্জোয়া মানবতাবাদ প্রলেটারীয় মানবতাবাদ দুই-ই। এটা স্বীকার করতে লজ্জা বোধ করা কোনো কারণ দেখি না। তারাশঙ্কর বলছেন: "ইউরোপের সভ্যতার মো ও আসক্তি পরিত্যাগ করে তবে তিনি (মাইকেল মধুসূদন দত্ত) বাঙালী তথা ভারতের মহাকবি হতে পেরেছিলেন।" এটা সাহিত্যের সত্য ঐতিহাসিক সত্য, কোনোটাই নয়। বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে তারাশঙ্কর বলছেন "তাঁর সাহিত্য ইউরোপের সাহিত্যের বহিরঙ্গ-অন্তরঙ্গে ভারত সাধনা প্রাণ-ধর্ম।" ঔপন্যাসিক হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্রের বিরাট কীর্তি বাংলা সাহিত্যে ইতিহাসে অমর, একথা অকুণ্ঠ চিত্তে স্বীকার করা উচিত। তবু বলব, "ভার সাধনা" বঙ্কিমের উপন্যাসের নেতিমূলক ও ক্ষতিমূলক দিক। গোবিন্দলাল বৈরাগ্যকে বুঝতে পারি, সাহিত্য তাতে হয়তো ক্ষুণ্ন হয় নি; কিন্তু "ভার সাধনা"-র খাতিরেই বোধ হয় রোহিণীকে জোর করে বারবনিতা বানা হল। শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্তসাধনের ভিতর দিয়ে নারীসমাজের প্রতি নিষ্ঠুরতার পরিচয় দেওয়া হয়েছে, তাকে সাহিত্যের সত্য বলে চালিয়ে দে আত্মপ্রতারণা। দেবী চৌধুরাণীর অমন জোরালো গল্পটি তো "ভার সাধনা"-র দাপটে সাহিত্যের জগৎ ছেড়ে কোন্ জগতে যে চলে গেছে, ভাববার বিষয়।

'বঙ্কিমের মাতৃপূজা' প্রবন্ধে তারাশঙ্কর বলেছেন: "বাঙালী, দেবলোকে প্রস্তর-প্রতীককে সে দেউল হইতে অপসারিত করিয়া সেখানে প্রতিষ্ঠা কর

মর্ত্যলোকের মৃত্তিকা-জননীর মূর্তি; মাটি হইল মা। ঋষি বঙ্কিম সে দেবীর পূজার মন্ত্র সৃষ্টি করিলেন—'বন্দে মাতরম্'।" খুব ঠিক কথা। তারাশঙ্করের ছড়ি ঠিক তারেই ঘা দিয়েছে। কিন্তু সন্দেহ থেকে যায়, দেউল থেকে পুরনো দেবতাদের তাড়িয়ে দিয়ে সেখানে নতুন এক উপজাতীয়, সাম্প্রদায়িক ও রাজনৈতিক দেবতাকে প্রতিষ্ঠিত করে বঙ্কিম আদৌ ভালো কাজ করেছিলেন কি না। আসলে বঙ্কিম মোটেই ধার্মিক লোক ছিলেন না। ধর্মকে র‍্যাশনালাইজ করতে করতে বঙ্কিম ধর্মের মধ্যে ঢোকালেন রাজনীতি এবং রাজনীতির মধ্যে ঢোকালেন ধর্ম। ফলে ধর্ম ও রাজনীতি, উভয়ই সাংঘাতিক ঘা খেল। দেশের পক্ষে ভালো হত যদি প্রতিষ্ঠিত দেবতারা নিজ নিজ দেউলেই নির্বিঘ্নে বিরাজ করতেন এবং যে ধর্মবিবর্জিত ঐহিক পথ ধরে দেশপ্রেম আধুনিক কালে এগিয়ে চলেছে, বঙ্কিম সে পথে বাধাসৃষ্টি না করতেন। "মাটি হইল—মা।" সেই মাকে বারবার নমস্কার করি। বন্দে মাতরম্। কিন্তু মা দেবী হতে যাবেন কেন? কেনই বা তাঁকে দেবীরূপে কল্পনা না করলে দেশপ্রেমের সাহিত্য রসোত্তীর্ণ হতে পারবে না?

"সাহিত্যের মর্মবাণী"-র উক্তিগুলিকে তবু বুঝতে পারি, কেননা বাংলা সাহিত্য সত্যই আমাদের গৌরবের জিনিস এবং বিদেশীর কাছে আমাদের সাহিত্যের ইতিমূলক দিকগুলিকে তুলে ধরার প্রয়োজন আছে। কিন্তু "সমাজ ও সাহিত্য" নামক ভাষণে সমাজ বা সাহিত্য, কোনোটার ছিঁটেফোঁটাও দেখতে পেলাম না। তারাশঙ্কর বাংলার সাহিত্যিকদের এই পরামর্শ দিচ্ছেন যে, আজ আমাদের শাসকেরা যা কিছু করছেন বা করতে চাইছেন বা করবার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন তার ভিতর দিয়েই কেবল "মহাভারতের" ও ভারতের "প্রাণপুরুষ"-এর আবির্ভাব ঘটবে এবং "বলিষ্ঠ স্বাস্থ্য সুন্দর কল্যাণবুদ্ধি পরিশুদ্ধ অন্তর শিক্ষায় উজ্জ্বল দৃষ্টি মানুষের প্রাণহীন বর্ণবৈষম্যহীন সাম্যের সন্তোষে শান্তিময় সমাজ গড়ে উঠবে"; সুতরাং তারাশঙ্করের মতে আজ সাহিত্যিকদের কর্তব্য হল শাসক সম্প্রদায়ের পিছনে এসে দাঁড়ানো। ভারতের "প্রাণপুরুষ"! তিনি জাগ্রত হয়ে ভারতকে বড় করে আমাদের সকলের মঙ্গল করুন। কিন্তু তিনি আমাদের শাসকদের দলেই নাম লিখিয়েছেন, একথা কি করে মানি। বরং মনে হয় যে, আজ ভারতের যে কোটি কোটি মানুষ শাসক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন, যাঁরা জমির জন্যে, মজুরির জন্যে ও বাঁচার জন্যে লড়াই করছেন, যাঁরা চাইছেন যে, মুষ্টিমেয় ধনিকদের ও ফাটকাবাজদের স্বার্থে অন্তর্দ্বন্দ্বে জর্জরিত, দ্বিধাগ্রস্ত,

গণশক্তি সম্বন্ধে ভয়ত্রস্ত, ক্ষুদ্র পরিকল্পনার পরিবর্তে জনগণের কর্মশক্তিকে ও উদ্ভাবনী শক্তিকে মুক্ত করে দিয়ে দশ পনরো বছরের মধ্যে ভারতকে ধনে, ধান্যে, ভোগে ও সম্পদে, ঋদ্ধিতে ও বৃদ্ধিতে ব্রিটেনের সমকক্ষ করতে পারে, এমন একটি বৃহৎ পরিকল্পনা ভারতে গৃহীত হোক—তাঁদের ভিতর দিয়েই ভারতের "প্রাণপুরুষ" তাঁর বর্তমান যন্ত্রণা ও ভবিষ্যৎ মুক্তি, উভয়কেই ঘোষণা করছেন। এই বিদ্রোহী প্রোমিথিয়ুসের সাক্ষাৎ তারাশঙ্কর পান নি, অথবা তিনি একে ভয় করেন। সেটা আমাদের দুর্ভাগ্য। এঁদের সঙ্গে তারাশঙ্কর এক মত না হতে পারেন। কিন্তু তিনি যখন এঁদের সমাজের শত্রু, দেশের শত্রু ও সাহিত্যের শত্রু বলে অভিশাপ দেন, তখন বিস্ময়ে মনে মনে ভাবি, এই কি বাংলাদেশে সাহিত্যসম্রাটদের ঐতিহ্য? এই চপলতা? এই সংকীর্ণচিত্ততা? এ বিষয়ে তারাশঙ্কর রবীন্দ্রনাথের মহৎ দৃষ্টান্ত অনুসরণ করলে বাংলা সাহিত্যের ভালো হত।

তারাশঙ্কর বলছেন: "শান্তি আন্দোলনের মধ্যেও অহিংসার উল্লেখ নেই, এই পন্থায় পন্থী ভারতবর্ষীয়ের ভাবনায়" (সমাজ ও সাহিত্য)। শান্তি আন্দোলন মোটেই কমিউনিস্ট আন্দোলন নয়। তারাশঙ্করের প্রথম ভুল এইখানটায়। "এই পন্থায় পন্থী ভারতবর্ষীয়ের" মধ্যে কমিউনিস্টদের সংখ্যা নিতান্তই মুষ্টিমেয়। অনেক গোঁড়া হিন্দু, গোঁড়া খ্রীষ্টান, গোঁড়া গান্ধীবাদী শান্তি আন্দোলনে আছেন। তাঁরা কেউই দুষ্ট কমিউনিস্টদের তারাশঙ্কর-কথিত হিংসাপন্থার পন্থী নন। সে যাই হোক, শান্তি মানেই অহিংসা। সুতরাং "শান্তি আন্দোলনের মধ্যেও অহিংসার উল্লেখ নেই", এই কথা অর্থহীন। যাঁরা বিশ্বশান্তির "পন্থায় পন্থী" তাঁরা সকলেই এবং আশা করি, তারাশঙ্কর নিজেও এই দুটি সুদৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করেন, যথা: (১) সকল জাতির পূর্ণ স্বাধীনতা ও সমান অধিকারের ভিত্তিতে আলাপ, আলোচনা ও আপোসের দ্বারা সকল আন্তর্জাতিক বিবাদের পূর্ণ মীমাংসা বাঞ্ছনীয় ও সম্ভব। (২) পৃথিবীর সার্বিক ও সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণই বিশ্বশান্তির পথ। এ যদি অহিংসা না হয়, তাহলে অহিংসা কাকে বলে? তা আমরা সবিনয়ে তারাশঙ্করের কাছ থেকে জানতে চাই। আক্রমণকারীর হিংসার ও বল-প্রয়োগের নিন্দা শান্তিকর্মীরা সর্বদাই করে থাকেন; তবে আক্রমণকারী দেশ ও আক্রান্ত দেশ, এই দুইয়ের মধ্যে তফাত অবশ্যই টানা হয়। নিশ্চয়ই তারাশঙ্কর আক্রমণকারী দেশ এবং আক্রান্ত ও আত্মরক্ষায় নিযুক্ত দেশ

উভয়কে একই পর্যায়ে ফেলে বলবেন না যে, উভয়ই সমান হিংসাপন্থী এবং উভয়ই "ভারত সাধনা"-র সাধকদের কাছে সমানই অপরাধী ও সমানই নিন্দনীয়! অথবা তিনি হয়তো তাঁর সাহিত্যিক ব্যঞ্জনাময় ভাষায় অবিকল এই কথাটাই বলতে চান। তা যদি হয়, তাহলে বলব, অমন যে বিশুদ্ধ অহিংসাপন্থী কংগ্রেসের নেতারা, কই তাঁরাও তো কোনদিন ভিয়েৎনাম, টিউনিসিয়া, মিশর, আলজিরিয়া, মরক্কো, কঙ্গো প্রভৃতি দেশগুলির জাতীয় মুক্তি সংগ্রামকে হিংসাপন্থী বলে নিন্দা ও তিরস্কার করেন নি। যতদূর জানি, প্রকাশ্যে অন্ততঃ তাঁরা এই সব আন্দোলনকে অভিনন্দনই জানিয়েছেন। তাই অবাক হয়ে ভাবি, "শান্তি আন্দোলনের মধ্যেও অহিংসার উল্লেখ নেই", এই কথাটা ঠিক কার বিরুদ্ধে যাচ্ছে। "ভারত সাধনা"-র গৌরবরক্ষার্থে শান্তি আন্দোলনের "পন্থায় পন্থী"-দের কি এই নির্দেশই দেওয়া হবে যে, এশিয়ার, আফ্রিকার ও লাতিন আমেরিকার নিপীড়িত জাতিগুলির সশস্ত্র মুক্তিসংগ্রামের নিন্দা করাই শান্তিকর্মীদের প্রথম কর্তব্য?

তারাশঙ্কর বলছেন: "দিকে দিকে আজ চিৎকার উঠেছে—পৃথিবী নাকি আজ দুটি শিবিরে বিভক্ত এবং এই শিবিরের এক শিবিরে ভারতবর্ষকে নাকি আশ্রয় গ্রহণ করতেই হবে।…অথচ ভারতবর্ষ আবহমান কালের এক স্বতন্ত্র শিবির। শান্তির শিবির। সমন্বয়ের শিবির। হিংসা ও যুদ্ধ জর্জর পৃথিবীর একমাত্র সান্ত্বনা-শিবির।" পুনরায়, "নূতন ভারতবর্ষ তার তৃতীয় শিবিররূপ অস্তিত্ব ঘুচিয়ে দিয়ে তাদের ঈপ্সিত শিবিরে অনুগৃহীত অনুসরণকারীর মতো আশ্রয় নিতে সম্মত নয় বলে, ভারতবর্ষের জীবনের এই সংগঠনকে তারা অস্বীকার করতে বদ্ধপরিকর। আজ ভারতবর্ষের দিকে দিকে নবজীবন গঠনের যে আয়োজন চলেছে, তাতে আঘাতের পর আঘাত হানতে চাইছে।" (সমাজ ও সাহিত্য)। শেষের অভিযোগটি সন্দেহের অবকাশ রাখছে না, কারা তারাশঙ্করের আক্রমণস্থল।

একথা ঠিক যে, বিদেশের ভূমি বলপূর্বক অধিকার করার অপরাধ থেকে ইতিহাসের আদালত ভারতবর্ষকে প্রায় বেকসুর খালাস দিয়েছে। তার জন্যে আমরা গৌরব করতে পারি। কিন্তু ভারতের আভ্যন্তরীণ ইতিহাস "আবহমান কাল" ধরে অহিংসার ইতিহাস, অস্ত্রের পথ, যুদ্ধের পথ ও বলপূর্বক শোষণের পথ বর্জন করার ইতিহাস, একথা বিশ্বাস করি কি করে? তার জন্যে ভারতবর্ষের ইতিহাসকে নতুন করে বানিয়ে বানিয়ে লিখতে হবে।

এখনও তা লেখা হয় নি। শুনছি যে, "আবহমান কাল" ধরে ভার একটি "স্বতন্ত্র শিবির" ও "হিংসা ও যুদ্ধ জর্জর পৃথিবীর একমাত্র শা শিবির।" বরাবর ভারত এতই যদি স্বতন্ত্র শিবির হয়ে থাকে, তাহলে যুগ ধরে "শক হূন দল পাঠান মোগল" ভারতে এল কি করে এবং কি করে তাদের সকলেরই সংস্কৃতি ভারতে এসে মিলেমিশে আমাদের শোণিতে হতে পারল? ওই যারা সব "রণধারা বাহি জয়গান গাহি উন্মাদ কল ভারতে এসেছিল, তারা কি সান্ত্বনার লোভেই এসেছিল?

আমাদের বহু ভাবুকদের একটা মহৎ বিভ্রান্তি এই যে, অতীতে কো একটা আইডিয়লজির সাক্ষাৎ পেলে অমনই তাঁরা সিদ্ধান্ত করে বসেন যে, তা অনুরূপ ও সমধর্মী একটা সমাজও ওই সময়ে প্রতিষ্ঠিত ছিল। আইডিয় অনেক সময়ে প্রতিষ্ঠিত সমাজব্যবস্থার বিপরীত চেহারা গ্রহণ করেও বেড়ে যাঁরা প্রকৃতই আজ শান্তিময় পৃথিবী গড়ে তুলতে চান তাঁদের সকলেরই প্রথম কথাটা বোঝা দরকার যে, আমাদের সমসাময়িক কাল পর্যন্ত পৃথিবী হিংসা ও যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী ছিল। পৃথিবীর সকল দেশের যুদ্ধপীড়িত সাধা মানুষ সান্ত্বনা বরাবরই খুঁজে এসেছে। বুদ্ধ ও চৈতন্য মানুষকে সেই সান্ত দিয়েছিলেন। তার জন্যে চিরকাল তাঁরা পূজিত হবেন, এমনি কমিউনিস্টদের দ্বারাও। কিন্তু একমাত্র ভারতেই এই সান্ত্বনাবাণী উচ্চারি হয়েছে, এমন অন্ধ জাত্যভিমানের পরিচয় দিলে আমাদের নেতৃস্থানী ভাবুকেরা বিদেশের কাছে হাস্যাস্পদ হবেন। কেননা বিদেশীরা সহজেই এ প্রশ্ন করতে পারেন, তাহলে গান্ধীজিকে অহিংসার বাণী শিক্ষা করার জ খ্রীষ্টের ও তলস্তয়ের শরণাগত হতে হল কেন? শুধু বুদ্ধ নন, শুধু খ্রীষ্ট অতীতে সর্বদেশেই হিংসাজর্জরিত, যুদ্ধপীড়িত, শোষিত ও ধর্ষিত সাধারণ মা নিজেদের লৌকিক সংস্কৃতির মাধ্যমে শান্তিসান্ত্বনার অতি অপরূপ ও মনো আইডিয়লজি গড়ে তুলেছিল। খ্রীষ্টধর্ম যে অল্পকালের মধ্যেই যুদ্ধপরা রাজশক্তির হাতিয়ারে পরিণত হয়েছিল, বার্নার্ড শ তাঁর "অ্যাণ্ড্রোক্লিস অ্যা দি লায়ন" নামক নাটকে তার অমর চিত্র এঁকেছেন। বৌদ্ধধর্মও অল্পকাল মধ্যেই যুদ্ধপরায়ণ রাজাদের, প্রতারক বণিকদের ও অত্যাচারী সামন্ত প্রভু হাতিয়ারে পরিণত হয়েছিল। সর্বদেশেই লোকসংস্কৃতির মধ্যে যে শান্তির বা উচ্চারিত হয়েছিল তাই ছিল সত্যকার বিশুদ্ধ শান্তিবাণী, যদিও তার ক আমাদের ভাবজগতের নেতাদের মুখে বড় একটা শোনা যায় না।

কিন্তু আজ শুধু সান্ত্বনা খোঁজার দিন অতীত। আজ যুদ্ধকে নিবারণ করা ও পৃথিবীতে স্থায়ী বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠিত করা সম্পূর্ণ সম্ভব। সান্ত্বনাই কি একমাত্র বড় জিনিস? দুঃখতাপিত নিপীড়িত মানুষ আজ যুগযুগব্যাপী সান্ত্বনাসন্ধানের পালা শেষ করে নিজের দুঃখের কারণগুলিকে ও উৎস-গুলিকে দূর করে সুখী হতে যায়। দার্শনিকেরা, কবিরা ও তারাশঙ্করের মতো ঔপন্যাসিকেরা বহু সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তর্কের দ্বারা, বহু উপমার ও প্রতীকী রসবাক্যের দ্বারা বোঝাবার চেষ্টা করছেন যে, এটা হল মানুষের আত্মার অপমৃত্যুর লক্ষণ, সুখবাদী চার্বাকপন্থী জড়বাদ! তাঁদের উদ্দেশে কোটি কোটি প্রণাম নিবেদন করে সাধারণ মানুষ কিন্তু অদৃষ্টকে জয় করার পথেই এগিয়ে চলেছে। সুতরাং ভারতবর্ষ "পৃথিবীর একমাত্র সান্ত্বনা-শিবির", একথা যদি সত্যও হয়, তবুও তা খুব বড় সত্য নয়। যাঁরাই আজ বাস্তব জগতে স্থায়ী বিশ্বশান্তির জন্যে চেষ্টা করছেন, তাঁদের সকলকে নিয়ে গড়ে উঠেছে শান্তির শিবির। এটা একটা বিরাট আন্তর্জাতিক শিবির। এই শিবির কোনো জোটের ধার ধারে না। সুতরাং ভারতই পৃথিবীর একমাত্র "শান্তির শিবির", একথা মানি কি করে? বরং বলা যায় যে, যাঁরা ভারতকে পৃথিবীর একমাত্র শান্তির শিবির বলে ঘোষণা করছেন, তাঁরা ভারতের ও বিশ্বশান্তির বন্ধুর মতো কাজ করছেন না। ভারতকে তাঁরা বিশ্বজোড়া শান্তির শিবির থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চাইছেন। শান্তি তাঁদের কাছে মাত্র একটা কথার কথা।

একথা ঠিক যে, বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ভারতের ভূমিকা আজ গৌরবময়। পৃথিবীর সর্বত্র কমিউনিস্টরা অত্যন্ত আনন্দের সহিত একথা স্বীকার করেন। আজ পৃথিবীতে বিভিন্ন জাতির যে সব আক্রমণাত্মক ও আত্মরক্ষামূলক জোট সৃষ্ট হয়েছে, তার কোনোটার মধ্যেই যে ভারত যেতে চায় না, তা কমিউনিস্টদের কাছে আনন্দেরই বিষয়। ভারতের অভ্যন্তরে ও বাইরে কমিউনিস্টরা ভারতের নিরপেক্ষতাবাদী বৈদেশিক নীতিকে শ্রদ্ধা করেন। পৃথিবীতে আজ হুতাঁত আসুক, জোটবদ্ধ পৃথিবীর জোটমুক্তি ঘটুক, এ চিৎকার আজ কমিউনিস্টরাই তুলেছেন। একথা সকলেই জানেন যে, আমেরিকার শাসকসম্প্রদায়ের নেতারাই বরাবর ভারতের নিরপেক্ষতাবাদী বৈদেশিক নীতিকে বিষচোখে দেখে এসেছেন এবং পণ্ডিত নেহরুকে ক্রীপ্টো-কমিউনিস্ট বলে এসেছেন। আজ আবার চাল বদলে চেস্টার বোলস ও

সেনেটার ফুলব্রাইট প্রমুখ আমেরিকার নেতারা বলছেন যে, নিরপেক্ষ ভারতবর্ষকে পূর্ণ মার্কিন সাহায্য দেওয়া দরকার কেননা একমাত্র এই উপা আমেরিকা ভারতকে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের ও চীনের বিরুদ্ধে দাঁড় ক সক্ষম হবে। তাই বিস্ময়ে অবাক হই যখন তারাশঙ্করের মুখে কমিউনিস্টরাই এই দাবি করছেন যে, ভারতকে পৃথিবীর এক বিশেষ শি "আশ্রয় গ্রহণ করতেই হবে"।

সাহিত্য সম্পর্কে কমিউনিস্টদের সমালোচনা করে তারাশঙ্কর বল "সত্য বলে ঘোষিত হচ্ছে জৈব ধর্মের ক্রোধ, হিংসা, লোভ। এই বি নির্দেশে সুন্দর ও মঙ্গলের আশ্রয় সাহিত্যকে করে তুলতে চাইছে চরিতার্থতার হাতিয়ার (সমাজ ও সাহিত্য)। অন্যত্র: "তথাক প্রগতিবাদের গালিগালাজ ব্যঙ্গবিদ্রূপ আস্ফালন যত উচ্চ ততই প্রাণ তাঁরা প্রাণধর্মী সাহিত্য সৃষ্টি করতে গিয়ে আক্রোশসর্বস্ব রচনায় প্রাণকে বিসর্জন দিয়ে ব্যর্থ হয়েছেন" (আধুনিক কাল ও সাহিত্য। পুনর "গাঢ় দুর্যোগের মধ্যে যখন উচ্চারিত হতে শুনেছি…মিথ্যা অতীতের তপ সাহিত্য, সত্য একমাত্র বিপ্লবের সাহিত্য। জনগণের যুগে সত্য এক গণসাহিত্য। প্রথম অবস্থায় সেই দুর্যোগের বিভ্রান্তির মধ্যে এর উত্তে মানুষকে স্পর্শ করেছিল। কিন্তু দুর্যোগের কাল ধীরে ধীরে যতই অব হয়ে আসছে—ততই প্রশ্ন জাগছে। ওই ধ্বনিসর্বস্ব সাহিত্য ও সঙ্গী উত্তেজনা আজ আর জীবনে সুর তুলতে পারছে না, সাড়াও জাগাচ্ছে (আধুনিক কাল ও সাহিত্য)। অর্থাৎ তারাশঙ্কর বলতে চাইছেন যে, এক তিনিও প্রগতি সাহিত্যের মোহে মুগ্ধ হয়ে সাহিত্যে প্রগতিপন্থীদের যোগ দিয়েছিলেন, কিন্তু পরে "যা দেবী সর্বভূতেষু ভ্রান্তিরূপেণ সংস্থিতা", নমস্কার করে ওই পথ ছেড়ে দিয়েছেন। এখন তিনি বুঝতে পেরে প্রগতি সাহিত্য হল জৈব ধর্মের সাহিত্য, ক্রোধ, হিংসা ও লোভের আক্রো সর্বস্ব সাহিত্য, বৈপ্লবিক সাহিত্য ও গণসাহিত্যকে একমাত্র সাহিত্য উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করে তা সাহিত্যের ঐতিহ্যকে অস্বীকার করেছে অতীতের তপস্যার সাহিত্যকে নাকচ করে দিয়েছে, অন্তঃসারশূন্যতার তা হয়ে পড়েছে ধ্বনিসর্বস্ব সাহিত্য।

দেবীর মায়া শুধু তারাশঙ্করের কেন, প্রগতিপন্থীদেরও অনেক ভুল থাকতে পারে এবং কালক্রমে সেই সকল ভুলের অপনোদন করে থাক

পারে, প্রথমে এই কথাই সবিনয়ে তারাশঙ্করকে ভেবে দেখতে বলি। এ ব্যাপারে মহামায়ার কোনো দলীয় পক্ষপাত আছে, কই এমন কথা তো ভারতের অতীত ঐতিহ্যে ও তপস্যার সাহিত্যে কোনোদিন দেখতে পাই নি। বিপ্লবের সাহিত্যই একমাত্র সাহিত্য, একথা অবশ্যই ভুল। মার্কস ও এঙ্গেলস এমন অদ্ভুত কথা একবারও বলেন নি। আজ কোনো প্রগতিপন্থীই একথা বলেন না এবং আমার সন্দেহ হয়, যে সময়ের কথা তারাশঙ্কর বলছেন, সে সময়েও প্রগতিপন্থী মাত্রই এমন কথা বলতেন না। রবীন্দ্রসাহিত্য পৃথিবীর সকল দেশের কমিউনিস্টদের শ্রদ্ধা ও সমাদর লাভ করেছে। নিশ্চয়ই কেউ বলবেন না যে, রবীন্দ্রসাহিত্য বৈপ্লবিক সাহিত্য। দেশের সাহিত্যিক ঐতিহ্য থেকে ও সমসাময়িক সাহিত্যের পরিবেশ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন আনকোরা নতুন একটা বৈপ্লবিক সাহিত্য গড়ে তোলার চেষ্টা করলে স্বভাবতই তা রসবস্তু থেকে বঞ্চিত হয়ে শুষ্ক বিবৃতির স্তরে নেমে যেতে এবং ধ্বনিসর্বস্ব হয়ে পড়তে বাধ্য। এই অঘটন যে প্রগতি সাহিত্যের ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে ঘটেছে এবং হয়তো এখনও ঘটছে, তা অস্বীকার করছি না। তারাশঙ্করের এ কথাও ঠিক যে, বাস্তববাদের নামে অনেক শক্তিমান সমসাময়িক সাহিত্যিক শুভবুদ্ধি-বিবর্জিত হয়ে মানুষের জীবনের নোংরা ও ক্লেদ নিয়েই কেবল ঘাঁটাঘাঁটি করছেন। "শুধু নোংরা ঘাঁটার জন্য নোংরা ঘাঁটার আনন্দ একমাত্র জড়, উন্মাদ অথবা অজাতবুদ্ধি শিশুর পক্ষেই সম্ভব।…সাহিত্যিকের মধ্যে আমরা শুভ উদ্দেশ্যের আশা করব। অন্তত যখন তাঁরা সমাজের পক্ষে, ব্যক্তির পক্ষে বিপজ্জনক উপাদান নিয়ে সৃষ্টি করবেন তখন" (সাহিত্যের সত্য)। তারাশঙ্করের এই উপদেশ অবশ্যই প্রগতিপন্থীদের শিরোধার্য হওয়া উচিত।

কিন্তু তারাশঙ্কর প্রগতি সাহিত্যের ভুলগুলিকে নয়, প্রগতি সাহিত্যকেই তিরস্কার করছেন। প্রগতি সাহিত্যের ধর্ম কি? তারাশঙ্করের উত্তর: "জৈব ধর্মের ক্রোধ, হিংসা, লোভ"। প্রগতি সাহিত্যের ভূমিকা কি? তারাশঙ্করের উত্তর: প্রগতি সাহিত্য "হিংসা চরিতার্থতার হাতিয়ার"। একথা শুনে অন্তত এটুকু বুঝতে পারছি যে, তারাশঙ্করকে নিয়ে মহামায়ার ভ্রান্তিলীলা আবার এক নতুন পর্বে প্রবেশ করেছে। তাঁর উক্তি দুটি যেহেতু মহর্ষি বাদরায়ণের ব্রহ্মসূত্রের চেয়েও সংক্ষিপ্ত, তাই তার সম্যক্ অর্থগ্রহণ আমার মতো অল্পবুদ্ধি লোকের পক্ষে সহজ কাজ নয়। তবু এটুকু বলা যেতে পারে যে, শ্রেণীসংগ্রাম ও বিপ্লব জৈবধর্ম নয় কেননা কোনো বায়লজির বইয়ে

কোনোরূপ শ্রেণীসংগ্রাম বা বিপ্লবের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় নি। শ্রেণীসংগ্রা কাহিনী মানবের ঐতিহাসিক জীবনের, মানবের বহুবিচিত্র মানবিকতা চলমান ছায়াচিত্র। শ্রেণীসংগ্রাম সাহিত্যে স্থান পাবে কি না, তা কো ব্যক্তির ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর নির্ভর করে না। ইতিহাসের প্রথম প্র থেকে এ পর্যন্ত এমন কোনো সাহিত্য রচিত হয় নি যা শ্রেণীবদ্ধ মানু জীবনকাহিনী নয় এবং অতএব যা প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে শ্রে সংগ্রামের অভিব্যক্তি নয়। সুতরাং প্রগতিপন্থীরা সাহিত্যে শ্রেণীসংগ্রাম সত্যনিষ্ঠ ও যথাযথ চিত্র আঁকতে চান বলে তাঁরা সাহিত্যের ঐতিহ্য অস্বীকার করছেন, সাহিত্যের জাত নষ্ট করছেন এবং মানুষের মনুষ্য অপমান করছেন, এ অভিযোগের কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। বরং ব যায় যে, যাঁরা শ্রেণীবদ্ধ ও শ্রেণীসংগ্রামে নিযুক্ত মানুষকে পশুর তুল্য মনে করে তাঁদের হাতেই ঘটছে মানুষের মনুষ্যত্বের চরম অপমান।

তারাশঙ্কর প্রশ্ন করছেন: "কই, কোথায় এমন সাহিত্য যার নায়কে একমাত্র গুণ সে শুধু রাজা, শুধু সামন্ত, শুধু ধনী, শুধু ব্রাহ্মণ?" (আধুনি কাল ও সাহিত্য)। এমন কোনো সাহিত্য অবশ্যই নেই। রাজা, সামন্ত ধনিকের "ক্রোধ, হিংসা, লোভ"-এর বলি হয়ে এসেছে যে সব শোষি শ্রমজীবী মানুষ, তাদের পক্ষাবলম্বন করে প্রগতিপন্থীরা সাহিত্যসৃষ্টি কর চান বলে তাঁরা এই ভুলটা করেন না যে, রাজা, সামন্ত ও ধনিক শুধুই রাজ সামন্ত ও ধনিক, তাঁরা মানুষ নন, মানবসভ্যতার ছাপ তাঁদের উপর একটু পড়ে নি, মানবধর্ম থেকে তাঁরা সম্পূর্ণ বঞ্চিত। এই ধরনের কথা যাঁরা বলে তাঁরা নাইহিলিস্ট, যদিও তাঁদের কেউ কেউ হয়তো নিজেদের সাচ্চা প্রগতি বলে মনে করেন। কিন্তু তারাশঙ্কর বলছেন, সাহিত্যে বরাবর দেখা গিয়ে যে, "যিনি নায়ক তার নায়কত্ব অধিষ্ঠিত রাজ্যে নয়, ধনে নয়, সম্পত্তিতে ন জন্মগত অধিকারে লব্ধ উপবীতে নয়, নায়কত্ব অধিষ্ঠিত ন্যায়ে নীতিতে অ পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বে" (আধুনিক কাল ও সাহিত্য)। এইখানটাতেই প্রগতি পন্থীদের ঘোরতর আপত্তি। অতীত যুগের সাহিত্যে দরিদ্রের, অত্যাচারিত ও শোষিতের প্রতি মমতা, তাদের বাস্তব জীবনের চিত্রণ এবং তাদ পক্ষাবলম্বন করে জীবননাট্যকে দেখার চেষ্টা যে একেবারে দেখা যায় না এ নয়। কিন্তু মোটের উপর রাজা, সামন্ত ও ধনিকের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এ তাঁদের পক্ষাবলম্বন করেই অতীত সাহিত্য রচিত হয়েছে। সাহিত্যিক এই

শ্রেণীর নায়কদের "পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের" ছবি এঁকেছেন বলেই কি মানতে হবে যে, এঁরা এবং এঁদের শ্রেণীর মানুষেরা শোষক ও পরপীড়ক ছিলেন না, তাঁদের মধ্যেই মানবতার চরম অভিব্যক্তি ঘটেছিল এবং সাহিত্য চিরকালই "অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে আসছে, অমানুষের সঙ্গে মানুষের সংগ্রামের কাহিনীই সাহিত্যের মর্মকথা"? (আধুনিক কাল ও সাহিত্য) এটা হল সাহিত্যিকের আত্মপ্রতারণা, অত্যাচারিতের ও শোষিতের প্রতি সাহিত্যিকের ছলনা, সত্যের সিংহাসনে মিথ্যার প্রতিষ্ঠা।

এই ছলনার ও মিথ্যার শাসন থেকে সাহিত্যকে মুক্ত করার চেষ্টা অতীতেও কিছু কিছু হয়েছে। যাঁরা তা করেছেন তাঁরা আমাদের নমস্য। তাঁদেরই মহৎ দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে প্রগতিপন্থীরা আজ শোষিত মানুষের পক্ষাবলম্বন করে তাকেই নায়কত্বের পদে বরণ করে সাহিত্য রচনা করতে চাইছেন। এর পিছনে যে প্রেরণা রয়েছে তা কেবলমাত্র মানবহৃদয়ের সুকুমার গুণাবলীর প্রেরণা নয়। তারাশঙ্কর প্রশ্ন করছেন: "পৃথিবীতে কি তবে নায়কত্ব অর্জনের একমাত্র গুণ দারিদ্র্য?…দরিদ্রও যেখানে নায়ক—সেখানেও দারিদ্র্যের জন্যই সে নায়ক নয়—নায়ক সে মহিমান্বিত মনুষ্যত্বে অধিষ্ঠিত বলে" (আধুনিক কাল ও সাহিত্য)। দরিদ্র অর্থাৎ শোষিত মানুষ সাহিত্যের নায়কত্ব অর্জন করে এ কারণে অবশ্যই নয় যে সে দরিদ্র। প্রকৃত কারণ এই যে, মূলতঃ জনসাধারণই বরাবর ইতিহাসের স্রষ্টা এবং এবং বিশেষ করে সমসাময়িক কালে শোষিত, শ্রমজীবী মানুষই পৃথিবীময় ইতিহাসের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছে এবং নতুন এক শোষণহীন মানবসভ্যতা গড়ে তুলেছে বা গড়ে তুলতে চাইছে। দরিদ্র ইতিহাসের তথা সাহিত্যের নায়ক হয়, "সে মহিমান্বিত মনুষ্যত্বে অধিষ্ঠিত বলে" আমরা তারাশঙ্করের সঙ্গে এতদূর যাব না। সত্য বটে যে, মানবিকতায় ও চরিত্রগুণে নিপীড়িত ও শোষিত মানুষ শোষকশ্রেণীর মানুষের চেয়ে অনেক শ্রেষ্ঠ। বড়ই দুঃখের বিষয়, অনেক "প্রগতিপন্থী" সাহিত্যিক তথাকথিত "বাস্তববাদী" সাহিত্য রচনা করতে গিয়ে এই মূল সত্যটিকেই ভুলে যান। কিন্তু শোষিত মানুষকে নায়কত্বের পদে অধিষ্ঠিত করে আমরা তাকে কিং আর্থার বা রামচন্দ্র বানাতে চাই না। শোষিত, শ্রমজীবী মানুষ তারাশঙ্করকথিত "মহিমান্বিত মনুষ্যত্বে" বা "পূর্ণ মনুষ্যত্বে" অধিষ্ঠিত এখনও হয় নি, কিন্তু তাই সে হতে চায়। এই জন্যেই তার শ্রেণী-সংগ্রাম, তার বিপ্লব, তার নতুন সভ্যতা গড়ার চেষ্টা। এই নতুন সভ্যতার

বাহনরূপে প্রগতি সাহিত্য "সুন্দর ও মঙ্গলের আশ্রয়"-ই হতে চায়। তারাশঙ্কর এর মধ্যে শুধু "ক্রোধ, হিংসা ও লোভ"-কেই, দেখতে পাচ্ছেন

মানবিকতা ও মনুষ্যত্ব ইতিহাসের ও মানবসভ্যতারই সৃষ্টি। কল্পলোকেই তা জন্মায় না। "পূর্ণ মনুষ্যত্বের" চিত্র রামায়ণে, মহা ও রঘুবংশে আছে বলেই কি মনে করতে হবে, মনুষ্যত্ব ওই এগুতে পারে, তার বেশি নয়? দরিদ্রের মুক্তির, মানবিক অধিকার মনুষ্যত্বের সনদ সাহিত্যে ঘোষিত হয়েছে বলেই কি মানতে হবে যে, সে দরিদ্র ও শোষিত নয়, ইতিমধ্যেই সে মুক্ত, অধিকারপ্রাপ্ত ও "পূর্ণ মনু অধিষ্ঠিত, তার পক্ষে সংগ্রামের, বিপ্লবের ও নতুন সভ্যতা সৃষ্টি করার আবশ্যকতা নেই এবং যাঁরা তাঁদের দুঃখ, দারিদ্র্য, অভিযোগ, লড়াই ও সভ্যতা গড়ে মনুষ্যত্ব লাভের প্রচেষ্টাকে সাহিত্যে প্রতিফলিত করতে তাঁরা সাহিত্যকে করতে চান "হিংসা চরিতার্থতার হাতিয়ার"? আম শাসকেরা মধ্যে মধ্যে বলে থাকেন বটে যে, যেহেতু ভারতীয় সংবি নির্দেশমূলক নীতিতে পূর্ণ মানবমুক্তি ও পূর্ণ সমাজতন্ত্র ঘোষিত হয়েছে, যাঁরা এর জন্যে ধর্মঘট ও মিছিল প্রভৃতি করেন, তাঁরা সমাজের শত্রু। সাহিত্যসম্রাটরাও কি ওই একই কথা বলবেন?

মানবসমাজের ও সভ্যতার ইতিহাসে ওই যে নতুন শ্রেণীর নতুন মা অভ্যুদয় হয়েছে, যা নতুন সভ্যতা গড়ে শ্রেষ্ঠতর মনুষ্যত্ব সৃষ্টি করতে চায় পৃথিবীর মহাকবিদের স্বপ্নকে সফল করতে চায়, প্রগতি সাহিত্য স্বপক্ষে। তার রুদ্ররূপ দেখে আমরা সহসা ভীত হয়ে পড়তে পারি, চিত্তদৈন্যের বশে যদি বুঝতে না পারি যে, অহিংসা, মৈত্রী ও প্রেম ভিত্তিতে মানবসমাজ গড়ে তোলাই তার লক্ষ্য, সেটা আমাদের দুর্ভাগ্যে কথা। তার ends যদি মহিমময় হয়, তার means'ও মহিমময়। উচ্চ দর্শন কি বলে জানি না, তবে বিজ্ঞান এই কথাই বলে।

এই নতুনকে চিত্রিত করতে গিয়ে প্রগতি সাহিত্য অনেক ভুল ক অনেক শিল্পকলাগত অপরিপক্কতার ও বিভ্রান্তির পরিচয় দিচ্ছে, একথা কিন্তু এই নতুন শ্রেণীর নতুন মানুষের পক্ষ অবলম্বন করা কি সাহিত্যিক সাহিত্যের ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা? একদা যখন তারাশঙ্কর প্র সাহিত্যের প্রতি প্রসন্ন ছিলেন, তখন তিনি নিজেই বলেছিলেন: "ঐ কি? ঐতিহ্য কি কতকগুলি নীতি?...মাটির প্রদীপে সন্ধ্যায়

জ্বালানই কি ঐতিহ্য না অন্ধকারে আলোর ব্যবহার জানাটাই ঐতিহ্য?" (আধুনিক সাহিত্য ও সমাজ) এর চেয়ে ভালোভাবে কথাটাকে বলা যেত না। সুতরাং সমসাময়িক দুর্দিনের অন্ধকারে যে নতুন শ্রেণীর মানুষ নতুন আলো নিয়ে আমাদের কাছে এসেছে, কেন তাকে অভ্যাগত জানাব না?

তারাশঙ্কর একদিন বাংলা সাহিত্যে নতুন ও পুরাতনের দ্বন্দ্বে নতুনের অবশ্যম্ভাবী জয় ও পুরাতনের অন্তর্ধানকে দেখাতে পেরেছিলেন বলেই তিনি বড় সাহিত্যিক হয়েছিলেন। ব্যক্তিজীবনের চিত্রণই কথাসাহিত্যের কেন্দ্রস্থল, এই নীতি পালন করেও তিনি সেদিন ব্যক্তিজীবনকে সামাজিক ও রাজনীতিক পরিবেশে বিধৃত করতেন। পুরাতনের প্রতি মমতা তিনি পরিত্যাগ করতে পারেন নি এবং নতুনের বহু সত্য ও বহু মহত্তর সম্ভাবনা তাঁর দৃষ্টি অবশ্যই এড়িয়ে গিয়েছিল। তবু তিনি বাংলা সাহিত্যে প্রগতির মহৎ ঐতিহ্য স্থাপনে সহায়তা করেছিলেন। কিন্তু সাহিত্যে প্রগতির পথ পরিত্যাগ করার পর তাঁর সাহিত্যসৃষ্টিরই কি কোনো উন্নততর বিকাশ ঘটেছে? আমার তা মনে হয় না। মনে হচ্ছে যে, সপ্তপদী তাঁর খুব প্রিয় রচনা। দেখলাম তিনি একাধিক বার বইটিতে কৃষ্ণেন্দু চরিত্রের উল্লেখ করেছেন। কিন্তু বিপুল ভাবোন্মাদে উদ্বেল এই উপন্যাসটি প্রকৃতপক্ষে মেলোড্রামার চেয়ে উচ্চতর স্তরে উঠতে পারে নি। চরিত্র কল্পনার অপরূপ মৌলিকতা সত্ত্বেও পঙ্ক পুত্তলী উপন্যাসটি কাদামাটিই থেকে গেছে, মূর্তি হয়ে গড়ে উঠতে পারে নি; সর্বপ্রকার কৃত্রিমতার চাপে এই উপন্যাসটি অর্ধসিদ্ধ, দিশাহারা ও ব্যর্থ। আরোগ্য নিকেতন বড় উপন্যাস হতে পারত, কিন্তু তারাশঙ্কর প্রথমেই নায়ককে আধা-কবিরাজ ও আধা-ডাক্তার বানিয়ে উপন্যাসটির জাত নষ্ট করে দিয়েছেন। ফলে আয়ুর্বেদের সহিত আধুনিক ডাক্তারি শাস্ত্রের সামাজিক দ্বন্দ্বটি এই উপন্যাসে নিতান্ত প্রাণহীন ও কৃত্রিমভাবে চিত্রিত হয়েছে এবং এই দ্বন্দ্বের পরিণতিও এত কৃত্রিম যে তা প্রায় একটা প্রহসন। তুলনায় হাঁসুলি বাঁকের উপকথা অনেক উঁচু দরের উপন্যাস। বাস্তব সামাজিক দৃষ্টি পরিত্যাগ করে তথাকথিত শাশ্বত মূল্যের আলেয়ার পিছনে ঘোরাঘুরি করে তারাশঙ্করের উপন্যাস ও বাংলা সাহিত্য কতদূর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তা ভাবলে সত্যিই দুঃখ পাই।

মাটির প্রদীপ জ্বালানো নয়, আলোর ব্যবহার জানাটাই 'ঐতিহ্য, পুনর্বার একথা স্মরণ করে এই সমালোচনা সাঙ্গ করি।

প্রেমের গল্প ও মেজাজের গল্প

অমল দাশগুপ্ত

যুদ্ধোত্তর যুগের দুজন শক্তিমান লেখকের দুটি সাম্প্রতিক গল্পের বই*। প্রথম বইটি প্রকাশিত হয়েছে গত বছরের জ্যৈষ্ঠ মাসে, দ্বিতীয়টি অগ্রহায়ণ মাসে। কাজেই মোটামুটি ধরে নেওয়া চলে যে এই দুজন লেখকের গত পনেরো বছরের সাহিত্যসাধনার পরিণত রূপ এই দুটি বইয়ে পাওয়া যাবে।

চারটি গল্প আছে 'অঙ্গীকার'-এ। চারটিই নিটোল ও ভরাট গল্প। অন্তত গঠনকার্যের দিক থেকে কোনো রকম খুঁত নেই। মনে হতে পারে, অভিজ্ঞ স্থপতি যেন অতি সাধারণ মালমশলা দিয়ে অতি চমৎকার এক-একটি ইমারত গড়ে তুলেছেন। অবশ্য সেই ইমারতের ভিত কতখানি পাকা আর সেই ইমারতের দরজা-জানলা দিয়ে কালের হাওয়া কতখানি চলাচল করতে পারছে—এসব প্রশ্ন থেকেই যায়।

চারটি গল্পেরই ভিত্তিভূমি স্ত্রী-পুরুষের প্রেম। এবং প্রত্যেকটি গল্পেই এই প্রেমের সম্পর্ক এক-একজন সাধারণ মেয়েকে অসাধারণ করে তুলছে। যেমন 'জয়ন্তী' গল্পের জয়ন্তী। অতি সাধারণ একটি গ্র্যাজুয়েট মেয়ে, কিন্তু তরুণী ও সুন্দরী। পঞ্চাশের প্রায় কাছাকাছি বয়সের প্রৌঢ় শৈলেশ্বরের সঙ্গে তার যে সম্পর্ক তা পুরোপুরি প্রেমের সম্পর্ক নয়। অন্তত শৈলেশ্বরের ছেলেমেয়ে ও স্ত্রী এবং সর্বোপরি তার বয়েস এই সম্পর্ক হবার পক্ষে মস্ত বাধা। কিন্তু এই সম্পর্কটুকুই জয়ন্তীকে শেষ পর্যন্ত সার্থকতার দিগন্তে পৌঁছে দিল। 'বিকল্প' গল্পের সুধার জীবনে কিন্তু পুরোপুরি চলিত অর্থেই প্রেম এসেছিল। কিন্তু এক্ষেত্রে বাপের নিষ্ঠুরতার জন্যে প্রেম চলিত অর্থে সার্থক হয়ে উঠতে পারে নি। কিন্তু তার ফলে সুধার অস্তিত্ব ফুরিয়ে যায় না, এক আশ্চর্য নতুন জীবনবোধে তন্নিষ্ঠ হয়ে ওঠে। 'অঙ্গীকার' গল্পের নীলা স্বামীর কাছ থেকে প্রেম পায় নি এবং অন্য একজন পুরুষের প্রেমেও সে

*অঙ্গীকার। নরেন্দ্রনাথ মিত্র। রবীন্দ্র লাইব্রেরী। আড়াই টাকা।

সাপের মাথার মণি॥ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। এভারেস্ট বুক হাউস। আড়াই টাকা।

সাড়া দিতে পারে নি। ফলে তার জীবনে যে-সব ঘটনা ঘটেছিল তা যে-কোনো সাধারণ মেয়েকে ধূলিসাৎ করে দিতে পারত। কিন্তু নীলার জীবনের ট্র্যাজেডিই তাকে অসাধারণ করে তোলে, জীবনের নতুন এক তাৎপর্য খুঁজে পায় সে। এই তিনটি মেয়েই প্রেমের মর্যাদাকে কোনো দিক থেকে এতটুকু ক্ষুণ্ণ করে নি। কিন্তু 'চেক' গল্পের সরসী প্রেমের মর্যাদার আসন থেকে বিচ্যুত হয়ে চরম পদস্খলনে অধঃপতিত হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত তার প্রেমই তাকে বাঁচিয়ে দেয়।

আগেই বলেছি, চারটিই নিটোল ও ভরাট গল্প। পরিপাটি, পরিচ্ছন্ন ও গঠনকার্যের দিক থেকে নিখুঁত। তাছাড়া প্রত্যেকটি গল্পেই এমন অন্তরঙ্গ মেজাজ তৈরি হয়েছে যা শেষ পর্যন্ত পাঠককে খানিকটা আচ্ছন্ন করে। আর সবচেয়ে বড়ো কথা, গল্পের মানুষগুলো আমাদের এতবেশি চেনা, এতবেশি আপন যে তাদের চিন্তাভাবনার অংশীদার হতে আমাদের কিছুমাত্র বেগ পেতে হয় না। মনে হয় যেন আমরা নিজেদেরই খানিকটা অংশ দেখছি, নিজেদের কথাই শুনছি। অর্থাৎ, এককথায়, নরেন্দ্র মিত্রের গল্প পড়ে কিছুতেই পুরোপুরি নির্বিকার থাকা সম্ভব নয়, গল্পের পাত্রপাত্রীর ভাবনায় কিছুটা ভাবিত হতেই হয়। গল্পলেখকের পক্ষে এটি কম কৃতিত্বের পরিচয় নয়।

কিন্তু তা সত্ত্বেও অন্য কথাটা থেকেই যায়, যে কথাটা এর আগে গল্পকে ইমারতের সঙ্গে তুলনা করতে গিয়ে বলেছি। ইমারতের চমৎকারিত্ব নিশ্চয়ই একটা বড়ো গুণ কিন্তু সার্থকতার একমাত্র মাপকাঠি নয়। সেখানে এমনভাবে দরজা-জানলা ফোটানো দরকার যাতে কালের হাওয়া চলাচল করতে পারে। এ অভিজ্ঞতা আমাদের সকলেরই আছে যে জানলা ও দরজা যদি শুধু একদিকেই খোলা থাকে, এমন কি সে-দিকটি যদি দক্ষিণ দিকও হয়, তাহলেও তা হাওয়া চলাচলের পক্ষে অনুকূল অবস্থা নয়। এ-অবস্থায় বাইরে ঝড় উঠলেও ভেতরের গুমোট কাটে না। নরেন্দ্র মিত্রের গল্পেও অন্য সমস্ত মনোহারিত্ব সত্ত্বেও এমনি একটা গুমোট আছে। মনে হয় একই গল্পকে তিনি নানা চেহারা দিতে চেষ্টা করছেন। আর তার ফলে আলাদা আলাদা চেহারার মানুষগুলো কেমন যেন একাকার হয়ে যায়। যেমন, সাতরঙা সূর্যের আলোর সবকটি রঙ যখন একসঙ্গে কোনো একটি মানুষের মুখের ওপরে পড়ে তখন সেই মুখটি অবশ্যই ভাস্বর হয়ে ওঠে।

কিন্তু এই সাতরঙা আলোর কোনো একটি বিশেষ রঙকে বাছাই করে সেই একটিমাত্র রঙের আলোয় মানুষের মুখকে তুলে ধরার চেষ্টা করলে সবকটি মুখকে একই রকম মনে হবে। এবং প্রথম দেখার নতুনত্ব কেটে যাবার পরেই এ-ধরনের একাকার দেখায় খানিকটা একঘেয়েমি আসতে বাধ্য।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্প কিন্তু এই গুমোট আবহাওয়া থেকে আশ্চর্যরকমের মুক্ত। যে কোনো পাঠক লক্ষ্য করবেন, লেখকের দায়িত্ব সম্পর্কে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় অত্যন্ত সচেতন। কালের হাওয়ার প্রত্যেকটি আবর্ত তাঁর গল্পে পথ খুঁজে পায়। নানা রঙের আলোয় মানুষকে তুলে ধরার ক্ষমতা তাঁর আছে। তিনি যে গল্পের ইমারত খাড়া করেন সেখানে অবারিত রোদ ও হাওয়া। এমন কি কখনো কখনো একথাও মনে হতে পারে, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে ইমারত বা গল্পটা গৌণ; বিশেষ একটি বক্তব্য তিনি শোনাতে চান, সেজন্যে—শুধু সেজন্যেই—তিনি একটি গল্পের আশ্রয় নিয়েছেন।

'সাপের মাথার মণি' বইয়ের পনেরোটি গল্পকেই এই বক্তব্যের দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করা চলে। প্রত্যেকটি গল্পের স্পষ্ট ও প্রখর বক্তব্য আছে, এতবেশি স্পষ্ট ও এতবেশি প্রখর যে মনে হতে পারে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সম্ভবত হাল আমলের উদ্দেশ্যহীন গল্পের জবাবে সচেতনভাবে উদ্দেশ্যপূর্ণ গল্প লিখতে বসেছেন। তাতে তাঁর নিজের উদ্দেশ্য সার্থক হয়েছে বটে কিন্তু অতি-প্রকট উদ্দেশ্যের ভারে গল্পের চরিত্র কিছুটা ক্ষুণ্ণ হয়েছে মনে হয়। একটি উপমা দিয়ে কথাটিকে আরেকটু স্পষ্ট করতে চাই। গায়ক যখন আসরে বসেন তখন তাঁর চেষ্টা থাকে তান ও লয়ের সমন্বয়ে অখণ্ড সুরসৃষ্টির দিকে। কিন্তু গায়ক যখন বাইরের রাস্তা দিয়ে চলেন তখন এই বিচিত্র জগতের নানান দৃশ্য ও গন্ধ তাঁর কণ্ঠে নানান সুর হয়ে বেজে ওঠে। তান ও লয়ের সমন্বয়ে অখণ্ড সুরসৃষ্টি তা নয়, গায়কের আনন্দ ও অনুভূতি দিয়ে গড়া খণ্ড খণ্ড ঘোষণা। লেখক হিসেবে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ও এই দলের।

প্রথম গল্পের নাম 'খাঁচা'। শান্তিপ্রিয় নিরীহ অধ্যাপক সরোজ শাসন করতে গিয়েছিল বনানী নামের এক ডানপিটে বুনো মেয়েকে, যার সঙ্গে তাঁর বিয়ে হবার কথা নিজের মায়ের মুখ থেকে সরোজ আগেই শুনেছে।

শাসনের পরিণতিতে শেষ পর্যন্ত দেখা গেল বনানীর পাখির জন্যে সরোজ একটি খাঁচা কিনে এনেছে আর সেই খাঁচা দেখে "বুনো কী বুঝল কে জানে। দুরন্ত দুষ্টু মেয়েটা সোজা পালিয়ে গেল ঘরের মধ্যে। শুধু চকিতের জন্যে কালো চোখের এক পশলা বিদ্যুৎ দেখতে পেলো সরোজ।" শেষ গল্প 'সাপের মাথার মণি'। ন-বছর বয়সের খুকু পর-পর পাঁচদিন একটা সাপ দেখেছিল। সাপটাকে দেখে খুকুর মনে হয়েছিল "একদিন ঠিক সাপটা তার সামনে এসে ফণা তুলে দাঁড়াবে, ঠিক মানুষের ভাষায় বলবে: শোনো খুকু—তোমাকে ভারী পছন্দ হয়েছে আমার। বড্ড ভালো মেয়ে তুমি। তাই আমার মাথার মণিটা তোমায় দিতে এলাম। টুক করে তুলে নাও—এখুনি।" তারপর দু-দিন সাপটার দেখা পায় নি। আট দিনের দিন আবার সাপটার দেখা পেল বটে কিন্তু সেদিনই একটা সাপুড়ে এসে সাপটাকে ধরে নিয়ে গেল। "সেদিন সারারাত খুকু ঘুমুতে পারল না। থেকে থেকে একটা দমচাপা কান্না ফেটে পড়তে লাগল বুকের মধ্যে। লোকটা তার সাপকে ধরে নিয়ে গেছে, কেড়ে নিয়ে গেছে সাপের মাথার মণি। আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখল একটা তারা নেই, সব ঢেকে গেছে মেঘের আড়ালে। যন্ত্রণা। এ-যন্ত্রণা কাউকে বলা যাবে না, কেউ বুঝবে না।" তেরো বছর পরে খুকুর বয়স যখন বাইশ তখন আবার সেই যন্ত্রণার স্বাদ পেল নতুন করে। দু-দুটো মেয়েকে পথে বসিয়ে এসেছে—মহীনের এই পরিচয় জানতে পেরে খুকুর দাদু মহীনকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিলেন আর তখন "তেরো বছর আগেকার সেই বেদনা তার (খুকুর) বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে উঠছে নতুন করে। সেই যন্ত্রণা যা কেউ বুঝবে না, যা কাউকে বোঝাবার নয়। সাপকে ভয় করে সকলেই, কিন্তু সাপের মাথার মণির সন্ধান পায় কজন? শুধু খুকু পেয়েছিল। সে-মণি পৃথিবী তার কাছে থেকে কেড়ে নিচ্ছে। একবার নয়। বার বার।" এই প্রথম ও শেষ গল্পের মাঝখানে আরো যে তেরোটি গল্প আছে তাও এই একই ধরনের। 'ব্লেড' গল্পের হিরণ্য সোম সকালবেলা একটা ভোঁতা ব্লেডে দাড়ি কামিয়েছিল, মুখ মসৃণ হয় নি, একটা খরখরে ভাব থেকেই গিয়েছিল। ফলে "ঝকঝকে তকতকে ফিটফাট" হিরণ্য সোম দারুণ একটা অস্বস্তি নিয়ে আপিসে রওনা হল এবং সেই অস্বস্তি ক্রমেই বেড়ে চলল। চারদিকে যা-কিছু দেখে তাতেই মনে পড়ে যায় যে ভালো

করে দাড়ি কামানো হয় নি। অথচ আপিসের মিস শিখা ঘোষের স বিকেলবেলা একসঙ্গে চা খাবার কথা। এমনি অবস্থায় ট্রামে আপি যাবার সময় লেডীজ সীট ছেড়ে দিতে গিয়ে একটি মেয়েকে উদ্দেশ ক এক কুৎসিত মন্তব্য করে বসল এবং ঘটনাচক্রে দেখা গেল মেয়ে আপিসেরই শিখা ঘোষ। হিরণ্যর মনে হতে লাগল, "ব্লেড আজ সত্যি ভোঁতা হয়ে গিয়েছে। তিলে তিলে ক্ষয়ে গেছে তার ধার— নিভে গেছে তা উজ্জ্বলতা। আর তা কোনো কাজেই লাগবে না।"

গল্পগুলো খুবই ছোট ছোট। অধিকাংশ গল্পে একটিমাত্র মানুষ একটিমাত্র ভাবনার আলোকে তুলে ধরা হয়েছে। তাতে ভাবনাটি য স্পষ্ট হয়েছে মানুষটি তত স্পষ্ট হয়েছে কিনা এ-নিয়ে দ্বিমত হতে পারে গাছের একটি বিশেষ ফুলকে দেখাবার জন্যে যদি অন্য সমস্ত ডালপা ছেঁটে ফেলতে হয় তবে ফুলটি খুবই স্পষ্ট হয় সন্দেহ নেই কিন্তু ফুলে রূপটি পুরোপুরি ফুটে ওঠে কিনা সন্দেহ।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের বর্ণনা সম্পর্কে একটি কথা বলার আছে কয়েকটি গল্প পড়ার পরেই মনে হতে থাকে, যে-কোনো উপলক্ষে এক ধরনের বর্ণনাকে যেন বারবার হাজির করা হচ্ছে। একটি দৃষ্টান্ত দিলে বক্তব্যটি স্পষ্ট হবে। 'সাপের মাথার মণি' গল্পের খুকু দেখেছিল সাপে ফণার ওপরে অদ্ভুত চিহ্ন রয়েছে; তার মা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, "ওটা কে ঠাকুরের পায়ের ছাপ। যখন কালীয় নাগ দমন করেছিলেন, সে তখনকার।" খুকুর বয়েস মাত্র নয়, তা সত্ত্বেও "খুকু জানে। তবু এই বিকে বেলায়, মস্ত থালার মতো লাল সূর্যটা হঠাৎ যখন টুপ করে ডুবে যায়, আ হাওয়ায় হাওয়ায় বুনো ধুতরোর মতো বিকেলের গন্ধ ভাসে, আর কাঠবাদা গাছটার ডাল থেকে ঝুপ করে এক-একটা বাদুড় উড়ে গেলে কাকে ডাকাডাকি যখন কান্নার মতো শোনায়"—ইত্যাদি। 'চায়ের বিকেল' গ অমিতাভ এসে বসেছে মনোজের বৈঠকখানায়। নিজের বিবাহিত জীব সম্পর্কে অমিতাভর প্রচণ্ড একটা বিতৃষ্ণা আর মনোজের বিবাহিত জীব সম্পর্কে প্রচণ্ড একটা ঈর্ষা। এই অবস্থায় নিজের ছেলের অসুখের খ দেবার পরে "কথা বলতে বলতে পা-দুটোকে কখন গুটিয়ে এনেছিল, আবা তাদের টেবিলের তলা দিয়ে ছড়িয়ে দিলে অমিতাভ, যেন একটা নিশ্চি বিশ্রামে এলিয়ে দিতে চাইলে নিজেকেও। বাইরে নিশ্চয় সূর্য ডুবে যা

এখন—আকাশে কালকূটের মতো সন্ধ্যা। ট্রামের চাকাগুলো অসহ্য ক্লান্তিতে লাইনের মধ্যেই কর্ণের রথচক্রের মতো বসে যেতে চাইছে। রঙিন পর্দা থেকে ছড়িয়ে পড়া আলোর ঢেউ এই ঘরের মধ্যে যখন ক্রীমের গন্ধে ধূপের ধোঁয়ার মতো রঙ ধরছে, তখন বাইরের পৃথিবীতে একটা ছেঁড়া কালো কম্বলের মতো দম-আটকানো রাত্রি সঞ্চারিত হয়ে পড়ছে। খুট করে সুইচের আওয়াজ হল, ওয়াটার-লিলির মতো ফুটে উঠল ঘরখানা।" লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে বর্ণনাদুটির মধ্যে যদিও শব্দের মিল নেই কিন্তু দৃষ্টিকোণের মিল আছে। উপলক্ষ আলাদা, পাত্র আলাদা, কিন্তু বর্ণনার ধরন একই বয়সের একই মেজাজের। ফলে প্রথম-পড়ার ভালো-লাগাটুকু কেটে যাবার পরে মনে হতে থাকে এ-ধরনের বর্ণনা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্প জমাবার একটা কৌশল মাত্র। গল্পের বিষয়বস্তু ব মেজাজের সঙ্গে বর্ণনার কোনো মিল নেই।

শুধু এই দুটি বইয়ের ভিত্তিতে এই দুজন লেখকের মধ্যে কোনো তুলনাগত বিচার চলে না। তবুও একটি মন্তব্য করা চলে। নরেন্দ্র মিত্র মানুষকে দেখছেন তাঁর নিজের তৈরি একটি সীমানার মধ্যে তাকে দাঁড় করিয়ে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সেই মানুষকেই দেখছেন নিজের তৈরি একটি সীমানার মধ্যে নিজে দাঁড়িয়ে। দুয়ের মধ্যেই অসম্পূর্ণতা আছে। এই সীমানা ভাঙলে নরেন্দ্র মিত্র যেমন সব মানুষকে দেখতে পাবেন না, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ও তেমনি মানুষের সবটুকু দেখতে পাবেন না। তবে এই দুজন লেখকেরই শক্তিমত্তার ওপরে আমাদের আস্থা আছে, তাঁদের তারুণ্য এখনো নিঃশেষ হয় নি—কাজেই এখনো আমরা আশা করতে পারি যে নরেন্দ্র মিত্র ও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় নিজের নিজের তৈরি সীমানা ভেঙে বেরিয়ে এসে নতুনতর সৃষ্টিতে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করবেন।

গল্পের আমি : তিনজন লেখক

মতি নন্দী

যদি কুয়ো থেকে পঞ্চাশ গজ দূরে দাঁড়িয়ে তলদেশের জল দেখার চেষ্টা করি, তাহলে উপরের শূন্য বৃত্তটি ছাড়া কিছুই চোখে পড়বে না। পা-পা করে এগিয়ে এলে উপর থেকে নীচে এবং ক্রমশ তলদেশের জল দেখতে পাব।

বাংলা গল্পের বয়স প্রায় সত্তর, শুরুতে গল্পকাররা জীবনের উপরিভাগের বৃত্তটুকুই দেখেছিলেন, কেউ কেউ ভর-গোড়ালি কৌতূহলে উঁকিঝুঁকি দেবার চেষ্টাও করেছিলেন। তারপর চলার শুরু। প্রথম মহাযুদ্ধের পর পৃথিবী-ব্যাপী মন্দার সময় একলাফ। তারপর সেই লাফের ধাক্কায় দ্রুতচলা। দ্বিতীয় লাফ বাংলা গল্পের ভাগ্যে এখনো সম্ভব হল না। তা সত্ত্বেও আমরা কুয়োর কিনারে পৌঁছে গেছি। ঘাড় হেঁট করেই এখন আমরা জল দেখি।

বাংলা গল্পের বাল্যাবস্থায় লেখকরা যে বর্তমান গল্প-লেখকদের তুলনায় বিদ্যাবুদ্ধিতে খাটো ছিলেন বা তাদের শিল্পানুগত্যে ভেজাল ছিল এমন সন্দেহের কারণ নেই। তবু জীবনের তলদেশ আবিষ্কারের ঝোঁক তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তখনকার সামাজিক, আর্থনীতিক এবং রাজনৈতিক অবস্থাগুলিতে এমন কোনো সমস্যা বা সংকট ঘনায় নি যার সঙ্গে আজকের অবস্থার তুলনা চলতে পারে। স্বাস্থ্যবান মানুষ যখন কথা বলে, হাঁটে, তখন সেটা হয় চড়া স্বরে, জোরে-জোরে। প্রাণ-প্রাচুর্যের স্বভাব ছটফটানি, লাফালাফি করা ; আপনাকে যেভাবেই হোক প্রকাশ না করে তার স্বস্তি নেই। এই প্রকাশের ধরনটা হয় ছড়িয়ে পড়ার, গভীরে নামার নয়। কিন্তু এই প্রকাশের স্ফূর্তি যখন বাইরের প্রতিবন্ধকতা পায়, তখনই ফিরে আসে নিজের মধ্যে। অক্ষম, রুদ্ধ অসহায়তায়, নয়তো আক্রোশে আত্মভুক সাপের মতো নিজেকেই নিজে আক্রমণ করে, ব্যর্থতার ক্ষোভে গুমরে মরে। সে গুমরানি নিজের মধ্যেই

পাক খায়, বাধ্য হয় আত্মসংস্থ হতে। বাইরের জগৎ থেকে মুখ ফিরিয়ে তখন নিজের দিকে তাকায়। গভীরে নামে। কোনো দেশের সর্বব্যাপী বৈষয়িক সমৃদ্ধির সময় সাহিত্যে গভীর কথা ধ্বনিত হয়েছে, এমন নজির সাহিত্যের ইতিহাসে বিরল।

একশো বছর আগে যখন বাংলা গদ্য ও পদ্য সাহিত্য পাঠযোগ্যভাবে লেখা আরম্ভ হল, তখন ইংরেজ শাসনের প্রতি স্বাগত-উল্লাস বিষম খেতে শুরু করেছে। সেই থেকে আজ পর্যন্ত নানান সমস্যা একে একে দেখা দিয়েছে। যে সমৃদ্ধি ও সুযোগ একদা ইংরেজ শাসনে প্রতিশ্রুত মনে হয়েছিল, একটির পর একটি বঞ্চনা এসে তার মোহভঙ্গ ঘটাল। সমস্যাগুলি জটিল থেকে জটিলতর হয়ে, জীবনের প্রতিটি শাখা-প্রশাখাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলল। আর, এক পা এক পা করে আমরাও গুটিয়ে এলাম। বাইরের জগতের দ্বার ক্রমশ রুদ্ধ হয়েছে, অন্তর্জগতের দ্বার খুলতে আমরা বাধ্য হয়েছি। তাই স্বাভাবিক ভাবেই প্রথম মহাযুদ্ধের পরেই সমস্যা ও সংকটকে স্বীকার করে নিয়ে বাংলা কাব্যের খোল-নলচে বদলে গেল, সঙ্গে সঙ্গে গল্প উপন্যাসেরও। এই বদলটা ঘটেছে আমূলভাবে, আঙ্গিকে ও বিষয়ে, লাফ দিয়ে। সংশয়, হতাশা, ব্যর্থতাবোধ মানুষকে বদলাতে শুরু করেছে, সঙ্গে সঙ্গে জীবন সম্পর্কিত মূল্যবোধগুলিকেও। এই রূপান্তরিত মানুষকে যে লেখকরা গল্পে ঠাঁই দিলেন তাদের আমরা আধুনিক লেখক বলতে শুরু করলাম, যারা আধুনিক মানুষকে ধরবার চেষ্টা করলেন না তারা পুরনো লেখক হিসাবে চিহ্নিত হয়ে গেলেন। সংকট কখনোই একভাবে থাকে নি। ধাপে ধাপে কখনো বা একটানা তীব্র হয়েছে। এর সঙ্গে তাল রাখতে না পেরে এককালের আধুনিক লেখক পাঁচ বছরের মধ্যেই যে অনাধুনিক হয়ে পড়েন তার সাক্ষ্য-প্রমাণের অভাব বাংলা দেশে নেই। এক্ষেত্রে কারণটা সময়কালের নয়, লেখকদেরই। শুধু মানুষ নয়, সঙ্গে সঙ্গে দেশ, কাল, ইতিহাস এবং সামাজিক সম্পর্কের কারণগুলিও যে অনুধাবন ও অধ্যয়নের প্রয়োজন আছে, তার অবহেলাতেই এই বিপত্তি।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বাংলা গল্প-লেখকদের ভালো গল্প লেখার সুযোগ করে দিয়েছে। সমাজ-জীবনে যে অসুস্থতা ধীরে ধীরে সংক্রামিত হচ্ছিল, তা এক ধাক্কায় চিকিৎসার নাগালছাড়া হয়ে গেল। স্নেহ, প্রেম, মমতা, দয়া ইত্যাদি স্বাভাবিক মানবিক ধারণাগুলি মৃত্যুমুখীন হল। রাজনৈতিক

স্বাধীনতা লাভের পর সমাজের প্রতিটি স্তরে যে সুস্থতা ধুঁকতে ধুঁকতে
ছিল, তার মৃত্যু ঘটল। এখন সেই মৃতদেহগুলি গলে-পচে দুর্গন্ধ ছড়া
করেছে, এই আবহাওয়া কোনোরকমেই কাম্য নয়। তাই সৎ লেখক
পরিবেশকে নির্মল করে তুলতে, মৃত মূল্যবোধগুলিকে নতুন করে
ব্যস্ত হয়েছেন। গত বারো বছর যাবৎ বহু লেখক বহুভাবে জীবনকে
চেষ্টা করেছেন, অভিজ্ঞতা অনুযায়ী এই গলিত জীবন থেকে মুক্তি চেয়ে
প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তী সাহিত্যিকরা যে জীবন ও কামনাকে
ধরেছিলেন, তারই সূক্ষ্ম ও অপরূপ কারিগরির বিকাশ আজও অন
বিকাশ এবং পরিবর্তন এক কথা নয়। আজও বাংলা সাহিত্যের দ্বিতী
তাই সম্ভব হয় নি।

যেসব লেখকরা বাণিজ্যিক কারণে গল্প লেখেন না, তাদের মধ্যে
গলিত শবটিকে আবিষ্কারের ব্যাকুলতা স্পষ্ট। এই সমাজের অধিবাসী
লেখকও, তাই বর্তমান সময়ের সংকট ও দ্বন্দ্বকে ধরবার জন্য তারা নি
মধ্যে ডুব দিলেন। আত্মানুসন্ধান তীব্র হয়ে দেখা দিল, তার ফল হয়েছে
যে, গল্প বলতে চিরকালের যে ধারণা আমাদের আছে, তার বদল ঘটল।

প্রচলিত ধারণায় গল্পে ঘটনাই হচ্ছে মুখ্য। ঘটনার ফলে বিভিন্ন চরি
ক্রিয়াকলাপই গল্পে দেখার বস্তু। অর্থাৎ ঘটনার মাতব্বরিই আমরা
যেমন দেখি নাটকে। কিন্তু মানসিক ব্যাপারগুলি এমনি জিনিস যা
যায় না, আবিষ্কার করতে হয়। প্রচলিত ধারণার গল্পে নাটকের স্বাদ
বটে, কিন্তু সময়ের বদলে মগজের খাদ্যেও রুচিভেদ ঘটে। আত্মানুস
সঙ্গে সঙ্গে নিজের মনের গতি-প্রকৃতিকেও অনুসরণ করতে হয়। অ
বহির্ঘটনার প্রভাবাধীন, কোনো স্বয়ম্ভূ ব্যাপার নয়। কাজেই
কাণ্ডকারখানা শুরু করার জন্য একটা-দুটো ঘটনা চাই। জলে ঢিল
যেমন ঢেউটা কাঁপতে কাঁপতে পাড়ের দিকে ছড়িয়ে যায়, ঘটনাও তেমনি
ফেলা। ঢেউয়ের দিকে তাকিয়ে ঢিলটার কথা আমরা তখনকার মতো
যাই, যা লেখকদের অন্তত ভোলা উচিত নয়। অর্থাৎ লেখবার সময়
এই ঢিলটা সম্পর্কে সচেতন থাকবেন কিন্তু লিখবেন ঢেউটাকে। কারণ
কার্যের কথা ভাবলে, উদ্ভটত্বকেই প্রশ্রয় দেওয়া হয়। সাধারণত
ঢিল, কত দূরে ছোঁড়া হল, তা-ই গল্পের সাফল্য নির্ধারিত করে। কিন্তু
যখন জীবনকে সৎভাবে দেখার চেষ্টা করেন, তখন অসম্ভব অবাস্তবকে

সেন না। ঘটনা যাদের জীবনে যৎসামান্য ঘটে, তারাও লেখকের কাছে ত্যাজ্য নন। যাঁর মধ্যে গতি নেই, নাড়াচাড়া নেই, তাকে জীবন বলে না। সুতরাং তাই নিয়ে গল্পও লেখা যায় না। মানুষটা বসে থাকলেও তার মন গতিবান, কাজেই জীবন এবং মনই গল্পের মুখ্য বিষয় হয়ে উঠেছে। সে জীবন-মন যারই হোক না। জীবনের গতিকে যদি নদী প্রবাহের মতো বলি, তাহলে গল্প হচ্ছে তারই এক আঁজলা জল, লেখক স্বচ্ছ কি ঘোলা জল তুললেন তা বোঝা যাবে, যখন লেখকের জীবন সম্পর্কিত চিন্তা সূর্যরশ্মির মতো এই জলে এসে পড়ে। জল যে-কেউই তুলতে পারেন, কিন্তু তাতে রশ্মি ফেলে সৌন্দর্য ফোটাতে সবাই পারে না। শিল্পী এ কাজ পারেন। সাম্প্রতিক বাংলা গল্পে যারা শিল্পীর সাধনায় মগ্ন, তাদের মধ্যে সন্তোষকুমার ঘোষ, ননী ভৌমিক এবং বিমল করও আছেন।

তিনজনের বাইশটি গল্প থেকে প্রথমেই চোখে পড়ে, পনেরোটি গল্প উত্তম-পুরুষ কথিত। ইদানীং দেখা যাচ্ছে তরুণ লেখকরাও 'আমি' ছাড়া গল্প লিখতে ক্রমশ আড়ষ্ট বোধ করছেন, কারণ আগেই উল্লেখ করেছি জীবনকে এরা দেখতে চাইছেন স্বীয় অভিজ্ঞতার কষ্টিপাথরে যাচাই করে। এক-একটি ঘটনার আলোড়ন কিভাবে ব্যক্তিচৈতন্যে তরঙ্গ তোলে, তার পরীক্ষা লেখকরা নিজেদের উপরেই করেন, তাতে খুঁটিয়ে বিশ্বস্তভাবে তার ফলাফলগুলো দাখিল করা সম্ভব হয়। অন্য ব্যক্তির ক্ষেত্রে কি ঘটতে পারত এই অনিশ্চয়তায় নির্ভর করতে হয় না। তাছাড়া যেহেতু লেখকরা অন্তর্মুখীন হয়েছেন তাই বলার কথাও আগের তুলনায় বেড়ে গেছে। এমন অনেক কথা তারা বলতে চান, যা যে কোনো চরিত্রের জবানীতে বলা সম্ভব নয়। 'পূর্বক্ষণ' গল্পটির 'আমি' হওয়া 'ধানকানা'র কোনো চরিত্রের পক্ষেই সম্ভব নয়, বস্তু অনুযায়ী তার আধার মনোনীত হয়। এবং চিন্তা যখন বুদ্ধিবাদী লেখকের, তখন গল্পেও বুদ্ধিমান, চিন্তাক্ষম মানুষের আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী।

অথচ এই উত্তমপুরুষের জবানীতে গল্প বলার অসুবিধাগুলি বহু তরুণ লেখকই আয়ত্ত করতে পারেন নি। সে কারণেই, এই তিন লেখকের গল্পগুলির মধ্যে তার সমাধান খুঁজে দেখতে চাই। একটা ব্যাপার বোঝা যাচ্ছে যে বলার কথা যদি না থাকে এবং সে কথাটি যদি বাস্তব জীবন-ভিত্তিক না হয় ; যুক্তি-শৃঙ্খলের নিগড়ে না বাঁধা থাকে ; দেশ, কাল, সমাজ পরিবেশের

সঙ্গে সঙ্গতি না রাখে ; তাহলে গল্পের অবস্থা যে কি করুণ, অসহায় হতে প
তার ভূরিভূরি প্রমাণ তরুণ লেখকরা দিয়েছেন এবং দিচ্ছেন। বলবার ক
দশটা-বিশটা নয়, একটিই হয়ে থাকে। মুস্কিল এই, 'আমি' গল্পে সেই ক
একটি রচনাতেই নিঃশেষ হয়ে যায়। দ্বিতীয় মুস্কিল, 'আমি' ব্যক্তিটি সব স
লেখকের অভিজ্ঞতার দায়টিকেই বয়ে বেড়ায়, ফলে 'আমি' গল্পগুলি
ক্রমাগত একটি গলাই শুনতে পাই, তা লেখকের। এক গলা বহুবার শু
ভালো লাগে না, এক গলায় কথা বলতেও। অথচ এভাবে কথা বলায় পা
কম লাগে তাই নয়, উত্তমপুরুষের জবানীতে চমকপ্রদ কথা বলে তড়িৎ প
আকর্ষণের সুযোগও বেশি। কাজেই এই ভঙ্গিটিকে হাতছাড়া কর
মায়া-মমতার আধিক্যটা স্বাভাবিক। এর ফলে তরুণ লেখকদের অবস্থা
হয়েছে ত্রিশঙ্কুর মতো। অভিজ্ঞতাকে জারিয়ে সার বস্তুটি নিষ্কাশিত ক
ক্ষমতা মস্তিষ্ক এখনো আয়ত্ত করে নি অথচ যে আঙ্গিক একমাত্র গভী
জীবনবোধকেই ধারণ করে, সেই আঙ্গিকেই গল্প লেখা বাসনা। সুতরা
উত্তমপুরুষে লেখা গল্পগুলি সফল হয়েছে কিনা এবং হয়ে থাকলে তার কা
কি, এই সমস্যার ফয়শালা হওয়াটা একান্ত জরুরী।

না। যে গল্পগুলিতে উত্তমপুরুষ জড়িত রয়েছে, গল্পের ঘটনা যার চেতনা
প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে এক চূড়ান্ত উপলব্ধিতে পৌঁছে দিচ্ছে, যার জন্যই গ
লেখা হয়েছে, সেই গল্পগুলি সমস্যার সমাধানে কোনো সহায়তাই কর
পারল না।

"সেই অপরূপা কিন্তু আমারই একান্ত সৃষ্টি, আর সেই হিসেবে আমা
কন্যা। কী গর্হিত ব্যাপার দেখ, কন্যাকেই আমরা প্রিয়া বলে ভুল করেছি
আমরা সবাই বুঝি তাই করি।" (মনসিজা)

"মৃত্যুই দেহোত্তর জীবন, আর সেই জীবনই সম্পূর্ণ। কারণ ফিরি
খোয়ানোর ভয় তখন নেই।" (চিররূপা)

"আমরা পাপ থেকে জাত। আমাদের আদি এবং অন্তে এই পাপ ছা
আর কি আছে?" (আর এক জন্ম, অন্য মৃত্যু)

উক্তিগুলি যীশু, মহম্মদ, বুদ্ধ কথিত হলে আপত্তির নেই। কিন্তু শিল্পী
প্রকেটকে এক চেহারায় ভাবতে অস্বস্তি বোধ হয়। লেখকরাও হয়তো প্রকেটে
ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে চান নি, তবু সেই কাজই তারা করতে বাধ্য হয়েছে

লেখক যাই লিখুন না কেন, পাঠকের কথা কোনো সময়েই তারা বিস্মৃত হতে পারেন না।' বক্তব্যকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার জন্য সাক্ষ্য-প্রমাণের কথা সব সময়েই মনে রাখতে হয়। তাই মুহূর্তের জন্যও কলমকে বাস্তবজীবন থেকে তুলে নেওয়া যায় না। যে ভঙ্গিতে গল্পগুলি লেখা হয়েছে তাতে এই সাক্ষ্য-প্রমাণগুলি যে খাঁটি, তারা এমন কোনো ধারণা সৃষ্টি করতে সক্ষম হন নি। ঈশ্বর যদি বলেন, 'আমি নির্দেশ দিয়েছি মানুষ মানুষকে ভালোবাসবে' তাহলেই আমরা বিশ্বাস করতে শুরু করব না যে, মানুষ মানুষকে ভালোবাসছে। আমরা চোখ মেলে দেখে এবং এই ভালবাসাকে অনুভব করে, বিশ্বাসে পৌঁছব। উত্তমপুরুষের কাহিনীতে ঈশ্বরই প্রধান চরিত্রে অবতীর্ণ হন। ফলে নিজের খুশি মতো তিনি অভিনয় করেন। কিন্তু প্রচলিত রীতির গল্পে, ঈশ্বর থাকেন অলক্ষ্যে। তারই সৃষ্ট বিভিন্ন মানুষের লীলাটুকুই শুধু আমরা প্রত্যক্ষ করি। উচ্চস্বরে ঈশ্বর বলে দেন না, 'এই হচ্ছে ভালোবাসা, ওই হচ্ছে পাপ', সেটুকু আমরা নিজেরাই ধারণা করে নিই। শুধু সঠিক ধারণায় আসার ইঙ্গিতটুকু স্পষ্ট হওয়া চাই। গল্প শেষ করার পরও যদি মনে হয়, আসল কথাটিই বলা গেল না এবং বাণী দেওয়ার মতো, আলাদা করে, গল্পের সঙ্গে বক্তব্যটিকে জুড়ে দিতে হয় এবং এই শক্তিমান লেখকদের গল্পেই যখন এমন কাণ্ড ঘটতে দেখি, তখন উত্তমপুরুষে গল্প বলার এই ভঙ্গিটির ত্রুটিহীনতা সম্পর্কে সন্দেহ জাগে। অথচ 'নেপথ্য', 'হয় না' বা 'জীয়ন-কাঠি' গল্পে সন্তোষকুমার ঘোষ ভঙ্গির দিক থেকে নিখুঁত। 'নেপথ্য' গল্পে লেখক অংশগ্রহণ করেন নি আবার চরিত্রগুলির চিন্তার মধ্যে কখনো কখনো আত্মপ্রকাশ করেছেন। এই দুই ভূমিকাতেই ভারসাম্য কোথাও টলে নি। যাওয়া-আসাটা উপযুক্ত সময়েই ঘটেছে। 'হয় না'-য় লেখক একদম অনুপস্থিত। পাঠকের বিচার-বুদ্ধির কাছেই গল্পটিকে সঁপে দেওয়া হয়েছে, আর 'জীয়ন-কাঠি' গল্পটি আগাগোড়াই উত্তমপুরুষে বলা হলেও, বলার কথাগুলি ঘটনাকে আশ্রয় করেই উদ্ভূত এবং ঘটনাকে ব্যাখ্যা করার জন্যই বড় কথা স্থূল ভাবে বলা হয় নি, তা পাঠকের তৈরি করে নেওয়ার অপেক্ষায় রয়ে গেছে।

'সুধাময়', 'নিষাদ' বা 'ছাদ' গল্পে বিমল কর উত্তমপুরুষকেই দক্ষতার সঙ্গে কাজে লাগিয়েছেন। অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করার মতো ব্যাপার। 'সুধাময়' গল্পে কখনো লেখক, কখনো বা সুধাময় মারফত কাহিনী বিবৃত

হয়েছে। একের দুর্বলতা অপরে ঢেকে দিয়েছে। 'নেপথ্য'র মতো এ গল্পটিতেও 'আমি' আছে, কিন্তু সে কোথাও মাত্রা হারায় নি। 'নিষা বিস্ময়কর রকমের নিখুঁত। প্রতিটি শব্দ সযত্নে মেপে ব্যবহার করা হয়েছে এ-গল্পটি রচনায় লেখকের শ্রম নিশ্চয়ই ব্যয়িত হয়েছে কিন্তু স্বেদের কোথাও নেই। 'ছাদ' গল্পটি যদিও উত্তমপুরুষে লেখা কিন্তু প্রথমপুরুষে ব হলেও কোনো প্রকারভেদ ঘটে না।

একটা ব্যাপার এর থেকে মনে হয় যে নিছক 'আমি' নিয়ে গল্প, কোনো বিষয়েই লেখা সম্ভব নয়। 'নিষাদ' বা 'জীয়ন-কাঠি' আঙ্গিকের দিক থেকে সফল, এর কারণ, সম্ভবত জীবনের নঞর্থক দিক এই আঙ্গিক মারফৎ যত সফলভাবে ফুটিয়ে তোলা যায়, তা সদর্থক ধারণাকে ততটা কার্যকরীভাবে উপস্থাপিত করতে পারে না। এর সপক্ষে ননী ভৌমিকের 'ছবি' ও 'বুড়ো লোকটার গল্প'-কে হাজির করা যায়। উচ্চ বিষয়গৌরব সত্ত্বেও গল্পগুলি মনে সাড়া জাগাতে পারল না শুধু এই আঙ্গিকের জন্যই। অথচ 'স্বপ্ন সত্য আ কান্নায়' গল্পটি স্তব্ধ বিষণ্ণতা সফলভাবে সঞ্চার করে। ননী ভৌমিকের লক্ষ্য সেই মহৎ গুণাবলীকে প্রকাশ করা, যা মানুষের প্রতি মানুষের বিশ্বাস-ভালোবাসাকে ফিরিয়ে আনে। মামুলী আঙ্গিক সত্ত্বেও 'জন্মভূমি' গল্পটি তাই অভিভূত করে। 'গান্ধারী' উত্তমপুরুষের জবানীতে বলা হলেও, এ গল্পের 'আমি' শুধুই দ্রষ্টা। অংশগ্রহণ করে নি, মন্তব্যও করে নি। গল্প শেষ করার পর একরাশ কথা মনে ভীড় করে আসে। মহাভারতের গান্ধারী থেকে বিংশ শতাব্দীর মা-মণি পর্যন্ত ; একটানা আশা-নিরাশার ইতিহাস চমক দিয়ে ভবিষ্যতের দিকে চলে যায়। আর আশ্চর্য, ভয়ে ভয়ে কখন নিজের দিকে তাকাতে শুরু করি, চিন্তা করি। এমনি আর এক গল্প 'বাদা'। নিমেষের জন্য লেখক কোথাও উঁকি দেন নি। যেন নাটক দেখছি। একটি ঘটনাও ঘটল না। তবু ধীরে ধীরে ক্লাইম্যাক্সে গল্প পৌছল। আর তার মধ্যেই জীবনের আদিম রূপটি ধকধক করে উঠল। গল্প শেষে, প্রবলভাবে কামনা-বাসনা সহ বাঁচার ইচ্ছাটির কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হই।

'বাদা', 'গান্ধারী', 'নেপথ্য', 'হয় না' প্রভৃতি গল্পগুলিতে 'আমি' একরকম অনুপস্থিত, নয়তো তার ভূমিকা যৎসামান্য। লেখক নিস্পৃহ ভঙ্গিতে শু বিবরণী দিয়ে গেছেন বাইরের এবং মনের। যে মানুষগুলিকে এই গল্পে পাই তারা 'আমি'র দেখাশোনা, চলাফেরার গণ্ডির বাইরেও যাবার ক্ষমতা রাখে।

এই স্বাধীনতা তাদের থাকায়, পাঠকের কৌতূহল আরো বাড়ে। এই স্বাধীন মানুষগুলি শেষ পর্যন্ত কি করে এবং লেখক তাদের কি করেই বা সামলান তা জানার আগ্রহ ক্রমশ বাড়ে, 'আমি' গল্পে এই কৌতূহলটাই কতকটা ঝিমিয়ে পড়ে। তাছাড়া প্রচলিত রীতির গল্পে বলার কথাটা কাহিনীর গঠন ও গতির সঙ্গে এমনভাবে জড়িয়ে দেওয়া হয় যে গল্পশেষে পাঠক সেই কথাটাই ভেবে নেয় যা লেখকের ঈপ্সিত ছিল। প্রচলিত রীতির গল্পে কারিগরী নৈপুণ্যের দাবি বেশি। তাই লেখাও কঠিন। এই কঠিন পথে যাওয়া সম্ভব হয়, তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ, প্রবল বাস্তববোধ, দৃষ্টিভঙ্গির পরিচ্ছন্নতা ও গ্রহণ-বর্জন সম্পর্কে মাত্রাবোধ প্রভৃতির সহায়তায়।

'আমি' গল্পের আর একটা সমস্যা গল্পকে বোধ্য করে তোলা। তার মানে সুখপাঠ্যতা বাড়ানো নয়। বাস্তব অবস্থা ও পরিবেশকে মান্য করে, গল্পের মানুষগুলির চিন্তা ও আচরণকে স্বাভাবিক ও সন্দেহমুক্ত করে। ননী ভৌমিকের 'পূর্বক্ষণ' গল্পটি তার আঙ্গিকের দিক থেকে বাংলা গল্পে প্রথম এবং আজ পর্যন্ত শেষ লেখা। গল্পটি আগাগোড়াই কোনো একজনের চিন্তা। কিন্তু সেই একজনটি কে? নিশ্চয় তিনি মানুষ। কিন্তু কেমন মানুষ? তার পেশা কি, বয়স কত, দেখতে কেমন, নায়িকার সঙ্গে কোথায় কিভাবে তার সম্পর্ক গড়ে উঠল ইত্যাদি নানান প্রশ্ন করা যায়। এগুলি না জানা থাকলে কি করে বিশ্বাস করব যে-লোকটি ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান নিয়ে চিন্তা করছে, তার পক্ষে এত সব চিন্তা করা সম্ভব কি না! মানুষটি হাওয়ায় নয়, রক্ত-মাংসে গড়া, এই প্রত্যয়টুকু লেখককে গল্পে রাখতেই হবে, কেননা গল্প উপন্যাসের কারবার যাদের নিয়ে তারা সমাজবাসী। পাঠকও এই সমাজেই বাস করেন। কাজেই তার সঙ্গে যখন অন্যজনের পরিচয় ঘটবে তখন কতকগুলি তথ্য সে জেনে নিতে চাইবে। এটাই স্বাভাবিক। এই স্বাভাবিকত্বটুকু গল্পের মানুষদেরও রক্ষা করতে হবে। সন্তোষকুমার ঘোষের গল্পের কয়েকটি নারীচরিত্র চিন্তার মধ্যে যে বৈদগ্ধ্যের সাক্ষ্য দিয়েছেন তার সঙ্গে তাদের বিদ্যাবুদ্ধির প্রমাণটুকু মেলে নি। লেখকের মার্জিত রুচির দায়টুকু এরাই বহন করেছে। এটি সম্ভব যখন লেখক পরিশ্রম-বিমুখ হন। মেয়েদের একটা আলাদা ভাষা আছে। সে ভাষা তাদেরই তৈরি করা। এই ভাষা না জানলে মেয়েদের মেয়ে হিসাবে উপস্থিত করা যায় না। মুখের এবং চিন্তার ভাষা একই। 'কোন এক কুলবধূর কথা'য় তা মান্য হলেও

অন্যান্য গল্পে এই মমতা বজায় থাকে নি। বিমল করের 'মানসাঙ্ক'
চন্দনকে তার বয়স অনুযায়ী বাড়াবাড়ি রকমের 'ক্যাবলা' বানানো
বয়সে সে কিশোর, বাড়িতে যে কাণ্ডটা ঘটেছে সে সম্পর্কে কোনো
খবরই সে নিল না, অথচ কিশোর বয়সটাই কৌতূহল খোঁজে আর
এক্ষেত্রেও লেখকের প্রয়োজনের দায় মেটাতে চন্দনকে তার স্বাভাবি
খোয়াতে হয়েছে।

'আর এক জন্ম অন্যমৃত্যু' গল্পটিতে ইহুদি ও খ্রীষ্টধর্মের ভগবদ্
পাপবোধে পীড়িত নায়ক-চরিত্র-কল্পনার মধ্যে যুক্তি খুঁজে পেলাম
"মানুষ কেন মনে করে না, অনাচারী কলুষ নিষ্ঠুর এক হীন
থেকে এই জগৎ সংসারের জন্ম হয়েছে।" ভারতীয় হয়ে এ জাতীয়
কার্য-কারণ সম্পর্কটি খুঁজে বার করা আমার পক্ষে মুস্কিলের হয়ে পড়ছে।

"যে ঘরে আমরা রাত কাটাতে এসেছি, যদি সে ঘরের দীপশিখা সব
বাতাসে কাঁপে, নিভুনিভু হয়—তবে আর আশ্বাস কোথায়? যে কোন
অন্ধকার আসতে পারে। এই অনিশ্চয়তার মধ্যে যে ক-মুহূর্ত আছি—
কি মানুষের মতন বাঁচতে পারি?…আমরা হুড়োহুড়ি করে, দাপাদাপি
সুখ অর্থ সম্মান ঘর-বাড়ি আধিপত্য যা পাই যতটা পারি লুটে নিতে চাই।
কী শোচনীয় অবস্থা! মর্মান্তিক স্থিতি।" (সুধাময়) অল্প কথায়
ভাবে বিমল কর আজকের সময়ের কথা বলেছেন। আর এই সময়ের
এঁকেছেন সন্তোষকুমার ঘোষ তার গল্পগুলিতে। ননী ভৌমিক এই শোচ
অবস্থার মধ্যেও মানুষের মহত্তম বৃত্তিগুলিকে অটুট রাখতে চেয়েছেন।
তিনজনের গল্পগুলির মধ্যে যা খুঁজছিলাম তা পাই নি বললে, ভুল বলা
আঙ্গিকের পরীক্ষায় এরা তিনজনই ব্রতী। অনেকক্ষেত্রেই এরা সফল
কেন সফল হলেন বা হলেন না, তার কারণগুলি অবশ্যই পরবর্তী লেখক
জানতে হবে। আঙ্গিক নিশ্চয় কোনো একটি বিষয়কেই আকার
বিষয় সম্পর্কে যদি তরুণ লেখকদের স্পষ্ট ধারণা থাকে, তাহলে আঙ্গিক
খুব দুর্লভ নয়। উত্তমপুরুষের আঙ্গিকে তিন লেখকের যে গল্পগুলি
হয়েছে, তার বক্তব্য জীবনের অন্ধকার দিকের কথাই বলে। 'সুধাময়'
'শোকে'র মতো বিষয় নিয়ে, বিমল কর বা সন্তোষকুমার ঘোষের লেখা
আরো পড়তে চাই। ননী ভৌমিক চার বছর গল্প লেখা বন্ধ রেখেছেন
আবার যখন শুরু করবেন, নিশ্চয় অনেক বিস্ময় আমাদের এনে দেবেন।

দাম : এক টাকা পঁচিশ ন.প.

১৩৬৭

শারদীয়

পরিচয়

